শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা

ষষ্ঠ খণ্ড

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রণীত

৮ম সংস্করণ

কলিকাতা

১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা

তারকনাথ প্রেস, ২নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪, হইতে
শ্রীবিমল কুমার ব্যানার্জী কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আমাদের নিবেদন

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। শৈশবাবধি যাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা বলিয়া জানিয়াছি, যাঁহার সামান্য সেবা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আজ যদি সেই পরমারাধ্য শ্রীল শিশিরবাবু এই মরজগতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীকরে তাঁহার এই শেষ গ্রন্থখানি দিয়া, তাঁহার আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে তাহা হইল না,—বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ১টা ৩৫ মিনিটের সময় তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিষা নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষোভ চিরদিনই আমাদের মনে থাকিবে।

যে দিন তিনি আমাদের ছাড়িয়া গোলোকে গমন করেন, সেই দিন যথাসময়ে স্নানাহারের পর এই গ্রন্থের শেষ-ফর্ম্মার প্রুফটি লইয়া ভ্রম সংশোধন করিলেন, এবং শেষে আমাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আজ আমার কার্য্য শেষ হইল।" তৎপরে ঘরের কোণে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া একটু নিদ্রা গেলেন। দুই ঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, তখন তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল, এবং উপবেশন অবস্থাতেই, একবার "নিতাই-গৌর" বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা নিকটে ছিলেন। তিনি পিতার ঐরূপ ভাব দেখিয়া কিঁছু ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন। আমরা যাইয়া দেখিলাম তিনি নয়ন মুদিয়া বালিস ঠেস দিয়া যেন ঘুমাইতেছেন। তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি তখনই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

সে সময় তাঁহার বদনের অপরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে, সেই উপবেশন অবস্থাতেই,

তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। তখনও কে বলিবে যে এ দেহে প্রাণ নাই, বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে ঘুমাইতেছেন। যিনি ফটো লইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "মৃতদেহের অনেক ফটো আমি তুলিয়াছি, কিন্তু প্রাণত্যাগের পর মুখের এরূপ সুন্দর ভাব আর কখনও দেখি নাই।"

এই খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি যে লিখিয়াছেন যে, "পাঁচ খণ্ড শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত বাহির হইবার পর ৬ষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য অনেকে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত লিখিবার পূর্ব্বে কেহ যেন প্রভুর লীলা আমার দ্বারা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল, আর এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি।"

এই যে "এক নিশ্বাসে" লিখিবার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অত্যুক্তি নহে। যাঁহারা তাঁহার নিজজন, সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহারা জানেন তিনি কিরূপে,—কেবল শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের পাঁচ খণ্ড নহে, তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সমস্তই,—"এক নিশ্বাসে" লিখিয়াছেন। তিনি অতি প্রত্যুষে ভজনে বসিতেন। ভজন শেষ হইলে সেই আবেশ অবস্থায় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর তাঁহার কোন নিজজন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লেখা শেষ হইবার পর, ষষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য মহাপ্রভুর কোন অনুজ্ঞা অনুভব করেন নাই বলিয়া, তিনি ঐ খণ্ড লেখেন নাই। কিন্তু শেষে বোধ হয় এই অনুজ্ঞা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ গত বৎসর একদিন তিনি আমাদিগকে বলিলেন,—"ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

তখন তাঁহার দেহের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাঁহার প্রধান

ক্লেশ অনিদ্রা, তাহাতে জীর্ণশক্তি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল, কাজেই তাঁহার দেহ কঙ্কালশার হইয়া পড়িয়াছিল। এই কৃশ-দেহে ও ব্যাধির তাড়নার মধ্যে, এক পদ ইহজগতে এবং অপর পদ পরজগতে রাখিয়া তিনি ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় গ্রন্থের কতকাংশ লেখা হইলে, তাঁহার দেহের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। তখন প্রতিদিন রাত্রে, শয়ন করিবার সময়, ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের হস্তে দিয়া বলিতেন, "এগুলি সাবধানে রাখিও। যদি অদ্যকার রাত্রি কাটাইয়া উঠিতে পারি, তবে অবশিষ্ট অংশ লিখিব।" রাত্রে নিদ্রা নাই, ক্লেশে রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু রাত্রি-শেষে উঠিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন! এইরূপ প্রায় প্রত্যহই করিয়াছেন।

নানা কারণে গ্রন্থখানি ছাপা দেরী হইতেছিল। ইহাতে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া প্রায় আমাদিগকে বলিতেন, "গ্রন্থখানি ছাপিতে বড়ই দেরী হইতেছে, একটু চেষ্টা করিয়া, যাহাতে ইহা সত্বর শেষ হয় তাহা করিবে।" কিন্তু গ্রন্থখানি লইয়া তিনি যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া আমরাও সেইরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলাম। কাজেই গ্রন্থ ছাপান সম্বন্ধে আমাদের কিছু শিথিলতা হইয়াছিল।

এখন গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। এ পর্য্যন্ত প্রভুর লীলা-গ্রন্থ যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার গম্ভীরা-লীলা বিশদরূপে বর্ণন করেন নাই। প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর যে লীলা করেন, ইহা এত নিগূঢ় যে, মাত্র কয়েকজন "মহাপাত্র" এই লীলারস তাঁহার সহিত আস্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই গম্ভীরা-লীলা বর্ণন ও প্রভুর লীলা-রহস্যের বিচার শিশিরবাবু এই খণ্ডে করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "জগতে যে দুইটি সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই।

সেই দুইটি এই—(১) শ্রীভগবান যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? এবং (২) যদি তিনি থাকেন, তবে তিনি কিরূপ বস্তু? এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার তাহা আমি হস্তে লইলাম।"

এই যে এত বড় একটা কথা তিনি বলিলেন, ইহা কি দম্ভ করিয়া, না নিজের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য? কিন্তু যিনি শ্রীভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া জীবের মঙ্গল-সাধনার্থ চিরজীবন কাটাইয়াছেন, যিনি শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত ও শ্রীকালাচাঁদ-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ যে কতদূর মধুর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরকাল সম্বন্ধে যাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস,—তিনি ৭০ বৎসর বয়সে, জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, মহাপ্রস্থানের পথে দাঁড়াইয়া দম্ভ করিয়া যে কিছু বলিবেন ইহা কি সম্ভব?

তিনি যে দুইটি বিষম-সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার ঠিক মীমাংসা হইয়াছে কি না, পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। আব তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এ কথাও অনেকে বলিতেছেন, শ্রীভগবান তাঁহার নিজ-কার্য্য সাধনের জন্য শিশিরবাবুকে এই মরজগতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই কার্য্য সমাধা হইবামাত্র আবার তাঁহাকে আপনার কাছে লইয়া গেলেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীল শিশিরবাবুর এই ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ড জগতের এক অমূল্য রত্ন!

১৩১৮ বঙ্গাব্দ — শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীমান্ পয়স্‌কান্তি

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ যে সহ্য করিতে পারিব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিতেছি। ইহা কিরূপে করিলাম ?

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা ভজন সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে। তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু-বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্ত্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে তখন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ-গুণসুধা পিয়াইতে। সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবান্‌কে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান্) জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল-লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু এখন আছে, তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে। তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বদা বলিতে, "কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাঁহার সমুদয় পদ শিখিব।" এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে।

তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের

ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার অভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব? বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি আমার আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ জড়জগতে বোধ হয় এইরূপ সূক্ষ্ম কারিকরি হইতে পারে না, অন্ততঃ কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। এই ছবিখানি সর্ব্বদা আমার সম্মুখে থাকে।

আমি এই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই। আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু-অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান্ আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না বলিয়া মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সুস্বরে গীত গাহিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, আর আমার যাহাতে শীঘ্র মোচন হয়, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও।

বাগবাজার
৪২৫।২৫ পৌষ

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

ভূমিকা

পাঠকগণ দেখিবেন যে এই খণ্ডে এরূপ অনেক লীলাকথা লেখা আছে যাহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিস্ফল লীলা একটিও নাই, সকল লীলারই মহৎ তাৎপর্য্য আছে। তাহা বুঝিতে অনেক পরিশ্রম, সাধনা, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন। কেবল পড়িয়া গেলে, সকল লীলার উদ্দেশ্য বুঝা না গেলেও পারে। পূর্ব্বে আমি প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রধান লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিব ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যে লীলা লেখা হইয়াছে, এবার অন্য উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। কোন একটি লীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় অমুক খণ্ডে যে লীলার কথা লেখা হইয়াছে, পাঠক আমি এখন তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ইহাতে পাঠকের কথায় কথায় সেই সমুদয় লীলা তল্লাস করিতে অন্যান্য খণ্ড খুলিতে হইবে। আমি তাহা না করিয়া পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত ইহাই করিয়াছি যে, যে লীলাটীর তাৎপর্য্য বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়াছি। কোন কোন লীলা দুইবার বর্ণনা করিবার ইহাই কারণ।

অপর, আমি যে বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা মনে করিলে ভয়ে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই পৃথিবী বহু সহস্র কি লক্ষ বৎসর সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে কত জাতির উৎপত্তি ও কত জাতির লোপ হইয়াছে, কত বড় বড় সাধু আবির্ভূত হইয়াছেন ও তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু দুই একটি তত্ত্বের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সে তত্ত্বগুলি অতি প্রধান, অতি প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে

একটী তত্ত্ব এই যে—শ্রীভগবান যে আছেন ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি আছেন এইমাত্র ; কিন্তু কেন বিশ্বাস করেন, এবং তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেহ কেহ নাকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ বলে না। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে পারে, কিন্তু অন্যের নিকট নহে। অতএব ইহা নিশ্চিত—শ্রীভগবান্ যে আছেন, তাহার প্রকৃত প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় বিচারের তত্ত্ব এই যে, যদি শ্রীভগবান্ থাকেন, তবে তিনি কিরূপ বস্তু ? শ্রীভগবান্ যে আছেন, তাহার কোন প্রমাণ যখন নাই, তখন দ্বিতীয় তত্ত্বটী জানিবারও কোন সুযোগ নাই। অতএব জগতের যে দুইটী সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে দুটী এই—

(১) শ্রীভগবান্ যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি ?

(২) যদি তিনি থাকেন, তবে তিনি কিরূপ ?

এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ, আমাকে দাম্ভিক ভাবিবেন না। পড়িলে বুঝিবেন যে আমার দম্ভ করিবার কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি তবে জগতের মঙ্গল হইবে। না পারি আমার লজ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছুই থাকিবে না। কারণ যাহা কেহ পারেন নাই, আমিও তাহাই পারিলাম না. এই মাত্র।

উপক্রমণিকা

যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল, তখন ভাবিলাম যে, আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। তখন আপনার অবস্থা ভাবিয়া এই পদটি রচনা করিয়াছিলাম। যথা—

গোরা জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল,
কাল কাটাতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কানে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল,
হুতাসে পিয়াসে মরি দুঃখে ॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহাকে কহিব মনো-ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে,
কে শুনাবে মনোমত কথা ॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল, মন মোর ভুলি গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী ॥
আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়,
এবে মোর শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিস্মৃত,
ক্লান্ত-চিত বিশ্রাম সে মাগে ॥
আর তো চলিতে নারি, লহ মোরে হাত ধরি,
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস আকিঞ্চন ॥

তার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেকে কৃপা করিয়া আমাকে প্রভুর শেষ-লীলা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সে এত জন যে, আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। অনেকে আমাকে বলেন যে, তাঁহারা এই পাঁচ খণ্ড আমূল পাঠ করিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই!

আমি তাঁহাদের সকলকে একরূপ উত্তর দিই নাই। কাহাকে বলিয়াছি যে, আমি বৃদ্ধ, রোগে ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছি, এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না। কাহাকেও বলিয়াছি যে, প্রভুর লীলা-লেখক মহাজনগণ—যাঁহাদের উচ্ছিষ্টই আমার কেবল মাত্র শক্তি,—তাঁহারা প্রভুর শেষ-লীলা লিখেন নাই, সুতরাং আমার লিখিতে সাহস হইবে কেন? মহাজানেরা বলিয়া গিয়াছেন,—"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" অর্থাৎ প্রভুর লীলার আবার শেষ কি? উহার শেষ নাই। যাহারা বড় নিজ জন, তাহাদের নিকট আর এক কথা বলিয়া অব্যাহতি লইয়াছি। প্রভুর লীলা ইচ্ছা করিলেই লেখা যায় না, তাহার নিমিত্ত শক্তি চাই। সে শক্তি ইচ্ছা করিলেই এ জগতে মিলে না। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা কেবল বাধ্য হইয়া। আমি কখন বাঙ্গলা লিখিতে অভ্যাস করি নাই। আমার এই সমস্ত অত্যুচ্চ বিষয় লিখিতে কখনও সাহসও হইত না। যখন প্রভুর লীলা লিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তখন আপনাকে অপারগ জানিয়া, যাহারা খুব ভাল বাঙ্গলা লিখেন বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগকে লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা কেহ লিখিতে স্বীকার হইলেন না, অথচ লীলা না লিখিলেও নয়। আবার কেহ যেন আমার দ্বারা ইহা লিখাইবার নিমিত্ত

আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল। তাই লিখিয়াছিলাম এবং এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না।

ইহা ছাড়া আরও একটী কারণ ছিল; এবং কেন প্রভুর শেষ-লীলা লিখিতে সাহস হইল না, বলিতে গেলে সেইটীই প্রকৃত কারণ। কিন্তু এ কথা সকলকে বলিতে আমি সাহস পাই নাই। তবে তাঁহাকেই বলিয়াছি যিনি, আমি জানিতাম, আমার সহিত সহানুভূতি করিবেন। সেইরূপ একজন ভক্তের সহিত আমার একবার দেখা হয়, তিনিও ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাকে আমি তখন যে উত্তর দিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা কৃপাময় পাঠকগণকে বলিতেছি। প্রভুর প্রধান প্রধান লীলাগুলি যতদূর জানিয়াছি তাহা লিখিয়াছি, তবে একটী বাকি আছে,—সেটী গম্ভীরা-লীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু এই লীলা করেন। এই লীলা এত নিগূঢ় যে বাহিরের লোকে কেহ উহা জানিতে পারে নাই। কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র এই লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রামরায়, (৩) শিখি মাহিতী, আর (অর্দ্ধজন) মাধবী দাসী। মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইঁহারা সাড়ে তিনজন মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। সাড়ে তিনজন, কেন না, মাধবী দাসী স্ত্রীলোক বলিয়া অর্দ্ধজন।

অধিকার সকলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরূপ প্রশস্ত নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলোকের সুধা কাহারও হৃদয়ে অল্প আবার কাহারও হৃদয়ে অধিক পরিমাণে ধরে।

গম্ভীরা-লীলা দ্বারা প্রভু যে নিগূঢ়-রস জীবের আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন,

২

তাহা এই সব পাত্র লইয়া প্রভু নিভৃতে আস্বাদন করেন। এই নিগূঢ়-রস বিস্তার করিতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগে। এই যে মহাধিকারী কয়জন পাত্র, ইঁহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল; প্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগূঢ় রস বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া সম্যক্‌রূপে উহা বুঝাইতে পারিতেন না। কেন পারিতেন না, তাহা বলিতেছি। মনে ভাবুন, দুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ আস্বাদন করিতেছেন। একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, বাছিয়া বাছিয়া ছন্দ ও উপমা প্রয়োগ করিয়া, অসীম ক্ষমতা দেখাইলেন। আর একজন সামান্য কথায় বর্ণনা করিলেন, কি করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, কথা জড়াইয়া আসিল, তাই পারিলেন না, কি "কথা কহিতে কহিতে মূরছিল," তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে? অবশ্য শেষোক্ত জনের।

এই গম্ভীরা-লীলা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়া। এই লীলাদ্বারা প্রভু সেই সম্বন্ধ পরিস্ফুটিত করেন। শ্রীমতী রাধা কে? না—যিনি ঐশ্বর্য্যবিবর্জ্জিত মাধুর্য্যময় ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রধানা প্রেয়সী। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভু গম্ভীরা-লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনের ভাব কি, তাহা জীবে অতি অল্প জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয়সী কি ভগবান্ যাঁহার প্রাণ, তাঁহার মনের ভাব, জীব সাধন করিলে, অনেকটা কি প্রায় সবই জানিতে পারে। এই গম্ভীরা-লীলায় শ্রীপ্রভু, সেই রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিরূপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন;—কেন না,

জীবকে শিখাইবার নিমিত্ত, এবং জীব উহা হৃদয়স্থ করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বোচ্চ ভজন শিখিবে বলিয়া। যেহেতু রাধার ভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, সুতরাং যাঁহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসনা থাকে, তাঁহার গোপীর অনুগত, কি গোপীর প্রধানা যে রাধা তাঁহার অনুগত হইয়া, কি অনুকরণ করিয়া, ভজন করিতে হয়।

এই রাধার ভাব জানে কে? বুঝে কে? জানিলেও কাহার সাধ্য উহা প্রকাশ বা আস্বাদন করে। তাহাই প্রভু বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ কয়েক জন পাত্র লইলেন, যাঁহারা ইহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিবেন। ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে? প্রভু কি প্রস্তাব লিখিয়া ও পরে উহা পাঠ করিয়া, কি বক্তৃতা করিয়া, কি কবিতা লিখিয়া—ইহা শিখাইলেন? তিনি ইহার কিছুই করিলেন না। তবে তিনি কিরূপে এই সমুদয় অতি-নিগূঢ়, অতি-গুহ্য, অতি-পবিত্র, অতি-দুর্ব্বোধ্য (অনর্পিত) ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহা এখন সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে প্রভু শ্রীরাধা হইলেন। সে কিরূপে, তাহা পরে বিবরিয়া বলিব। তখন সে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীপ্রভু থাকিলেন না, কি অতি গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তখন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমতী রাধার হইল।* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার কিরূপ ভাব, উহা উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগৎকে বুঝাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং শ্রীমতী আসিলেন, আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। প্রভু এই রাধাভাবে এক-একটি মনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা, শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন, "আমার প্রাণের প্রাণ যে কৃষ্ণ"—ইহা বলিতেই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতেই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবৃত হইল। তুমি আমি হইলে, শুধু কথাদ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম।

* এই "আবেশ তত্ত্ব" পরে বিবরিয়া লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন।

কিন্তু প্রভু রাধা হইয়া কথা দ্বারা বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের দ্বারা বুঝাইলেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব তাহা—'আমি তাহাকে বড় ভালবাসি'—ইহা বলিয়া না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষ্ণকথা বলিতে যেরূপ বিভাবিত হইতেন, রাধা স্বয়ং আসিয়া এই গম্ভীরা-লীলায় দর্শককে তাহা দেখাইতেছেন। কাজেই যাহারা দর্শক কি শ্রোতা, তাহাদের হৃদয়ে সে ভাবটী একেবারে বিঁধিয়া যাইতেছে। কথায় বলিলে এরূপ হইত না।

কথায় বলিতেছেন, "সখি, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন।" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে গলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যখন এইরূপে কোন সুখের কথা বলিতেছেন, তখন নানা প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যখন কৃষ্ণবিরহ প্রভৃতি দুঃখের কথা বলিতেছেন, তখন সেইরূপে নানাপ্রকারে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন,—অর্থাৎ ক্রন্দন করিতেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন-ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা আসিয়া দেখাইলে, উহা যেরূপ স্বাভাবিক হয়, অভিনয় দ্বারা তাহা হয় না।

ইহাকে গম্ভীরা-লীলা বলে। এই গম্ভীরা-লীলা, যাহা বুঝাইতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, শত-শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতে হইয়াছিল, যাহা জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র,—তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে,—মোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরূপ যে নিগূঢ় লীলা, তাহা আমার ন্যায় কোন ক্ষুদ্র-জীব, শুধু বাক্যের দ্বারা কি বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ পারেন, তবে স্বয়ং শ্রীমতী রাধা। অতএব এ লীলা প্রকাশ করা আমার

সাধ্যাতীত। সেই লীলা আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেন হইলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি, প্রভু কৃপা করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। যদি তিনি শক্তি দেন তবেই পারিব, নতুবা নয়।

গম্ভীরা-লীলা লিখিতে হইবে মনে করিয়া যেরূপ ভয় হইত, আবার আরও কয়েকটী বিষয় লিখিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা সেইরূপ বলবতী হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্ব্বে লিখিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কেবল লীলা লিখিয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন্ লীলার কি উদ্দেশ্য তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার অবকাশ পাই নাই। এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায়, অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে, এত নিগূঢ় ও গুরুতর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, যাহা পূর্ব্বে জগতে কেহ জানিতে পারেন নাই, আর উহা জানিলে জীবের মহৎ উপকার সম্ভাবনা। শুধু লীলা পড়িয়া গেলে অনেকের মনে নিগূঢ় তত্ত্ব উদয় হয় না। লীলা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হয়, করিতে করিতে মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্যার মীমাংসা আইসে।

বিবেচনা করুন প্রভুর সচরাচর দুই ভাব ছিল,—এক সহজ ভাব, আর এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরূপ থাকিতেন, আবেশিত ভাবে অন্য প্রকার হইতেন। অনেক সময় এমনও দেখা যাইত যে, সহজ সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ঠিক বিপরীত। বৃন্দাবন দাস এক স্থানে বলিতেছেন যে, প্রভু এই এক জনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু পরেই তাহার মস্তকে শ্রীপাদ দিতেছেন। ইহার অর্থ কি? প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে জর্জ্জরীভূত, মুহুর্ম্মুহু প্রলাপ করিতেছেন। তিনি কি বিচার করিয়া সমুদয় কার্য্য করিতেন, না বিকল অবস্থায় লোকে যেরূপ করে, অর্থাৎ যাহা মনে উদয় হইত, তাহাই করিতেন?

একদিন প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন যে, "আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ

দেখাইব ? ইহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, ও কথা আমরা শুনিব না। আপনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে শ্যামসুন্দর-রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেন কেন ?" প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব ? যদি বলিয়া থাকি, সে হয়ত উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, তুমি ত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিয়া থাকি, এমন কি অনেক অসম্ভব কথাও বলি। কিন্তু আপনারা আমার বন্ধু, আপনাদের কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহার নিমিত্ত সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা ?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি যাহাকে উন্মাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা, আর সহজ অবস্থায় যাহা বল, সে সমুদয় তোমার বাহ্য।" এতএব প্রভুর এই দুইটী অবস্থা—আবেশিত ও সহজ,—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা যদি হইল, তবে এই আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বা কি ? আর, ইহার কোন অবস্থার কথা কি কার্য্য আমাদের কতদূর মান্য করিতে হইবে ? আমারা প্রভুর লীলায় দেখিতেছি যে, অনেক স্থানে এরূপ লেখা আছে, যথা—"প্রভুর তখন আবেশিত চিত্ত"; কি প্রভু "ক্ষণে বাহ্য পাইয়া"; কি প্রভু বলিতেছেন, "বন্ধুগণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম ?" আবার প্রভুর কাণ্ড দেখুন। প্রভু করিতেছেন কি, না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আবার কখন বা,—আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন। প্রভু কিছুকাল এত বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার নিজজন তাঁহাকে বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভুর কিরূপ লীলা ? আর

"প্রভুর রাধাভাবে গড়া তনু"—এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ কি ? প্রভুর "প্রকাশ," বা প্রভুর "মহাপ্রকাশ"—ইহার অর্থ কি ? আর প্রভুর সেই সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করার অর্থই বা কি ?

আবার দেখিতেছি, প্রভুর দেহে নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইত। কখন তিনি আপন দেহদ্বারা চক্র হইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, আবার কখন আর্দ্র দেহ, কখন শুষ্ক দেহ হইত, ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য কি ? আবার কখনও প্রভু কৃষ্ণের নিকটে অতি কাতরে পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তেরা ইহা করিয়া থাকেন, ও প্রভু অনেক সময় ভক্ত-ভাবে থাকিতেন। কিন্তু একটু পরে প্রভু আবার তিনিই কৃষ্ণ, ইহাই বলিয়া অন্যের পাপ মার্জ্জনা করিতেছেন। অতএব তিনি ভক্ত, না কৃষ্ণ ? প্রভু রাধাভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন। বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণকে কুমতি কুব্জা ভুলাইয়া রাখিয়াছে," কি "তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর ত আইলেন না।" তখন সকলে বুঝিলেন ইনি রাধা। আবার একটু পরে "রাধা রাধা" বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কোথা আমার প্রাণপ্রেয়সী রাধা, তোমার বিরহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে না।" তখন বোধ হইল তিনি কৃষ্ণ। অতএব তিনি ভক্ত, না রাধা, না কৃষ্ণ। প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্ধায় পড়েন। প্রভু এরূপ করেন কেন ? পরিশেষে স্বরূপ গোঁসাই ইহার একটি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত, যথা—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াম্—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ৬॥

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বে পৃথক ভাবে বিরাজ করিতেন, এখন তাহারা এক দেহ লইয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বস্তুতঃ রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কখনও রাধা প্রকাশ হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন, আবার কখনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়া রাধার নিমিত্ত রোদন করেন। এই মীমাংসায় একটি অভাব রহিল। যাদ গৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ হইলেন, তবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ, যিনি পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কে? দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিতে একটু কষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, তিনি রাধাপ্রেম আস্বাদন করিয়া যত আনন্দলাভ করেন, শ্রীমতী রাধা তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেইজন্য দুইজনে মিলিলেন। ইহাতে, রাধার যে আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অংশীদার হইলেন। এরূপ মীমাংসা ভক্তগণের নিকট বড় মধুর। কিন্তু আর এক জাতীয় মনুষ্য আছেন, যাহারা একেবারে নাস্তিক। প্রধানতঃ তাহাদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। আমি এই তত্ত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত কোন মীমাংসা আছে কিনা, দেখিব। প্রভুর লীলার মধ্যে এইরূপ নানাবিধ সমস্যা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্যক, আর আমি তাহাই করিব। এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম।

যেমন গম্ভীরা লিখিতে ভয় হইত, তেমনি লীলার রহস্য বিচার করিতে বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু এ লীলা-বিচার অপেক্ষা আর একটী বলবৎ কার্য্য হস্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে তাহাই করিব। বিশ্বাস ও জ্ঞান দুটী পৃথক বস্তু। শ্রীভগবান্ বলিয়া যে এক বস্তু আছেন, তিনি বিশ্বাসের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু নহেন; অর্থাৎ ভগবান্ যে আছেন এ পর্য্যন্ত ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু, ভাল কি মন্দ, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমাদের হৃদয় বলে যে, তিনি ভাল,—এই মাত্র। কিন্তু একজন নাস্তিক যদি বলে,—তিনি যে ভাল তাহার প্রমাণ কি? তখন ইহার প্রমাণ দিতে পারিব না। শুনিতে পাই ভগবদ্দর্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু সে প্রমাণ নয়। যেমন শাস্ত্রে দেখি যে, শ্রীল নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু যে অবিশ্বাসী, সে তাহা মানিবে কেন? নারদ বলিয়া যে কোন মুনি ছিলেন, তাহা সে স্বীকারই করিবে না। শ্রীভগবান্ আছেন, ইহা যদি প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আর ইহাও যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি মনুষ্যকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, এবং মরণের পরে মনুষ্যকে চিরজীবন দিয়া থাকেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে দুঃখ, তাহার প্রধান কারণ, মধুময় ভগবানে ও পরকালে তাহাদের বিশ্বাস নাই। যদি প্রমাণ হয়—শ্রীভগবান্ আছেন, তিনি অনন্ত-গুণময় বস্তু, মনুষ্যকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনন্তজগতে লইয়া পরম সুখে রাখেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে; শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ দিবানিশি নৃত্য করিতেন, নৃত্যই তাঁহাদের প্রধান ভজন হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, অতি

স্নেহশীল ভগবান্ আছেন ও পরকাল আছে, তাই তাঁহারা নৃত্য করিতেন।*

যদি আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারি যে, প্রেমময় ভগবান্ আছেন ও মনুষ্যের অনন্ত-জীবন আছে, তবে জগতে দুঃখ প্রায় থাকিবে না। ইহা প্রভুর লীলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই জন্যই আমরা ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া ব্যাকুল হইতাম। ভগবান্ যে অছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই প্রমাণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, প্রভুর লীলায় যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, শ্রীভগবান্ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জীবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন,—আর তাহা দুই চারি জনের সঙ্গে কিম্বা মূর্খ ও

* অনন্ত-জীবন কাহাকে বলি? কেহ বলেন, মনুষ্য মরিয়া আবার এই জগতে আর একজন হইয়া আসিবে। ইহাকে অনন্ত-জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল সে ত আর জন্মিল না, জন্মিল আর একজন। "লয়" কি "নির্ব্বাণ",—ইহাও অনন্ত-জীবন নয়। অনন্ত-জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে পুনর্জ্জন্মের তত্ত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহা যে কোথা হইতে আসিল, তাহা নির্দ্দেশ করা দুর্ঘট। বোধহয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে, কারণ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ধর্ম্মের জীবন। যাহারা হিন্দু, তাহারা পুনর্জ্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে মতভেদ হইলে বেদই প্রমাণ। তাহা যদি হইল, তবে বেদের পরকাল-তত্ত্ব কি তাহা শ্রবণ করুন। বেদের মতে মানুষ মরিলে যেমন তেমনি থাকে, থাকিয়া তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হয়, এবং প্রিয় জন লইয়া চিরজীবন যাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ সুন্দর পরকালতত্ত্ব আর কোন দেশে কোন ধর্ম্মে নাই! ইউরোপের অনেক মহাপণ্ডিত বেদের এই পরকালতত্ত্ব দেখিয়া পুলকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

নির্ব্বোধ লোকের সঙ্গে নয়—সমাজের ও দেশের শীর্ষস্থানীয় সহস্র-সহস্র লোকের সঙ্গে।

সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু তাহা আর এখন তর্কের বিষয় নয়,—তিনি স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর এক মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই উপলক্ষে কৃপাময় শ্রীভগবান্ আপনার পরিচয় তাঁহার সন্তানগণকে দিয়া গিয়াছেন। কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদয় কথা অতিরঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, তাহা যেন তাঁহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। তাঁহারা আমার এই প্রমাণ সমুদয় অতি নির্দ্দয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথা পেষণে নষ্ট হয়, আর সত্য কথা পেষণে বর্দ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন যেন তাঁহারা আমার এই অকাট্য প্রমাণগুলিকে অন্যায় করিয়া ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। আর যে প্রমাণগুলি দুর্ব্বল, তাহাও একেবারে উড়াইয়া না দেন; কারণ দুর্ব্বল প্রমাণগুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেদ্য হয়। যখন আমার মনে এরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারেন যে, এই লীলা লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। এই সমস্ত কথা আমি পূর্ব্বে লিখিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তখন লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রুগ্ন ও বৃদ্ধ হইতে লাগিলাম, পুস্তক শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গম্ভীরা-লীলা লিখিতে হইবে মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হইত।

পাঠকগণ! এখন বিবেচনা করুন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জীবের বহুমূল্য ধন কি না; আর, এ ধনের সহিত অন্য কোন ধনের তুলনা হয় কি না। কারণ এই ধর্ম্মের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মের নাই।

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

প্রথম অধ্যায়

আশীর্ব্বাদ

শুদ্ধ বেলোয়ালী—চৌতাল।

কোটী যুগ চিরজীবী রহো আমার—প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর,
জগন্নাথ সুত, গৌরাঙ্গ পতিতপাবন॥
শচীর কুল-তারণ, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন,
দুঃখী জনে দয়া কর হে, তারণ শরণ।
প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসালে, আপনি কান্দি কান্দাইলে,
মধুর মধুর লীলা করিলে;
বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আশীর্ব্বাদ,
দাও দাও দাও দীনহীন জীবে অমূল্য চরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেষ-লীলায় তাঁহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হঠাৎ দেখিলে মনে হইত, যেমন নদীতে কোন ভাসমান দ্রব্য জোয়ার-ভাটায় একবার এদিকে একবার ওদিকে চালিত হয়, তিনি সেইরূপ চালিত হইতেছেন। তিনি কি সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন? না, তাহা নয়। তাঁহার বিহ্বলতা বাহ্য। তাঁহার সমুদয় কার্য্য দেখিলে বোধ হইবে যে, তিনি কি কি

করিবেন, তাহা তাঁহার জগতে উদয় হইবার পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কাহার দ্বারা? না—এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু দ্বারা। এ খেলা তাঁহার জন্মিবার পূর্ব্বে পত্তন হয়, আর যিনি ইহা করিয়াছেন তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় গোচর ছিল। আবার তাঁহার এ শক্তিও ছিল যে, তিনি পূর্ব্বে আপনার মনোমত খেলা পাতাইয়া কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই নিমিত্ত অবতারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই পদ প্রাপ্তিতে তাঁহার অমানুষিক অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই "অবতার" তত্বটী ও এই কথাটীর ইতিহাস বিচার করুন। যখন এই কথাটি সৃষ্ট হয়, সেই সঙ্গে তখন তাহার কার্য্যও স্থির করা হয়। কথা হয় যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, আর তখন তাঁহাকে অবতার বলা যায়। ঐ সঙ্গে আরও কথা হয় যে, এইরূপে অমুক অমুক অবতার হইয়াছেন, আরও একটি হইবেন, তাঁহাকে বলে কল্কি-অবতার। সুতরাং এই শব্দটী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, উহার যে কার্য্য তাহাও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দের ও তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

কিন্তু নবদ্বীপে এই কথা ও তত্ব আবার উত্থিত হইল। যখন নবদ্বীপের লোকেরা দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী একটি কার্য্য করিতেছেন, যে কার্য্যের ভ্রমশূন্য মানচিত্র পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাহারা আবার অবতার কথাটা উঠাইলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন একটী বস্তু পূর্ব্বে একটা খেলা পাতাইয়া এবং পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তখন তাঁহারা বলিলেন যে, এই বস্তুটী আমাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন; ইহার যে শক্তি উহা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। তাই লোকে লুপ্ত অবতার-তত্ব বস্তুটী আবার সজীব করিলেন।

মনে করুন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু সাব্যস্ত করিলেন যে, জীবকে অতি নিগূঢ় প্রেমধর্ম্ম অর্পণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটি অবতারের আবশ্যক, তাঁহার অমুক স্থানে অমুক সময় জন্মগ্রহণ করা উচিত, এবং তাহার পরে তাঁহার এই সমুদয় কার্য্য করিতে হইবে। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু পূর্ব্বে এই সমুদয় সাব্যস্ত করিলেন, পরে সেই সমুদয় প্রস্তাবিত ঘটনা কার্য্যে পরিণত হইল।

উপরে যাহা বলিলাম, প্রভুর লীলা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহাই বোধ হইবে। সে সময়ে শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যা ও বুদ্ধি-চর্চ্চায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু স্থির করিলেন যে, এই নবদ্বীপেই এই অবতারের উদয়ের উপযুক্ত স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ অকুতোভয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন। শুনিতে পাই, যীশুর সঙ্গিগণ ছিলেন জালিয়া প্রভৃতি নীচ লোক। এই জগতে সামান্য যে যে অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সঙ্গী ঐরূপ মূর্খ অজ্ঞ লোক ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না—পণ্ডিত সমাজে, যেখানে সে সময় অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিরাজ করিতেছেন। তিনি জন্মিলেন কিরূপ সময়, না—যখন সেই নবদ্বীপ উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থাৎ যখন মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র নিজ জন্মস্থানে দুঃখ পাইয়া এই নবদ্বীপনগরে আশ্রয় লইয়াছেন; যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি ঐ নগর অলঙ্কৃত করিতেছেন; যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতি, ও আগমবাগীশ তাঁহার তন্ত্রসার লিখিতেছেন; এবং যখন কমলাক্ষ ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু ভাবিলেন যে, সেই ভাবী অবতার জগতের প্রধান স্থানে প্রধান লোক সমাজে জন্মিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে,—আর

প্রকৃত তাহাই হইল। যেহেতু সেই বস্তু বুঝিয়াছিলেন যে, এই ভাবী অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান আপনা আপনি তাঁহার বশীভূত হইবে।

আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সময় ফাল্গুন মাস; অবতার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন। আবার ফাল্গুন মাসের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সময় পূর্ণিমা-সন্ধ্যা; কাজেই যেমন ফাল্গুনী-পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও এই সময় অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত।

প্রভুর লীলায় দেখিবেন যে, তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভালবাসিতেন। এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন, তখন তাহার চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইত। ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি, বহিরঙ্গগণের নিমিত্ত হরিনামই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রভু এরূপ সময় জন্মগ্রহণ করিলেন, যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে— প্রভুর মনের অভিপ্রায় তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবেন, তাই গ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা পুরাইলেন।

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহ, ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভু বার মাস উদরে রহিলেন,—কেন, তাহা বলিতেছি। সাধারণতঃ সন্তান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভু আরও পূর্ণ দুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে এই দুই মাস শচীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। কিন্তু তিনি গর্ভের বাহিরে আসিয়া দেহটী শচীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিলেন, সুতরাং স্বভাব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শচীর সেই দেহ পালন করিতে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল ও তাহাতে দেহটী আঘাত পাইতে পারিত,—কিন্তু স্বভাবের ভুল হয় না। কাজেই

পূর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন সে দেহ দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে যেন এক বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপূর্ব্ব লগ্নে। এরূপ শুভলগ্নে কেবল শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, আর কাহাকেও এরূপ সুসময়ে জন্মিতে দেখা যায় নাই। ইহাও যে দৈব হইয়াছে, তাহা উপরের ঘটনা দেখিলে বোধ হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় যে, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুবেলা নিমাইয়ের চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। তাঁহা অপেক্ষা অনেক বড় মুরারি, বড় জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, বড় একটা ভগবান্ মানিতেন না। এক দিবস তিনি বয়স্যদিগের সহিত যোগবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন; মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন। পঞ্চমবর্ষের নিমাই বয়স্য বালকদিকের সঙ্গে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন। মুরারি ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জগন্নাথের বেটাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার থালে মূত্রত্যাগ করিলেন, আর বলিলেন, "মুরারি, হাত্-নাড়া মুখ-নাড়া ছাড়, জ্ঞান ছাড়, বক্তৃতা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবান্‌কে ভজনা কর। যে ব্যক্তি বলে যে সে নিজে ভগবান্, তাহার থালে আমি প্রস্রাব করি।" অবশ্য কাহারও থালে প্রস্রাব করা অন্যায়, কিন্তু ভাবুন নিমাই কি বলিয়া উহা করিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সে পুস্তকের মর্ম্ম এই যে, ভগবান্ বলিয়া আর কোন পৃথক বস্তু নাই, মানুষই ভগবান্। মুরারি তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন।

প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ-অবতার। সুতরাং যোগ-

বাশিষ্টের শিক্ষা আর তাঁহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত। ভক্তিধর্ম্মে বলে —ভগবান মনুষ্যের কর্ত্তা, আর মনুষ্য তাঁহার দাসানুদাস। তাই বালক নিমাই মুরারিকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলেন,—এমন করিয়া, যে তিনি তাহা চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফলভোগ করিতেছি।

আপনারা নিমাইয়ের এই কাণ্ডকে অবশ্য কৃপা করিয়া পাগলামি বলিবেন না। ইহা একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ লীলা। আবার আর এক লীলা শ্রবণ করুন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়া যে সংকীর্ত্তন রচনা করেন, ঠিক সেইরূপ সংকীর্ত্তন পূর্ব্বে এক দিবস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়স সবে পাঁচ ছয় বৎসর। বয়স্য বালকগণকে নিমাই বনমালা পরাইয়াছেন, মধ্যস্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গীরা তাহাকে ঘিরিয়া ঐরূপ নৃত্য করিতেছে। যে বালক নাচিতেছে না, তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন করিতেছেন, আর সেই স্পর্শে শক্তি পাইয়া সে তখন নৃত্য করিতেছে। সেই সময় সেই পথে কয়েকজন পণ্ডিত যাইতেছিলেন, তাঁহারা কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়া তাঁহারা চৈতন্য হারাইলেন, এবং বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা—

"চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভোর গোরা ভূমে গড়ি বুলে॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘ-গম্ভীর স্বরে।
আইস আইস বলি বালক কোলে করে॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাসরে আপনা।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই বালক কান্দে না॥
হেনকালে সেই পথে চলিছে পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভরের খেলা দেখে আচাম্বিত॥

আপনা পাসরি পণ্ডিত সান্ধাইল মেলে।
করতালি দিয়া নাচে হরি হরি ব'লে ॥
হরি বোল শুনি শচী আইলা ত্বরিত।
দেখে পুত্র নাচে যত পণ্ডিত সহিত ॥
পুত পুত বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে ॥
এমত ব্যাভার ভেল পণ্ডিত সভায়।
পর পুত্র পাগল করি উন্মত্তে নাচায় ॥" (চৈতন্যমঙ্গল)

অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়া ধাইয়া আসিলেন এবং পুত্রকে কোলে করিলেন। তখন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, তাঁহারা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তাঁহারা না রাজপথে সর্ব্বলোক সম্মুখে নৃত্য করিতেছিলেন! নিমাই যখন এই লীলা করেন, তখন তিনি মায়ের কোলের ছেলে। এটী নিমাইয়ের বাল্য-চপলতা, না লীলাখেলা?—কি বলেন?

নিমাই পাঠারম্ভ করিলেই দেখা গেল যে, বিদ্যাবুদ্ধির আকর—স্থান যে নবদ্বীপ, সেখানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পাত্র। সেখানে তখন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান রঘুনাথ শিরোমণি। তাঁহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রঘুনাথ নিমাইয়ের বুদ্ধিতে প্রতিভাশূন্য। নিমাই ও রঘুনাথে অনেক দ্বন্দ্বের কথা জনশ্রুতিতে জানা যায়। আর সকল দ্বন্দ্বেই নিমাই জয়লাভ করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, যদি নিমাই আপনার ন্যায়গ্রন্থ রঘুনাথের সান্ত্বনার নিমিত্ত ছিঁড়িয়া না ফেলিতেন। তখন দেখা গেল যে, তিনি নিতান্ত উদ্দেশ্যশূন্য ছিলেন না। তিনি যে দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া নবদ্বীপের ও জগতের পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। নিমাই যখন

বালক, তখন তিনি নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে টোল স্থাপন করেন। আর সে টোলে বহু সহস্র পড়ুয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নানা ঠাঁই॥"
"সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক হইল সবে শুনিয়া বর্ণন॥"

আবার চৈতন্যভাগবতে দেখি যে, প্রভু যখন বঙ্গদেশে যান, তখন সেখানেও তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য হয়, ও তাহারা তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিল। সেই বালক-কালে তিনি ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী করেন, তাহা তখন নবদ্বীপের ন্যায় সমাজে চলিত হইয়াছিল।

নিমাই পূর্ব্বাঞ্চলে কেন গমন করিলেন? তখন তিনি কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনে যে তাঁহার কখনও বাসনা ছিল, তাহা তাঁহার লীলা পড়িলে বোধ হয় না। তিনি কেন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কিছু কিছু জানা যায়। তিনি অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, অথচ পূর্ব্ববঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করা প্রয়োজন। তাই পদ্মাবতী তীরে গেলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কেহ তাঁহার সেখানকার প্রচার প্রণালীর কথা কোন লীলা-গ্রন্থে বলেন নাই। যখন পূর্ব্বাঞ্চলে যান, তখন তিনি একজন বিখ্যাত শিশুপণ্ডিত মাত্র। তাঁহাতে যে ধর্ম্মের কিছু ভাব আছে তাহাও লোকে জানিত না, বরং লোকে তাঁহাকে এক প্রকার নাস্তিক ভাবিত। আবার যখন তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও সেইরূপ

বড়পণ্ডিত, কেবক বিদ্যাচর্চ্চা করেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে যে কোন ধর্ম্মভাবের লক্ষণ আছে তাহা বোধ হইত না। অথচ তখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গে একটী ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আসিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন।
বিশ্বম্ভর দেখি শ্লাঘ্য করয়ে নয়ন ॥
পদ্মাবতী তীরে-তীরে ফিরে গৌরহরি।
সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি ॥
চণ্ডাল পতিত কিবা দুর্জ্জন সজ্জন।
সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥"

আবার চৈতন্যভাগবতে—

"এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথায়।
হেন নাহি জানি কে পড়ে কোন ঠাঞি ॥
সেই ভাবে অদ্যাপিও এই বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী ও পুরুষে ॥"

এইরূপে নবদ্বীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভু লুকাইয়া বঙ্গদেশ উদ্ধার করিলেন। বঙ্গদেশে যাইবার আর একটী কারণ—রঘুনাথ ভট্টকে সৃষ্টি করা। কারণ গোস্বামী রঘুনাথ তাঁহার লীলাখেলার এক অঙ্গ। সে কিরূপে বলিতেছি। একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান লোক তপনমিশ্র আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে প্রভু জিভ কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তপন বলিলেন, "আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমি গতরাত্রে স্বপ্নে জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান্। এখন আমাকে উদ্ধার করুন।" প্রভু বলিলেন, "তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর, সেখানে

তোমার সহিত আমার দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া তপন মিশ্র তদ্দণ্ডে সস্ত্রীক বারাণসী চলিয়া গেলেন, আর একাদশ বৎসর পরে সেখানে প্রভুর দর্শন পাইলেন। অতএব এই লীলাখেলা যিনি পাতাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে, তপনমিশ্রের বারাণসী যাইতে হইবে, সেখানে অবতারের সহিত তাঁহার দেখা হইবে, আর সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু তাঁহার খেলা কার্য্যে পরিণত করিতে শক্ত হইবেন। অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি তাঁহার অধীন ছিল। কি ঘটনা হইবে তাহা তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করিতেন, পরে সেগুলি ঘটাইতেন।

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—যাঁহাকে প্রভুর প্রয়োজন—তপনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপনমিশ্রকে আজ্ঞা করেন "তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর।" এইরূপে প্রভুর লীলার প্রধান সঙ্গীগুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন।

নিমাইপণ্ডিত গয়াধামে যাইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি নদীয়ায় কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাঁহার গঙ্গায় সন্তরণে ভব্যলোক অস্থির হইতেন। ঘাটে লোকে পূজা করিতে আসিয়াছে, তিনি পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকারা ব্রত করিতেছে, তিনি নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইলেন। একটু বড় হইলে সে সব ছাড়িলেন, কিন্তু তবু তাঁহার গাম্ভীর্য্যের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীধরের সহিত কলাপাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, মুকুন্দকে "বাঙ্গাল" "বাঙ্গাল" বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন, বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়া কথা শিখিয়া আসিয়া তাহার দিব্য অনুকরণ করিয়া বয়স্যগণকে হাসাইতেন। পড়ুয়া দেখিলেই তিনি ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার ফাকির ভয়ে অধ্যাপক পর্য্যন্ত অস্থির হইতেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহাকে কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিলে, তিনি সেই গর্ব্বিত গুরুজনকে ঠাট্টা

করিলেন। তবে যখন তিনি টোলে বসিতেন, তখন কাহার সাধ্য যে চপলতা করে। যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, তখনও কয়েক মাস একটু স্থির ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে জন্মাবধি এই চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধতপনা, কেবল পড়ুয়ার দাম্ভিকতা করিয়াছেন। সেই চঞ্চলশিরোমণি, সেই উদ্ধত নবীন-অধ্যাপক, এখন গয়ায় চলিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"গয়াতীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্কারিলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া॥"

এই যে দুই কর জুড়িলেন, ইহা চিরজীবন জোড়াই থাকিল। পরে চক্রবেড়ে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। ইহাতে হইল কি, না—

"অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।
রোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।"
"আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়॥"

পরে রোদন করিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥"

যে নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিলেন তিনি আর ফিরিলেন না, যিনি আসিলেন তিনি আর এক বস্তু। যথা—

"তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ।
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা প্রেমজলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবরে।"

এইরূপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, আর নয়নজলে সেস্থান কর্দ্দমময় হইতে লাগিল। আবার ইহার সঙ্গে ঘন ঘন মূর্চ্ছাও হইতে লাগিল। প্রাতে স্নান করিতে গেলেন, অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া চলিলেন; ক্রন্দন আসিতেছে, কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন। যথা—

"প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে।
প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশির্ব্বাদ করে॥"

গয়া হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্ণবগণকে বলিতেছেন—

"তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঁই॥"

সেই সঙ্গে তিনি ভক্তের সেবা আরম্ভ করিলেন—

"নিঙ্গড়ায়েন বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে॥
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহার দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে॥"

পরে অধ্যাপক-শিরোমণি পড়াইতে গেলেন, পারিলেন না। পড়ুয়ারা প্রশ্ন করে, ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন "কৃষ্ণ বল।" এইরূপে সাত দিন গেল, কাজেই পড়ান বন্ধ হইল। যাঁহার মুখে দিবানিশি হাসি ছিল, এখন তাঁহার দিবানিশি ক্রন্দন। যিনি এত দাম্ভিক ছিলেন, তিনি এখন যাহার-তাহার চরণ ধরিয়া, যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিয়া, দাস্যভক্তি ভিক্ষা করেন। যিনি দিবানিশি বিদ্যাচর্চ্চা লইয়া নিমগ্ন থাকিতেন, এখন তিনি কেবল চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। যথা—

"যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥"

শচী পুত্রকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত বধুকে পুত্রের সমীপে আনয়ন করেন; যথা—

"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥"

পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিমাইয়ের এই কীর্ত্তনে উত্তম ভাবঘটিত কি রাগরাগিণীযুক্ত পদ ছিল না। তবে কি ছিল, না—মুখে কেবল হরিবোল বলা, আর মৃতঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন ও আনন্দে মূর্চ্ছা যাইতেন। ক্রমে কীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া চলিল, ক্রমে নুতন-নুতন লোক এই কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। অগ্রে রজনীতে সামান্য কীর্ত্তন হইত, পরে দিবানিশী হইত ও ইহাতে নদে টলমল করিত। বাসুঘোষের পদ যথা—

"চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে, আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা-গোরা॥"

তথা—ত্রিলোচন দাসের পদ—

"অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী,
ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।
বদন-পূর্ণিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে॥

আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমের ভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে॥

পুলকে ভরল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
রোম-চক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
আধ-বাণী কহে কম্বু কণ্ঠ।

শ্রীপাদ-পদুম গন্ধে, বেঢ়ি দশনখ চান্দে,
উপরে কনক-বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে,
চমকয়ে অমর-সমাজ॥

সপ্তদ্বীপ-মহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব-গৌরহরি, গুণ সঙ্কীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥

সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন,
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমসিন্ধু।

হরি হরি বোল বলে, জগৎ পড়িল ভোলে,
দুকূল খাইল কুলবধূ ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস।
কোটি কোটি কুসুম-ধনু, জিনিয়া বিনোদ-তনু
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমাচান্দে, জিনিয়া বদন-ছান্দে,
তাহে চারু-চন্দন-চন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর্ ঝর্ অমিয়া ঝরে,
জনম-মুগধ পাইল প্রেমা ॥
কি কব উপমা তার, করুণা বিগ্রহসার,
হেন রূপ মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে,
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥”

শ্রীনিমাই বিজয়ার দিন গয়াযাত্রা করেন, আর চারি মাস পরে পৌষ মাসে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়াই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে নদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল, তাহা উপরে লোচনের প্রলাপে কতক প্রকাশ পাইবে। ভারতবাসীরা—কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি যোগী, কি দেবোপাসক—সকলেই শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু নদীয়ায় এমন একদল হিন্দুর সৃষ্টি হইল, যাহাদের হুঙ্কারে, গর্জ্জনে, নর্ত্তনে, মৃদঙ্গের বোলে ও কীর্ত্তনের রোলে, ভব্য নগরবাসিগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, সমাজের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইল, কাজেই নিমায়ের বড় বড় শত্রুর সৃষ্টি হইল। ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। ইহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি।

ইনি তখন গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান। ইনি পরমপণ্ডিত, তাপস ব্রাহ্মণ, দিবানিশি ভজন লইয়া থাকেন। ইঁহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের অবধি ছিল না। শ্রীহট্টের রাজা, কৃষ্ণদাস নাম লইয়া, শান্তিপুরে থাকিয়া ইঁহার চরণসেবা করিতেছেন। এই কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাঁহার বৈষ্ণবতায়, ও নিমাই যে বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। বলিতে কি, তাঁহার বৈষ্ণবতার সহিত অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মতের বড় একটা বিভিন্নতা ছিল না। তবে তাহাদের ঠাকুর শিব দুর্গা কি কালী, আর ইঁহার ঠাকুর বিষ্ণু অর্থাৎ গদাপদ্মাদিধারী চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইয়ের ভজনীয় দ্বিভূজ মুরলীধর। নিমাই নবদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বৈষ্ণবদল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা ও অদ্বৈত আচার্য্যের দলস্থ সকলে, অদ্বৈতের শীর্ষস্থানীয় পদে নিমাইকে বসাইলেন, ক্রমে নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের এ সব ভাল লাগে না। তিনি বলেন, ভজনে নাচন আর গায়ন কেন? আবার বলেন, কলিকালে অবতার কি? শাস্ত্রে ইহার কোন আভাস নাই। একি সামান্য রহস্যের কথা যে, জগন্নাথের বেটা কি না আজ আবার ঠাকুর হইয়া বসিল? যখন অদ্বৈত আচার্য্যের এরূপ ভাব, তখন কাজেই নিমায়ের এক প্রধান কাজ হইল, এই অদ্বৈত আচার্য্যকে বশীভুত করা। ওদিকে অদ্বৈত্যের সংকল্প যে তিনি তাঁহার শীর্ষস্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কখনও জগন্নাথের বেটার অধীন হইবেন না। কিন্তু প্রভু পরিশেষে আচার্য্যকে বশীভুত করিলেন।*

---

* শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে আনিলেন। গৌর-নিতাই যেরূপ ঠাকুর, তিনি সেইরূপ উপাসকদিগের প্রতিনিধি। এই লীলার পুষ্টির নিমিত্ত অদ্বৈতের ন্যায় একজন তেজস্কর ব্যক্তিকে প্রভুর প্রতিদ্বন্দী করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত

নিমায়ের আর এক শত্রু জগাই মাধাই। ইঁহারা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না। মদ্য পান করিতেন, আর নদেবাসীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন। কারণ ইহারা নগরের কোটাল ছিলেন, অস্ত্রধারী সৈন্য কি দস্যু তাহাদের সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ বিদ্যাব্যবসায়ী নগরবাসীরা তাহাদের নামে কাঁপিয়া উঠিতেন। ইহাদের কথা এইরূপ লেখা আছে। "হরিনাম দুই ভাই সহিতে না পারে।"

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে নিতাই ও হরিদাস নগরে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা জগাই মাধাইর নিকট গমন করেন, জগাই "মার" "মার" করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে নগরের লোকের বড় আমোদ হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাইপণ্ডিত বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে। এদিকে নিতাই প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন যে, তিনি আর প্রচার করিতে যাইবেন না। তিনি বলিলেন, "প্রভু, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই মাধাইকে আগে উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম লোকে শীঘ্র গ্রহণ করিবে।" প্রভু দেখিলেন, এই দুইটী মাতালকে বশীভূত করিতে না পারিলে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না।

যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য সমাজে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম হয় যে, সে তিনি কে? তিনি কি আসিয়াছেন, না আসিতেছেন? যদি আসিয়া থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেটা তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাও বলিতেন যে ভগবান্ যে সত্য আসিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? সেই নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগের প্রধান শ্রীঅদ্বৈত পদে পদে প্রভুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সকল পরীক্ষায়ই প্রভু উত্তীর্ণ হয়েন। কাজেই শ্রীঅদ্বৈত তখন মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। যদি অদ্বৈত প্রথমেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন, তবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হে সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক, তুমি যদি প্রভুকে পরীক্ষা করিতে চাও, তবে দেখিবে তুমি তাঁহাকে যেরূপ কঠোর পরীক্ষা করিতে, অদ্বৈত তাহা তোমার পূর্ব্বেই করিয়াছেন।

তৃতীয় শত্রু চাঁদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার প্রতিনিধি, রাজা হোসেন শাহের দৌহিত্র। কিন্তু বলিতে ঘৃণা হয়, নিমায়ের বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়া এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও তাঁহার দলস্থগণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা ভগবানকে মনে মনে না ডাকিয়া চেঁচাইয়া ডাকে ইত্যাদি। কাজীর বহুতর সৈন্য ছিল। তিনি হিন্দুতে হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে লাগিলেন। যেখানে কীর্ত্তন হয়, তিনি সেখানেই যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তখন এরূপ হইল যে, কাজীকে রোধ করিতে না পারিলে আর নিমায়ের ধর্ম্মপ্রচার হয় না। সুতরাং নিমায়ের এই জন্যে বলবান কাজীকে দমন করিতে হইয়াছিল। কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রভু প্রথমে গোপনে শ্রীবাসের প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই মাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ অত্যন্ত অত্যাচারী, তাহাদিগকে চরণতলে আনয়ন করায় প্রভুর নিজ আধিপত্য অনেকটা স্থাপিত হইল। যাহা বাকী ছিল তাহা নগরকীর্ত্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ করিলেন। নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইলে, প্রভুর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, আর তাই সন্ন্যাস লইলেন।

নদীয়ায় গোপনে আর একটি বলবৎ কার্য্য করিলেন। নদীয়ানগরে যতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন, সেখানে তাঁহার মুহুর্মুহু শ্রীভগবান্-ভাব হইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি সেইরূপ নদীয়ায় প্রেমের

বস্তু ভগবান্‌-ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন তিনি সন্ন্যাস লইলেন, তখন তিনি ভক্তির বস্তু,—প্রভু কি মহাপ্রভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি "প্রাণনাথ" বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন। যখন সন্ন্যাস লইয়া বাহিরে আসিলেন, তখন হইলেন, 'গুরু' 'পতিতপাবন' 'অগতির গতি' ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা, বলরাম, রাখালগণ ও গোপীগণের প্রিয় বস্তু ছিলেন। যখন তিনি মথুরায় গেলেন, তখন আর 'প্রাণনাথ' থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের শিরোমণি যে উদ্ধব ও কুব্জা, তাহাদের প্রভু বা কর্ত্তা। শ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে নব-বৃন্দাবন করিলেন, তথায় আপনি কৃষ্ণ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, যশোদা ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি সখা হইলেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়া-নাগরীরা হইলেন তাঁহার প্রেয়সী। শ্রীভগবান্‌কে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবে ভজনা করা যায়। তন্মধ্যে ব্রজের ভজন (অর্থাৎ কান্তভাবে ভজন) সর্ব্বোত্তম। এই প্রেমভজনা কৃষ্ণলীলার সাহায্যে অতি সহজে করা যায়। অতএব প্রভু গোপনে গোপনে জীবের ভজন সুলভ করার নিমিত্ত নদীয়ায় এক পৃথক নিগূঢ় লীলার সৃষ্টি করিলেন। এই ভজনের নাগর তিনি স্বয়ং, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়া-নাগরীরা রাধা ও গোপী। নদীয়ার ভক্তগণ এই ভজনে একেবারে মজিয়া গেলেন, গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভুলিলেন। এই ভক্তগণের মধ্যে কয়েকটী পদকর্ত্তার নাম করিতেছি; যথা—গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ, নরহরি, ত্রিলোচন, নয়নানন্দ, বলরাম, শেখর ইত্যাদি। আর একজন পূর্ব্বে এই ভজনের বিরোধী ছিলেন, পরে অনুগত হয়েন, তিনি বৃন্দাবন দাস। সে কথা পরে বলিব। এখন এই পদকর্ত্তাদিগের কয়েকটী পদ নিম্নে দিতেছি। পদগুলি সম্পূর্ণরূপে দিলে অনেক স্থান লইবে, সেই জন্য স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহাদের

এই পদ দেখিতে লোভ হয়, তাঁহারা পদসংগ্রহ গ্রন্থে এইরূপ অনেক পদ দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে চিত্ত দিয়াছেন, তাহারা এই সমুদয় পদ পড়িয়া পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। যথা পদ--

ধানশ্রী।

"মো মেনে মনু মো মেনে মনু কি খনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে। শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥
চাঁদ ঝলমলি বদন ছাঁদে। দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা। যুবতী উমতি কুলের খোটা॥
তাহে তনু সুখ বসন পরে। গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে॥"

উপরের পদটী পূর্ব্বরাগের। রাধাকৃষ্ণ লীলায় পূর্ব্বরাগের বিস্তর পদ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটীও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল পাইবেন না। আবার দেখুন, এইরূপ পদ যে দুই একজন রচনা করিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়ায় তখনকার কি তাহার পরের যত প্রধান পদকর্ত্তা, সকলেই রাধাকৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌর-নদেনাগরী ভজন আরম্ভ করিলেন। নিম্নের পদটী বলরাম দাসের,-- নব্য বলরাম দাস নহেন, আসল বলরাম দাস। যথা পদ--

ধানশ্রী।

"গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলল, ঢলিল সকল দেশ॥
মনু মনু সই দেখিয়া গোরাঠাম।
বধিতে যুবতী, গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম॥ধ্রু॥
ওরূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরী, পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম, আপনা লিখিল, গোরা-পদ-নখ-ছাঁদে॥"

ধানশ্রী।

"আর একদিন, গৌরাঙ্গসুন্দরে, নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
"কোটী চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢলঢল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনুবর, বিধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জনু, হেরিয়া মুরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুণ বসন পরে।
বাসুঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥"

এইরূপ পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই কয়েকজন, যথা—নরহরি, বাসু, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি প্রসিদ্ধ ও উপাদেয়।

বিভাস।

"সো বহুবল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমায় করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥
লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাঁহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন॥

নতু সুরধুনী নীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণে,
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥"

এই পদে বাসু বলিতেছেন, "তোমরা আমার সমুদয় লও, কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব-ধন, পরাণের পরাণ গৌরাঙ্গকে দাও।

বিভাস।

"করিব মুই কি করিব কি ?
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি। ধ্রু॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটী আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা জনু দেখি॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিনু আমি গোরাচাঁদের মুখ॥
বাপের কুলের মুঞি ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারি॥
পতিব্রতা মুঞি সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে॥
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া॥"

সুহই ?

"সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলি, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে॥
সই, গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি॥

সই, গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, তুলিত কাণেতে তুল ॥
সই, গৌর যদি হৈত মোতি ॥
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি ॥
সই, গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল ॥
সই, গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু ॥"

কিন্তু হে গৌরগত-প্রাণ জ্ঞানদাস। গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া যাহা আছেন, তাই কি ভাল না ?

কামোদ

"সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে ?
সুরধনী তীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে ॥"
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা ॥
সোণার বাঁধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে।
ও চাঁদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পঁহু, বৈভব কো কুহুঁ, ভুবন ভরল যশে ॥"

উপরে কেবল তুই একটী পুর্ব্বরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে নাগর করিয়া মাথুর প্রভৃতি সকল রসের পদ করিয়াছিলেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ গোটা কয়েক মাথুরের পদ দেওয়া গেল, যথা—

করুণ।

"গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥ ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর;
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে বহিবে মোর যৌবনের ভার।
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার॥
বাসুঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥"

ভূপালী।

"হেদে রে পরাণ নিলাজিয়া। এখন না গেলি তনু তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে। মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী! বাসু কহে না রহে পরাণি॥"

পাহিড়া।

"অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া,
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখিগণ, ঘিরি করে রোদন,
তুলা ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জর জর,
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।

নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেল মূছিত,
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণছাড়া,
তাব প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥
যত সহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর,
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর, চলে হে নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥"

শ্রীরাগ

"গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।
সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥
হেন নদায়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া ॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাই মরি ॥"

এইরূপ মান খণ্ডিতা প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের পদটীতে প্রভুকে ধৃষ্ট-নাগর সাজান হইয়াছে।

"অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।"

"নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ বটে,
আর কি পার ছাড়িবারে।
স্থরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন করহে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥"

এ পদটী বৃন্দাবন দাসের। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "কি গো ঠাকুর, তোমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও অরুণ বর্ণের কেন? বুঝেছি, নদীয়া-নাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্তু আমাকে ছুইও না।" ইত্যাদি। এই বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বে লিখিয়াছেন যে, এ অবতারে "শ্রীগৌরাঙ্গ নাগর" বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু পরে আপনি স্রোতে পড়িয়া গেলেন, যাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ উপরের পদ।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভগবানরূপে মুহুর্মুহু প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তখন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে একেবারে না ভুলিলেও তাঁহাদিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন না। শ্রীবাস বলিলেন, "আমাদের গৌরাঙ্গরূপই ভাল।" শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন "প্রভু, তুমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক।" শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত কষ্ট করিয়া আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুই আবার গৌরকে কাল করিলি?"

ইহার মধ্যে একটী বড় রহস্য আছে। যখন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপত্তি তুলিলেন যে, কলিকালে অবতার নাই, তখন ভক্তগণ শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, আছে ও তাঁহার বর্ণ সোণার ন্যায়। অতএব কলির কৃষ্ণ হইতেছেন গৌর। তাহা যদি হইল, তখন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, "দ্বাপরের কৃষ্ণ কাল ছিলেন, আর সে যুগের লোকেরা কৃষ্ণকে ভজন করিয়া

আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের দ্বাপরের ঠাকুরকে ভজনা না করিয়া কলির যে সোণার ঠাকুর গৌর, তাঁহাকে ভজনা করাই উচিত ও প্রসিদ্ধ।"

অনেকে এ কথাও তুলিলেন, "যেমন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া সেখানে নারায়ণ মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া যেই কৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, সেই নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, আমাদের কান্ত আর রহিলেন না, আমাদের কান্ত নদের নিমাই।"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত লীলা করিয়া বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে অসুর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন, সেইরূপ নদেবাসী, যাঁহারা গৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজনা করেন, তাহারা বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর সহিত বিলাস করিয়া, বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া, নদের বাহিরে পাষণ্ড দলন করিতে গমন করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই, বৃন্দাবনে গোপন ভাবে রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে সেখানে রহিলেন। যথা বৃন্দাবন দাসের পদ—

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এ ভাগ্যবান কাহারা? ইঁহারা নদীয়ানাগরী। এই নদীয়ানাগরী কি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা গৌরাঙ্গের সহিত কুলটা হইয়াছিলেন?—না, তাহা নয়। নদীয়ানাগরী তাঁহারা, যাঁহারা গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে অর্থাৎ কান্তভাবে ভজনা করেন। এই নদীয়ানাগরীদের নাম শুনিবেন?—একজন নরহরি, একজন বাসুঘোষ, একজন ত্রিলোচন ইত্যাদি।

কান্তভাবে ভজনা কি? কান্ত মানে স্বামী। স্বামীর নিকট তাহার

স্ত্রী কি প্রার্থনা করেন? ভালবাসা। শ্রীভগবান্‌কে যদি ভালবাসিতে চাও, তবে তাঁহাকে "কান্ত" বলিয়া, কি "প্রাণনাথ" বলিয়া বোধ করিও। কিন্তু যদি তোমার অন্য প্রার্থনা থাকে, যথা—ভবনদী পার হওয়া, কি পাপ মার্জ্জনা, তবে তাঁহাকে "প্রভু" বলিয়া ভজনা করিতে হইবে। অতএব এইরূপ যে সব নাগরী তাঁহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা যে, তাঁহার সহিত তাঁহাদের প্রীতি হয়। অতএব তাঁহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, "হে নাথ, হে প্রাণ, আমি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি। আমার হৃদয়ে এসো, প্রাণ ভরিয়া তোমার চন্দ্রবদন হেরি।"

অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাপ্ত হইত, তবুও যে জন্য প্রভু আসিয়াছিলেন তাহা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই কয়েকটী বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার অবতার। যথা—(১) শ্রীভগবান্‌ কিরূপ বস্তু, (২) তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়; (৩) প্রেম কি ও কিরূপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবদ্বীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যদি নদীয়ায় লীলা সমাপ্ত করিতেন তাহা হইলেও জগতে প্রেমধর্ম্ম থাকিয়া যাইত।

যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন একদিন তিনি রাধার বিরহে অস্থির হইয়া সেখানে থাকিতে না পারিয়া, প্রিয়াকে দর্শন দিতে বৃন্দাবনে আসিলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আসিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমতী ঘোমটা দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি ঐশ্বর্য্যশালী রাজা, ইহাকে আমি ভজনা করি নাই। আমি যাঁহাকে ভজনা করিয়াছি তিনি আমারি মত মাধুর্য্যময়, ঐশ্বর্য্য বিবর্জ্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইলে পুরী গোসাঞি আর তাঁহাকে দেখিলেন না। বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বস্তু গৌরাঙ্গ,—তিনি নাগর। তাঁহার সন্ন্যাসী-রূপ আমি দেখিব না। ঐরূপ পুরুষোত্তম

আচার্য্য, প্রভুর অতি মর্ম্মীভক্ত। প্রভু সন্ন্যাসী হইলে, তিনি রাগ করিয়া কাশীতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, নাম পাইলেন স্বরূপ,—সেই স্বরূপ, যিনি গম্ভীরার সাক্ষী। তিনি প্রভুর সন্ন্যাস-মূর্ত্তি দেখিতে চান নাই বলিয়া প্রভুকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। রাধাকৃষ্ণবাদীরা তখন আর এক কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, পরকীয়া ভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু তাহা গৌর-লীলায় নাই। গৌরবাদীরা উত্তর দিলেন, অবশ্য আছে, যেহেতু প্রভু সন্ন্যাস লইলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তখন পরকীয়া হইলেন।

এইরূপে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম ঠাকুর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন কবিলেন এবং বক্রেশ্বর নিমানন্দ-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের প্রতাপে সে ভজন ক্রমে উঠিয়া গেল। ভজন ত গেল; এমন কি; স্বয়ং গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে। সে বড় আশ্চর্য্য কথা। মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ। এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আসিয়া এ দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন, কি রাধাকৃষ্ণ ভজন, ত পাছের কথা, ভজন পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। অনেকে নাস্তিক হইয়া রহিলেন। যাহাদের এতদূর পতন হয় নাই, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে একটা কল্পনার বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং রাধাকৃষ্ণ লীলারও কোন প্রমাণ নাই। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা,—যাহা গুপ্ত ছিল,—জগতে প্রকাশ হইল। যিনি গৌর-লীলা পাঠ করেন, তিনি প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাঁহার লীলা পড়িয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলার প্রচুর প্রমাণ আছে। তাহাতে জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্। আর তিনি যখন বলিতেছেন, "শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কর", তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে ভজন শ্রীভগবানের অনুমোদনীয়। তাঁহারা তাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজনই করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আর একদল বলিতে লাগিলেন যে, রাধাকৃষ্ণ ভজনের আর প্রয়োজন কি? তাঁহারা নরহরি ও বাসুর পথ ধরিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন ত আমাদের সম্মুখে। রাধাকৃষ্ণ অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌরলীলা যে আমরা এক প্রকার চক্ষে দেখিতেছি। অতএব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন যেরূপ আমাদের জীবন্ত সামগ্রী হইবে, রাধাকৃষ্ণ ভজন কখনও সেরূপ হইবে না।

তাই এখন গৌরবাদীর দলের বড় প্রতাপ। ইহারাই এখন প্রকৃত পক্ষে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভাগবতভূষণ, জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন পুনর্জ্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌর-নিতাইকে দাস্যভাবে ভজনা আরম্ভ করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি তখন শ্রীনিত্যানন্দের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন,—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার দুই প্রিয় বন্ধুকে বলিলেন যে, তাঁহারা নির্জ্জনে ভজন করেন, তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া প্রভুকে আস্বাদ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রচারক, বহিরঙ্গ লোক

লইয়া তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী, তাঁহার অতি নিগূঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম অনিষ্ট হইবে। ভাগবতভূষণের এই কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। তাঁহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পার্ষদগণকে বলিলেন, "আর কেন, যে কয়েক দিন বা কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিব, এখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিব" ও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমরা তাঁহাদের পার্ষদ শ্রীল লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের নিকট শ্রবণ করি। শ্রীভাগবতভূষণের শ্রীগৌরাঙ্গে এতদূর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে, গৌরমন্ত্র না হইলে কোন ভক্তের মন সিদ্ধ হইবে না। তাহাই বলিয়া যিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছেন, তাঁহাকেও তিনি আবার গৌরমন্ত্র দিতেন।

ভাগবতভূষণের এক রহস্যজনক কীর্ত্তি আমরা শ্রীলক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করি। তাঁহারা প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় পদ্মার ধারে এক সাহু জমিদারের বাড়ীতে—তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া—অতিথি হইলেন। জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাঁহার ভয়ে সকলে কম্পিত-কলেবর হইতেন। বাবুটী ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাগবতভূষণ বসিয়া দেখিলেন একখানা খাঁড়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈষ্ণবের বাড়ী খাঁড়া কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের গোড়ামি নাই। আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু দুর্গোৎসবও করি, বলিদানও করি। আপনি কি জানেন না যে, যে দুর্গা, সেই কৃষ্ণ?"

ভাগবতভূষণ অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বেটা পাষণ্ড অস্পৃশ্য পামর! আবার দেখি রসিকতাও আছে। বের হ আমার এখান হইতে,—বের হ, বের হ।" অতি ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে বলিতে ভাগবতভূষণের মনে পড়িল যে, সে বাড়ী ঐ জমিদারের, আর

সে যত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই। তখন ঠাকুর উঠিয়া দলবল লইয়া গ্রামের অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

জমিদার অন্য লোককেই ধমকাইয়া থাকেন, নিজে কখনও ধমকানি খান নাই,—বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে এবং একজন অতিথি দ্বারা। সুতরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। একটু পরে গ্রামের মধ্যে ভাগবতভূষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন, আর অতি দীনতার সহিত তাঁহাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ বলিলেন, "তাই হবে, তবে তোমার এক কার্য্য করিতে হইবে। কল্য প্রাতে এক শত ঢাক আনাইবা, আর তুমি খাঁড়াখানি মস্তকে করিয়া সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পদ্মায় যাইবা, যাইয়া মধ্য-নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর, তবে আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।" জমিদার তাই স্বীকার করিলেন, আর সেই অবধি জমিদার বাবুটি পরম ভক্ত হইলেন।

প্রথম প্রচারক নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি অতি সুন্দর। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, "ভাই তোমাদের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব 'ভজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।' ইহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভুর লীলার উদ্দেশ্য

সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শান্তিপুরে রহে যাই,
মিলিতে জননী ভক্তগণে।
নদেবাসীগণ ধায়, আগে করি শচীমায়,
শান্তিপুরে মিলে গৌরসনে॥
নিশিতে করে কীর্ত্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ,
পিড়ায় বসি শচী হেরে দুঃখে।
শচীর দেখিয়া দুঃখ, মুরারির ফাটে বুক,
কীর্ত্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে॥
শচী বলে শুন গুপ্ত, যাও কর গিয়া নৃত্য,
এ সুখ ছাড়িবে কেন তুমি।
গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, তুমি নৃত্য কর যাই,
তাঁর মাতা কান্দি বসি আমি॥
যুবা পুত্র দণ্ডধারী, কালি যাবে দেশ ছাড়ি,
মোর পুত্রে তোমরা বাস ভাল।
কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বৃক্ষতলে পড়ে রবে,
এল তোদের নাচিবার কাল॥
নিমাই তাদের প্রাণের প্রাণ, বলে থাকে ভক্তগণ,
চোখে দেখি যত ভালবাসা।

নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি তারা নাচে ধিং ধিং করি,
আমি ভাবি বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা ॥
দেখ না চাহি মুরারি, নাচে কত ভঙ্গি করি,
কেহ বা দিতেছে হুহুঙ্কার।
আনন্দের ত সীমা নাই, সন্ন্যাসী হয়েছে নিমাই,
তোদের ভালবাসায় নমস্কার ॥
জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি সুখেতে ওরা নাচে,
একে আমি মরি নিজ দুঃখে।
দুই বাহু তুলে নাচে, পায়েতে নূপুর বাজে,
নৃত্য যেন শেল হানে বুকে ॥
ইহা বলি শচীমাতা, উচ্চৈস্বরে কহে কথা,
বলে "তোরা কীর্ত্তনে দে ভঙ্গ।
সকলে মিলে জুটিয়া, মোর খ্যাপা ছেলে নিয়া,
তোদের লাগিয়াছে বড় রঙ্গ ॥"
ক্রোধে শচী যেতে চায়, মুরারি ধরিল তাঁয়,
তবে শচী নাম ধরে ডাকে।
"শুন নিতাই অদ্বৈত, শ্রীবাস আর যত ভক্ত,
রাখ কীর্ত্তন মাগি এই ভিক্ষে ॥
পুনঃ পুনঃ খায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়,
কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।
বাছারে ছাড়িয়া দাও, তোমরা নাচ আর গাও,
রাত্রি গেল দাও ঘুমাইতে ॥"
বলরাম বলে মাতা, তোমার স্বতন্ত্র কথা,
নিমাই তোমার চিরদিনের ছেলে।

ভক্তগণ বাসে ভাল, ঐশ্বর্য্য তাহে মিশাল,
তোমার প্রেম কাহাতে কি মিলে।"

প্রভুর যখন জগতের সমস্ত কার্য্য শেষ হইল, তখন তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানাভিমানী মূঢ় পণ্ডিতগণ প্রভুকে কিরূপ দেখিত, না—অবশ্য একজন ভক্ত দিবানিশি প্রেমে উন্মত্ত, কিন্তু তাহাতে যে কোন বিবেচনা কি বিচারশক্তি আছে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিত না। কিন্তু প্রভু যদিও প্রেমে মাতোয়ারা, যদিও তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, যদিও তাঁহার বাক্য প্রলাপপূর্ণ, তবু তাঁহার অন্তরে সম্পূর্ণ চেতনা থাকিত। তাহার কত প্রমাণ দেখ।

প্রভু কাজি দমন করিবেন বলিয়া, নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া সকলে আনন্দে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তবু কাজির বাড়ীর দিকে যাইতেছেন, এবং যেই কাজির বাটীর নিকট আসিলেন, অমনি সেই পথ ধরিলেন। তখন দেখা গেল যে, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাঁহার কি করিতে হইবে, তাহা সমস্তই তাঁহার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন নাই।

প্রভু কেন মনুষ্যসমাজে আসিলেন,- মহান্তগণ তাহার নিগূঢ় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। অবতার হইয়া প্রভু জীবের নিমিত্ত কি করিলেন তাহাই আমাদের সমালোচ্য। তাঁহার অবতারের এক কারণ, শ্রীভগবান্ কি প্রকৃতির, জীবকে তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় কারণ, জীবকে শিক্ষা দেওয়া কিরূপে ভজন সাধন করিতে হয়। তৃতীয় কারণ, প্রেমধর্ম্ম—যাহা পূর্ব্বে জগতে ছিল না—তাহার প্রচার করা। আর জীবকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহাই দেখান তাঁহার শেষ কার্য্য।

আর সেই নিমিত্ত তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। যখন সন্ন্যাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তখন এইরূপ দেখাইলেন যে, কেবল বৃন্দাবন গমন করিবেন বলিয়াই ঐ আশ্রম গ্রহণ করেন। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—

"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥"

আবার যখন ভক্তগণকে বলিলেন—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।
যখন সন্ন্যাস লইলাম ছন্ন হইল মন॥"

তখন স্পষ্টাক্ষরে দেখাইলেন যে, তিনি সন্ন্যাস লইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন একটি উপলক্ষ মাত্র। তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ভিতরে একটি মহৎ কারণ ছিল; সেটি এই যে,—কঠিন জীবের হৃদয় কোমল করা। তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম লইবে না, এইজন্য কাঙ্গাল হইলেন। কিন্তু এ কথা একবারও মুখে আনেন নাই, মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভক্তগণ তাহা জানিতে পারিলেন। যথা বৃন্দাবন দাসের পদ—

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে ছেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে ভরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥
শাস্ত্র মদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতার সার তারা স্বীকার না কৈল॥

দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন।
তাদের তরাইতে তাঁর হইল মনন॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয়ে বৃন্দাবন দাস॥"

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে জর-জর, বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন ইহা বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। ইহাতে তাঁহার দুটী কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ছুটিলেন তখন দেখাইলেন,—কৃষ্ণের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, কি বৃন্দাবনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্ন্যাস লইলেন ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা হইবে বলিয়া। হৃদয়ের অভ্যন্তরের ইচ্ছা ছিল যে, জীবকে কাঁদাইয়া তাহাদের হৃদয় তরল করিবেন, আর তখন তাহারা হরিনাম লইতে আপত্তি করিবে না। পূর্ব্বে এ-কথা কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু যেই প্রভু সন্ন্যাস লইলেন, অমনি চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রব উঠিল, আর কঠিন লোকের হৃদয় তরল হইল। তখন সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সকলে বুঝিল। যথা বৃন্দাবন দাসের আর একটি পদ—

নিন্দুক পাষণ্ডীগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥
বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া।
পরিলা কৌপিন-ডোর শিখা মুড়াইয়া॥

সর্ব্বজীবে সম দয়া দয়াল ঠাকুর
বঞ্চিত দাস বৃন্দাবন বৈষ্ণব-কুকুর ॥

হায়! হায়! কি দয়া! এরূপ দয়া অননুভবনীয়! ইহার আর একটি পদ শুনুন—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
আবার নদীয়া এলে ধরিব তাঁর পায় ॥
না জানি মহিমা গুণ বলিয়াছি কত।
লাগাল পাইলে এবার হব অনুগত ॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইলা শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পরিষদগণ।
তাঁরা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত দেখিল প্রকাশ।
কান্দিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥

আবার— নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কান্দিয়া বিকলে।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে ॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥
যদি মোরা নাম প্রেম করিতু গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন ॥

হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার।
পতিত-পাবনে কেন কৈল অস্বীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥

প্রকৃতই যখন সন্ন্যাস লইয়া প্রভু রাঢ়দেশে চারিদিন ভ্রমণ করিয়া নিতাই কর্ত্তৃক শান্তিপুরে আনীত হইলেন, তখন নদীয়া মনুষ্যশূন্য হইল। যথা মুরারির পদ—

চলিল নদের লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিল পশ্চাতে॥
হা গৌরাঙ্গ হা গোবাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল, জিয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
দেখিতে গৌরাঙ্গ-মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সবে হয়ে উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে চলে দুঃখিয়া মুরারি॥

অতএব পদকর্ত্তা মুরারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস লওয়া অবধি প্রভু ঘোর অচেতন ছিলেন। পাঁচদিনের দিন শান্তিপুর আসিয়া তাঁহার সহজ জ্ঞান হইল। তখন যেন জানিতে পারিলেন যে, তিনি মনের আবেগে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জননী কেন, সকলই যেন মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধা-মাতা, যুবতী-ভার্য্যা ও সংসারের সমুদয় সুখ ত্যাগ করিয়া, দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, ঘরের বাহির হইয়াছেন।

তাঁহাকে ভক্তগণ সান্ত্বনা করিবেন তাহাই উচিত। কিন্তু তাহা হইল না, তিনিই ভক্তগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিঙ্গনে, কাহাকে চুম্বনে, কাহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংকল্প করিলেন, প্রভুকে ছাড়িবেন না। তাঁহারা না সকলে এক দিকে? তাঁহার মা না তাঁহাদের সহায়? যেমন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবার সময় গোপীরা তাঁহাকে আগুলিয়া কান্দিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিলে, সমস্ত লোক তাঁহার পথ আগুলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মনুষ্যের সাধ্য নয়; তিনি অবিচলিত চিত্তে চলিলেন। কিন্তু অদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন, তখন প্রভু একটু ফাঁপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী, ভারতী ও অদ্বৈত এই তিনজনকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত অধীর হইলে, প্রভু গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। যথা—

অদ্বৈত-বিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন "অদ্বৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম!
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত-লোকের ন্যায় শোক কেন কর।
সঙ্গে সদা আছি আমি এ বিশ্বাস কর॥"

প্রভু-বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসুঘোষ॥

বাসুঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য পদে জানা যায়। অতএব প্রভু অদ্বৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায়। বলিলেন, "তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন? জীব কি উদ্ধার হইবে না? তুমি কি এই অবতারটা বিফল করিবে? নীলাচলে না গেলে আমার সব কার্য্য নষ্ট হইবে। তুমি ত নিজেই এ খেলা পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ? আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই।" পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু সহজ অবস্থায় কখনও স্বীকার করিতেন না যে, তিনি অবতার। আবার ইহাও বলিয়াছি যে, যখন নিজজনের সঙ্গে থাকিতেন, তখন কখন কখন স্পষ্ট করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতেন; যেমন উপরে ভক্তগণ সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন,—নীলাচলে না গেলে তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না; আর অদ্বৈত তখন সব কথা স্মরণ করিয়া শান্ত হইলেন। বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রভু বলিয়াছেন—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন। যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হলো মন॥" কিন্তু নিজজনের নিকট বলিতেছেন, সন্ন্যাস করার সময় তাঁহার মতিচ্ছন্ন হয় নাই। তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কেবল জীব-উদ্ধার।

প্রভু শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবনে যাইতে নীলাচলে গমন করিলেন, কেন? বৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণ ছুটিয়াছে বলিয়াছেন, সন্ন্যাস করিয়া "কোথা বৃন্দাবন" "কোথা বৃন্দাবন" বলিয়া চারি দিবস কেবল ছুটাছুটি করিলেন। যমুনায় স্নান করিতেছেন ভাবিয়া সুরধুনীতে ঝাঁপ দিলেন আর সেখান হইতে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। কিন্তু যখন শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তখন নীলাচলে চলিলেন, বৃন্দাবনের কথা

আর মুখেও আনিলেন না। ইহার মানে কি? কথা এই, প্রভু ভক্তভাবে বৃন্দাবন ছুটিলেন। কিন্তু ভক্তকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রভুর আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—সেটী জীব উদ্ধার করা। তখন বৃন্দাবনে গেলে তাহা হইত না। তাঁহার বাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থান তখন নীলাচল, তাই নীলাচলে চলিলেন ও বৃন্দাবন ভুলিলেন। কারণ শ্রীবৃন্দাবনে তখন গমন করিলে সকল কার্য্য সফল হইত না কেন, তাহা বলিতেছি। প্রথমত বৃন্দাবন তখন জনশূন্য, দ্বিতীয়ত উহা আগ্রার অর্থাৎ মুসলমান-সম্রাটের রাজধানীর নিকট। সেখানে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার, কি তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা হইত না। তখন নীলাচল ভারতের একটা প্রধান তীর্থস্থান এবং উহা হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার লীলার সহায়তার জন্য সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায়কে প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণের প্রধান, তাঁহার দর্পচূর্ণ না করিলে পড়ুয়া পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন না, আর রামানন্দকে কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন।

বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ঘুরিয়া প্রভু আবার একেবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রূপ সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া নীলাচলে ফিরিলেন। সুতরাং বৃন্দাবন যাওয়া একটি উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপ সনাতনকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা। এইরূপে যদিচ প্রভু সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিতেন, তবু উদ্দেশ্য সব ঠিক ছিল।

প্রভু কোন পথে নীলাচল গমন করেন তাহা লইয়া গণ্ডগোল ছিল, কারণ লীলা-গ্রন্থে যে পথের কথা আছে, তাহা এখন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ ভাগীরথী পূর্ব্বে যে-পথে সাগরে মিলিত হন, পরে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করেন। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়

পরে সাবেক পথ আবিষ্কার করেন। * যাঁহারা এই পথের গতি উত্তমরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সারদাবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কথা কি, প্রভু যখন রামচন্দ্র খাঁয়ের সাহায্যে নীলাচলে গমন করেন, তখন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারিতেন না। কারণ সে পথ একপ্রকার সমুদ্র দিয়া। আবার উহা তখন সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত ও দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্রেব প্রতিজ্ঞা প্রভুকে পাঠাইবেন। তিনিই অধিকারী, আর তাঁহাব অসীম ক্ষমতা; তাই তিনি প্রভুকে ঐ পথে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রভুর এই লীলা-খেলা যে পূর্ব্বে পাতান হয়েছিল তাহার এক প্রধান প্রমাণ, তাঁহার নীলাচলে গমন। তখন যুদ্ধের নিমিত্ত এই পথ বন্ধ বলিয়া কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় স্বয়ং অধিকারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কারণ তিনিই কেবল প্রভুকে পাঠাইতে পারিতেন।

প্রভু মন্দিরের নিকট যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" পূর্ব্বে ভক্তগণের মনে মহা ভয় ছিল যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভু আদৌ নীলাচলে যাইতে পারিবেন না। আবার মন্দিরের নিকট যাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ কি প্রকারে হইবে, কারণ তখন যাত্রীদিগের পক্ষে উহা বড় কঠিন ছিল। যথা পদ,...

"কলহ করিয়া ছলা, আগে প্রভু চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায়।"

রহস্যের বিষয়, ভক্তগণ কথায় কথায় ভুলিয়া যাইতেন যে প্রভু কি

---

* গোবিন্দের কড়চার প্রথম কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্পনাদেবীর সৃষ্ট। তাই তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তাহা যদি হয় তবে আমাদের যতগুলি লীলা-গ্রন্থ আছে সমুদয় ফেলিয়া দিতে হয়। গোবিন্দের কড়চার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা যে কল্পিত, তাহা "গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে।

বস্তু; তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভগবানের সঙ্গ অধিকক্ষণ করা যায় না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্, এ কথা সর্ব্বদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভু কিরূপে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবেন, ও পড়ুয়াগণের স্কন্ধে চড়িয়া (স্মরণ থাকে যেন, প্রভুর এই নিয়ম ছিল যে, যখন কোন নূতন স্থানে উদয় হইতেন তখন হরিনামের সহিত হইতেন) হরিনামের সহিত সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইবেন, এই সমুদয় পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই প্রভু কলহ-ছলা করিয়া অগ্রে গেলেন। ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না।

সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিবার নিমিত্ত প্রভুর কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে থাকিতে হইল। যেই মাত্র এই কার্য্য শেষ হইল, অমনি তিনি দক্ষিণ দেশে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?" "প্রভু বলিলেন, "দাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা।" প্রভুর দক্ষিণদেশে যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার করা, বিশ্বরূপের অনুসন্ধান একটা ছল মাত্র। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইহার বহু পূর্ব্বে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। যদি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন।

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া নূতন এক মূর্ত্তি ধরিলেন। তিনি জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস লইলেন। এতদিন তিনি নিজজনের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। তাঁহাদের নিকট প্রভু কোন কঠোর ভাব ধারণ করিলে তাঁহারা প্রাণে মরিতেন। এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা প্রভুর নাম পর্য্যন্তও শুনে নাই। সুতরাং তিনি দুঃখ পাইলে তাহা নিবারণ করে, কি সহানুভূতি দেখায়, এমন লোক আর কেহ তাঁহার সহিত রহিল

না। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীনিতাই কি অপর কাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই। যাহাকে লইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করেন না। এইরূপ সঙ্গী লইয়া ও সম্বলহীন অবস্থায় প্রভু আলালনাথ ত্যাগ করিলেন। অমনি দুই আজানুলম্বিত বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন। আপনি পবিত্র হইব বলিয়া সেই শ্লোকটি আবার বলিতেছি। যথা—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং॥"

প্রভু আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তাই দেখাইলেন যে, যখন বিপদ সম্ভব, তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরূপে লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, "কৃষ্ণ রক্ষমাং," কি "কৃষ্ণ পাহিমাং," বলিয়া আর সে এরূপ ঐকান্তিক ভাবে যে,—যে শুনিতেছে তাহারই মনে হইতেছে যে, কৃষ্ণ যেন তাঁহার সম্মুখে। সে আরও বুঝিতেছে যে, এরূপ প্রাণভরা ডাক উপেক্ষা করিতে কৃষ্ণ কখনই পারিবেন না। বস্তুতঃ প্রভু আপনাকে বিপদ-সাগরে লইয়া চলিলেন। চিরদিন তিনি অন্য দ্বারা রক্ষিত, যেহেতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল। দিবানিশি শত শত লোক তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। অদ্য তিনি বিদেশে একা। সে দেশ জানেন না, সেখানকার কাহাকেও জানেন না, সে দেশের ভাষা পর্য্যন্ত জানেন না, বিশেষত সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্রও নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দিভাষা অনেকটা সংস্কৃত ও বাংলার মত, কিন্তু দক্ষিণ দেশের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তিনি কোথা যাইতেছেন তাহা কেহ জানে না; এমন কি তিনি যেন

আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন, না—যেখানে কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন! রাত্রি হইল, একটী বৃক্ষতলে বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিলেন। প্রভাত হইল আবার চলিতে লাগিলেন। কি আহার করিবেন, আর কোথা আহার পাইবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন চিন্তা নাই। এদিকে প্রভু বিভোর ভাবে মুহুর্মুহু ডাকিতেছেন,—"কৃষ্ণ পাহিমাং!" কৃষ্ণ করেন কি, কাজেই তাঁহার আহার যোগাইতে হইতেছে, তিনি না যোগাইলে আর কে যোগাইবে? না যোগাইলে, গীতায় কৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা যে বিফল হয়। সম্মুখে ব্যাঘ্র পড়িল, প্রভু লক্ষ্যও করিলেন না। কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে "কৃষ্ণ রক্ষমাং" বলিয়া, আপনার রক্ষার দায় কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইলেন। প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খা'ন, সেইজন্য নিতাই, অদ্বৈত, নরহরি, স্বরূপ প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্ব্বদা দুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। এখন তিনি শত আছাড় খাইলেও তাঁহাকে রক্ষা করে, এমন কেহ নাই। প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেবকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাবরী-তীরে রামরায়ের নিকটে আসিলেন, এবং সেখানে অদ্ভুত সাধ্যসাধন নির্ণয়রূপ বিচার উঠাইলেন। এ সমুদয় লীলা তৃতীয় খণ্ডে পাইবেন। প্রভু সেখান হইতে বিদায় হইবার সময় রামরায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইব।" দক্ষিণ দেশে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিতে হইবে বলিয়া, প্রভু সে দেশে অসীম-শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। সে ব্যক্তি এরূপ শক্তি পাইলেন যে, তিনিও শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। আবার তিনি যাঁহাদিগকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাঁহারাও শক্তিসঞ্চার করিবার শক্তি

পাইলেন। এইরূপে প্রভু এক একজনকে আলিঙ্গন করিয়া দেশকে দেশ ভক্তিতে ভাসাইতে লাগিলেন। এ কথা বিস্তার করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রভুর দক্ষিণদেশের লীলা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। এখন উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি। কাজেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে এক কথা দুইবার বলিতে হইতেছে। বোধ হয়, পাঠক সে নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণে গমন

কি করিব কোথা যাবো কি কর্ত্তব্য মোর। না জানিয়া বসে ছিনু চাই মুখ তোর॥
এক বছর গেল পহুঁ আর বছর এলো। আশাপথ চেয়ে চেয়ে আঁখি আন্ধা হলো॥
নব অনুরাগ-কালে পানু কিছু সুখ। সে সব স্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক॥
চবণী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে। বান্ধা ঘাটে বসে ছিনু একলা বিকালে॥
এই ত ফাগুনে তোমা সনে পরিচয়। ভুলিলাম দেহ গেহ তোমার চিন্তায়॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নাহি মনে হয়। সেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময়॥
পানু নব জন্ম, দেখি সব সুখময়। রসেতে পূরিল চির-নীরস হৃদয়॥
একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোসর। রসে ডগমগ তনু আনন্দে বিভোর॥
হিয়া আশাশূন্য ছিল, ভুবন আন্ধার। পহিলা জানিনু তুমি আছহ আমার॥
তোমা কথা শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া। সুখের তরঙ্গে চলি ভাসিয়া ভাসিয়া॥
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ। আমারে না নিয়া গেলে করি তোমা সাথ॥
এখানে থাকিয়া আমি কি কাজ করিব। হেন শক্তি নাই লীলা আবার লিখিব॥
বলরামের মনে বিন্ধি আছে এই শেল। তুমি কি পরম-বস্তু জীবে না জানিল॥

প্রভু দক্ষিণে এরূপ কঠিন জীবসকল পাইলেন, যাহাদের উদ্ধার করিতে নব নব পন্থা অবলম্বন করিতে হইল। প্রভু পথে যাইতে ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস করে তাহা নয়, সেখানকার রাজাও বৌদ্ধ। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে বৌদ্ধগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে নাই, তাহাদের সহিত কথা কহিতে নাই, তাহাদের মুখ দর্শনও করিতে নাই। কিন্তু প্রভুর সে মত নয়, তাহা আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন। তাঁহার মত এই যে—যে যত অধিক পতিত, সে তত অধিক কৃপাপাত্র। প্রভু চিরদিন তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছেন, এবং কর্ত্তব্যেও তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিতে আসিল, এবং তাঁহাকে ইহাতে অনিচ্ছুক নয় দেখিয়া মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একজন পদস্থ হিন্দুকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। শেষে রাজা স্বয়ং এবং বৌদ্ধগণের কর্ত্তা রামগিরি সেই বিচারে যোগ দিলেন। প্রভু সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিবা মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহা দেখিয়া রামগিরির অঙ্গ আনন্দে পুলকাবৃত হইল। অমনি প্রভু বলিলেন, "হে ভক্তবর! তোমার সহিত কি তর্ক করিব? তুমি পরম কৃপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও।" প্রভু বলিলেন—"হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন। মাথার ঠাকুর সে এই ত কথন॥" ইহা শুনিয়া রামগিরি অতিশয় বিচলিত হইলেন। যথা—"শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিরি রায়। অমনি আছাড় খাঞা পড়িল ধরায়॥" তারপর প্রভুর চরণ ধরিয়া রামগিরি বলিলেন,—"সর্ব্বজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল। দয়া করি রাঙ্গা পায় দেহ মোরে স্থল॥" মনে করুন ইঁহারা মহাপণ্ডিত লোক। পাণ্ডিত্যের সাহায্য লইলে ইঁহাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা কখনই সহজ হইত না,

কেবল কচকচি বাধিয়া যাইত। কিন্তু প্রভু সে পথে না যাইয়া ভগবানের মাধুর্য্যরূপ যে মধু তাহার একবিন্দু তাঁহার বদনে দিলেন, আর অমনি রামগিরি ধরা পড়িলেন। যিনি যত বড় নাস্তিক হউন, সকলের হৃদয়েই ভক্তির বীজ আছে। কোনক্রমে উহা একবার জাগরিত করিতে পারিলে তাহাদের নাস্তিকতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রামগিরি প্রভুর শ্রীপদে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ইহাতে—"পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ। রামগিরি পথে সব করিল গমন॥"

গোবিন্দের কড়চায় যে ত্রিমন্দ নগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামৃতে তাহাকে ত্রিমট বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণের সহিত প্রভুর বিচার উহাতে এইরূপে বর্ণিত আছে—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত বিজন-বনেতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল বলিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি মিলিলা প্রভু তাদের উদ্ধারিতে॥

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া ঢুণ্ডিরাম-তীর্থ বিচার করিতে গেলেন। সেই স্থানের নিকট ঢুণ্ডিরামের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের যিনি গুরু, তিনি ঢুণ্ডিরাম খ্যাতি পাইয়া থাকেন। ঢুণ্ডিরাম এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ অগণন॥
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥

গোবিন্দের কড়চায় ঢুণ্ডিরাম সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে—

"অহংকারে সদা মত্ত পণ্ডিতাভিমানি।"

সর্ব্ব-শাস্ত্রে পণ্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের একমাত্র সুখ বিচার করা ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা। এই ইহাদের চরিত্র। প্রভুকে অতি উত্তম একটী শিকার পাইয়াছেন ভাবিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সম্মুখে বসিলেন। কিন্তু প্রভুর বদনপানে চাহিয়া এরূপ বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার মুখে বিচার করিবার স্পৃহা আর রহিল না। প্রভুর বদন মলিন ও নয়ন করুণায় পূর্ণ দেখিয়া ঢুণ্ডিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পরে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন—

প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র আমি লিখে দিব সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোসাঞি।
কার সাধ্য তর্কে শাস্ত্রে জিনে তব ঠাঞি॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্তদর্শন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকট হার মানি॥
আগেকার ঢুণ্ডি চেয়ে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবন বিদিত॥

প্রভু করজোড়ে বলিলেন, "আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, আমি তোমায় পারিব না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন করুন, আমি আপনাকে জয়পত্র লিখিয়া দিতেছি।" কিন্তু—"যাইতে নাহি চাহে ঢুণ্ডি, চারিদিকে চায়।" ঢুণ্ডিরাম গেলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে প্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। ঢুণ্ডিরামের ঢুণ্ডিরামত্ব গেল, তাঁহার আশ্রম গেল ও তাঁহার

নাম হইল 'হরিদাস"। ঢুণ্ডিরামের উদ্ধারের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে তীর্থ দর্শন করেন, তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

প্রভু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থ দেখিলেন ও মহেশকে প্রণাম করিলেন; সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছুদূর পশ্চিমে অহোবলের নৃসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, এবং সেখান হইতে সিদ্ধবট গেলেন। সেখানে এক পরমভক্ত বিপ্র দিবানিশি রামনাম জপিতেন, তাহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিলেন, করিয়া পরে সকলে দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে সিদ্ধবটে ফিরিয়া সেই ব্রাহ্মণবাড়ী আবার আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণনাম জপিতেছেন। প্রভু ইহাতে হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? রামনাম ত্যাগ করিয়া এখন কৃষ্ণনাম ধরিয়াছ?" তাহাতে—'বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।"

প্রভু দক্ষিণে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহা বর্ণনা করিবার অগ্রে তিনি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণদেশ উদ্ধার করেন, তাহার কিছু আভাস দিতে হইতেছে। প্রভু রাধার ঋণ শোধ দিতে অর্থাৎ জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শুধু নদীয়া কি শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহার সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে। তাই দক্ষিণাভিমুখে দৌড়িলেন, সময় অল্প অতএব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা, এক জনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা বহু জনকে উদ্ধার করা।

ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রভু অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। যথা, তর্কে পরাজয় করিয়া। তবে তাঁহার তর্কে এই গুণ ছিল যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ না করিয়া কৃতজ্ঞ

হইয়া অনুগত হইত। কাহাকে আপনার দৈন্যে, কাহাকে আপনার ঔদার্য্যে, কাহাকে আপনার মধুর চরিতে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা দুই একটী শ্লেষবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা একটী অতি বলবৎ যন্ত্র ছিল, যাহা দ্বারা তিনি জীবকে মোহিত করিতেন,—অর্থাৎ "জীবে দয়া" ও "ভগবানে প্রেম" দেখাইয়া। তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কি বলিব। তিনি এক গালে চপেটাঘাত খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতেন না। সে তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। তবে কেহ এমত ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিতেন। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তাঁহার আপনার জয়-পরাজয় বোধ ছিলনা। সর্ব্বদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া অন্যকে মান দিতেন। যে যত অপরাধী তাহাকে তিনি তত বেশী কৃপা করিতেন। এই যে সমুদায় বলিলাম ইহা যে অত্যুক্তি নয়, তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রভু দক্ষিণে যে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়। প্রভু মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং সে দেহ স্বভাবের নিয়মের অধীন। উপবাসে ও অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, অধিক পথশ্রমেও কষ্ট হয়। প্রভুর এ সমুদায় হইতেছে, তাহাতে হইয়াছে কি, না সেই প্রকাণ্ড দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, যেন চলিতে পারেন না, চলিতে অতিশয় কষ্ট হয়। সোনার অঙ্গ সর্ব্বদা ধূলায় ধূসরিত। প্রভু সিদ্ধবটেশ্বর গেলেন, যাইয়া সেখানকার শিবকে প্রণাম করিলেন। সে রাত্রি আর আহার জুটিল না। পর দিবস প্রাতে যাহা জুটিল তাহাই সেবা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন।

অং.পর্মশক বলিয়া রাখি, প্রভুর এরূপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে হইত

না। কারণ যখন যেখানে যাইতেন সেখানে অমনি লোকের কলরব ও হরিধ্বনি হইত, এবং প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী ও রাশি-রাশি বস্ত্র প্রভৃতি দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে একটী লীলা করিবেন মনে আছে, তাই চুপে চুপে আসিয়া সামান্য অবস্থায় রহিলেন। ঠিক যেন একটী সামান্য সন্ন্যাসী। সেখানে তীর্থরাম আসিলেন। তিনি সওদাগর, অভক্ত, খুব ধনবান। সেই সামান্য নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হইল। একে যৌবনমদে ও ধনমদে মত্ত, আবার চরিত্র অতি-মন্দ, সুতরাং মন্দ কার্য্যেই আনন্দ। তাহার ইচ্ছা হইল যে নবীন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন। আর সেই অভিপ্রায়ে দুইটী বেশ্যা আনিয়া উপস্থিত করিলেন; তাহাদের নাম—সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই। যথা—"সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।

প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥"

বেশ্যাদিগের কি কি করিতে হইবে, তাহা তীর্থরাম তাহাদিগকে শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর সেখানে যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, মজা দেখ, সন্ন্যাসীর যত ভারিভুরি সব এখানে বাহির হইবে। এখন বেশ্যাগণের কাণ্ড শুনুন—"কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবাই হাসে।

সত্যবাই হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥"

প্রভু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। তাহাতে সত্য একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। যেন অন্যমনস্ক হইয়া সে অঙ্গের আবরণ ফেলিয়া দিল। ঐরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিলে, প্রভু তখন তাহার দিকে চাহিলেন। সে চাহনীতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল যে প্রভুর চক্ষু দিয়া কারুণারস ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে। সেইরূপ দৃষ্টি সে আর কখনও দেখে নাই,—সে অতি পবিত্র। দেখিয়া বুঝিল যে ইঁহার বিকার নাই, যেন ইনি মনুষ্য নহেন—দেবতা। প্রভু তাহার

দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "কি মা, তুমি কি চাও ?" প্রভুর সেই দৃষ্টির পর যখন তিনি সত্যবাইকে "মা" বলিয়া ডাকিলেন, তখন বেশ্যার হৃদয় হইতে রঙ্গরস দূরে পলাইল। সে কাঁপিতে লাগিল। লক্ষ্মীও বড় ভয় পাইল। তাহারা প্রভুর মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছে যে— "কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।" আর কি কি দেখিল তাহা তাহারাই জানে। তখন সত্যবাই, যে লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক অপরাধী, একেবারে প্রভুর চরণে পড়িল।

তখন প্রভু তটস্থ হইয়া বলিলেন "আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা, আমার চরণে পড়িয়া, "কেন অপরাধী কর আমারে জননি!" প্রভু আর বলিতে পারিলেন না, কথাগুলি বলিয়াই অমনি "পড়িলা ধরণী।"

সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিল প্রভু, বলি হরি হরি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়।
অঙ্গ হতে অদভূত গন্ধ বাহিরায়॥

তীর্থরাম সব দেখিতেছেন। প্রথমে সত্যকে যখন প্রভু মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন প্রভুর মুখ দেখিয়া, মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরো করিত। তীর্থরামের তখন বেশ বোধ হইয়াছে যে, সন্ন্যাসী ত ভণ্ড নয়, বরং বড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ যে উপায় তাহাই অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু প্রভু তখন একেবারে অচেতন। তীর্থ যে চরণে পড়িলেন তাহা তাঁহার গোচর হইল না, তাই ধনবান যুবক প্রভুর

চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভু তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই অচেতন অবস্থায় প্রভু সত্যকে উঠাইলেন, আর তাহাকে বাহুতে ছাঁদিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল, মুকুন্দ মুরারিকে ডাকো।"

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহ্যজ্ঞান।
ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
আছাড়িয়া পড়ে, নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিড়ে গেল কণ্ঠ হতে মালিকার গোচা॥
আর, পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন ষড়যন্ত্রকারী তিনজন, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশ্যাদ্বয় মৃতপ্রায় হইয়াছে। তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া, তখন অতি কঠিন যে, তাহারও দ্রব হইবার কথা। যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা তীর্থরামের কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্য যখন অচেতন প্রভুর পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাহারা ভাবিতে লাগিলেন বেশ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাব তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না, তীর্থরামের কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতেছেন দেখিয়া, তাহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল।

এদিকে প্রভুর ভাব শুনুন। প্রভু একটু পরে চৈতন্য পাইলেন, এবং তীর্থরামকে উঠাইয়া অতিপ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পুর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু এক গালে মার খাইলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষাও অধিক করিতেন, তাহার নিদর্শন পুর্ব্বে দেখুন। তীর্থরামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি, আমি অপবিত্র অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলেন!" প্রভু উত্তরে বলিলেন—

"পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।

ঐশ্বর্য্যে তীর্থরামের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল। কারণ স্বভাবতঃ তিনি ভক্তিমান ব্যক্তি, তাই অন্তর্যামী প্রভু তাহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এত ভঙ্গী উঠাইলেন। তৎপরে প্রভু তাহাকে কিছু উপদেশও দিলেন। যখন তীর্থরামের বিষয়ে একেবারে বিরক্তি হইল, তখন বিষয় ছাড়িলেন। তিনি উদাসীনের পথ অবলম্বন করিতেছেন শুনিয়া, তাহার অতি সুন্দরী ভার্য্যা কমলকুমারী ছুটিয়া আসিলেন, এবং পতির চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বাড়ী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না।" ইহাতে—

কমলে বলিলা তীর্থ, কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥

তীর্থরাম আর বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন না, সেই হইতেই পথের ভিখারী হইলেন। তাহার পরে, আহারীয় দ্রব্যের সহিত—

কত লোকে কত বস্ত্র আনি জুটাইল।
কিন্তু এক খণ্ডও প্রভু হাতে না ছুইল॥

সেখান হইতে প্রভু নন্দীশ্বর চলিলেন। পথে দশ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল পার হইয়া প্রভু মুন্নানগর পাইলেন; কিন্তু নগরে প্রবেশ না করিয়া, উহার নিকটে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহারা দুইজনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় দুইটী নগরবাসী সেখানে আসিলেন এবং প্রভুকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইতেছে। কিরূপে কে জানে, ইহার মধ্যে নগরে ধ্বনি হইয়াছে যে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গের তেজ আগুনের ন্যায়। ইহা শুনিয়া নগরবাসী দলে দলে আসিতে লাগিল, এবং ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রভু কিন্তু একেবারে নীরব। এত লোক যে একত্র হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তিনি একেবারে লক্ষ্যই করিলেন না। সকলে তখন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "স্বামী নগরে চলুন।" কিন্তু

"প্রেমে মত্ত মোর প্রভু শুনে নাহি কথা।"

এই যে সেই স্থান লোকারণ্য হইল, প্রভু কি কোন চর পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া ছিলেন? ডাকাইলেই বা তাহারা আসিবে কেন? লোক আসিল কেন, না—প্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে। ক্রমে যখন কলরব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—

"অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিলা।"

তখন সমুদায় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। এবং সেই বৃক্ষতল শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পরিণত হইল। এইরূপে সমস্ত লোক সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিয়া কাটাইল। প্রভাত হইলে প্রভু চলিলেন, আর সেই সকল লোক প্রভুকে থাকিতে মহা জিদ কবিতে লাগিল। কিন্তু—"প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল।"

সেই সময় এক ভিখারী রমণী প্রভুর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা মাগিল। সে ভক্তি-ভিক্ষা নয়, অন্নবস্ত্রের ভিক্ষা, যাহা প্রভুর দিবার শক্তি ছিল না। দরিদ্র রমণীর পরিধান জীর্ণবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ। কিন্তু দারিদ্র্যের নিমিত্ত এরূপ জ্ঞানশূন্য স্বার্থপর নীচ হইয়াছে যে, যদিও দেখিতেছে প্রভু একজন কাঙ্গাল সন্ন্যাসী, তাঁহার দিবার কিছু নাই, তবু তাঁহার কাছে হাত পাতিতে ছাড়িল না। আমরা হইলে তাহাকে দূর-দূর করিতাম, কিন্তু প্রভু আমার তাহা করিলেন না। তাঁহার দয়া হইল, কিন্তু আপনার ত কপর্দ্দক মাত্র নাই, দিবেন কি? তাই প্রভু ঈষৎ হাসিয়া মুন্নাবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন। ইহাতে—

মুন্নাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া।
রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া॥
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়।
সে কারণে রাশি রাশি আনিয়া জোগায়॥
সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে।
গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে॥

সকলেই প্রভুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, "আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য, ইহা আগে গ্রহণ কর।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার তো কাপড় পরিতে নাই, আর একমুষ্টি অন্ন পাইলে আমার যথেষ্ট। তোমরা এত অন্ন দিলে আমি লইয়া যাইব কিরূপে? এক কাজ কর, আমি ভিক্ষা পাইলাম, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ভগবান তোমাদের ভালো করিবেন। তোমরা এই সমুদায় অন্নবস্ত্র এই দুঃখিনীকে দাও।" তাহারা তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন প্রভু দ্রুত চলিলেন। বহুতর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত চলিল, কিন্তু প্রভু কাহারও কথা শুনিলেন না। পরদিন দুই প্রহরে বেঙ্কটনগরে পৌছিলেন।

পুর্ব্বদিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই, পরদিবস দুইপ্রহর পর্য্যন্ত হাঁটিলেন, কাজেই প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ এইরূপ কঠোর জীবন-যাপনে দুর্ব্বল হইতেছে। বেঙ্কটনগরে প্রভু তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতিবড় একজন বেদান্ত-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পণ্ডিত।" কিন্তু পণ্ডিত ছাড়েন না। তখন প্রভু তাহার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন।

তাহার তত্ত্বগুলি যে সারহীন ইহা সেই ব্যঙ্গতে বুঝা যাইতে লাগিল। প্রভু রহস্য করিতেছেন, আবার হাস্যও করিতেছেন। যদিও প্রভু ব্যঙ্গচ্ছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহাতেই নিরুত্তর হইতে লাগিলেন। শেষে এই পণ্ডিত—ইনি সন্ন্যাসী, নাম রামানন্দ স্বামী—প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার সকল শিষ্য হরিনাম লইলেন। কাজেই—

"মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা।
কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা॥"

শ্রীচরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন—

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কটায়ে চলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয়।
পাননৃসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥

পানানৃসিংহে আসিবার পূর্ব্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা করেন। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে, সেটি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে, বৌদ্ধগণ বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পতিত করিবার ও কষ্ট দিবার নিমিত্ত একটি ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা একখানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থালি আনিয়া প্রভুকে বলিল, "ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন।" প্রসাদ লইতে প্রভু হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই সময় একটী পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ঐ থালি লইয়া উড়িল, পরে উহা এরূপ ভাবে ত্যাগ করিল যে, উহা তেরচা হইয়া বৌদ্ধগণের যে আচার্য্য তাহার মাথায় পড়িল। তাহাতে তাহার

মাথা কাটিয়া গেল ও আচার্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৌদ্ধগণ প্রভুর শরণ লইল। প্রভু বলিলেন, তোমরা কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে উনি বাঁচিবেন। এইরূপে সকলে বৈষ্ণব হইল।

কিন্তু এ কাহিনী আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ প্রভুর লীলায় এরূপ অলৌলিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুঝা যায় এরূপ দৈববলের সহায়তা গ্রহণ করা প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। বিশেষতঃ এ অবতারে দণ্ড নাই, দৈব-বল প্রয়োগ নাই, ভয়-প্রদর্শন নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই যে বৌদ্ধগণ প্রভুর সহিত বিচার প্রার্থনা করে, প্রভু কোন কথা না বলিয়া কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতে থাকেন, পরে ভাবে উন্মত্ত হন। বৌদ্ধগণ সেই তরঙ্গে পড়িয়া গেল এবং প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল। তাহাদের সেই মুহূর্ত্তের বৈষ্ণবতা দেখিয়া প্রভু পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। "পক্ষিচঞ্চুচ্যুত ভাণ্ডে মস্তক ভঙ্গ হওয়ায় বৌদ্ধগণ বশীভূত হইলেন," ইহা অপেক্ষা, প্রভু তাহাদিগকে হৃদয় বিগলিত করিয়া ভক্তিদান করিলেন, এরূপ প্রথা প্রভুর যে অনুমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। প্রভু তিন দিবস বেঙ্কটনগরে ছিলেন, থাকিয়া নগরবাসীদিগকে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। সেই সময় প্রভু শুনিলেন যে নিকটে বগুলার বন আছে, সেখানে দস্যু পন্থভীল বাস করে। সে পথিক পাইলে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত এবং কখন কখন বধ করে। প্রভু শুনিবামাত্র সেখানে চলিলেন। তখন নগরের প্রধান লোক সকল প্রভুকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে,—"পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা কিছু বুঝিবে না, আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। আপনার সেখানে যাওয়া বিবেচনা সিদ্ধ নয়।" কিন্তু প্রভু কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, সেই বনপানে

চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে, তাহার যে সম্পত্তি—বহির্ব্বাস, কৌপীন, করোয়া ও খড়ম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু সেখানে তিন রাত্রি বাস করিলেন, এবং ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন,—"তুমিই প্রকৃত সাধু। সাধুগণ বনে থাকেন তুমিও বনে থাক। সাধুগণের সংসার কি পুত্র কন্যা নাই, তোমারও তাহা নাই। অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।" পন্থভীল প্রভুর কথা শুনিল, প্রভুর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রভু তখন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পন্থভীলের ভক্তি উথলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল শেষে সমুদায় দস্যুগণ সেই নৃত্যে যোগ দিল।

সেই দিন হইতে পন্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥

* * *

লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি॥
হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বন করিলেক আনন্দ-কানন॥

দস্যু দমনের এই এক নূতন পদ্ধতি। ফল কথা, প্রভু চিরদিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে সুপথে লইয়া গিয়াছেন। "পক্ষী থালি লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথা ভাঙ্গিয়া দিল," এইরূপ ভাবে দুষ্ট দমন তাঁহার অনুমোদিত নয়। যখন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তখন পাছে প্রভু ক্রোধ করিয়া মাধাইকে শারীরিক দণ্ড দান করেন, সেই ভয়ে নিতাই বলিয়াছিলেন "প্রভু, যে অপরাধ করে তাহাকে যদি দণ্ড দিবা তবে কৃপা, কাহারে করিবা? প্রভু, আমি তোমায় স্মরণ করাইয়া দিই যে, এ

অবতারে তোমার দণ্ড দান করিবার অধিকার নাই। তুমি না বারবার বলিয়াছ যে, "এ অবতারে দণ্ড দিবা না, কৃপা করিবা ॥" প্রভু কি ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন, তাহার সেই বর্ণনাটী অতি উপাদেয় বলিয়া, এখানে গোবিন্দের করচা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া
চলে মোর ধর্ম্মবীর আনন্দে ভাসিয়া ॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে।
তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥
সে দেশের লোক সব করে কাইমাই।
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই ॥
কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর।
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর ॥
যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার।
ছাড়িয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার ॥
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর।
ভক্তি-সাগরে বাঁধ কাটিল আবার ॥
উথলিয়া ভক্তি-সিন্ধু ডুবাইল দেশ।
কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈল দরবেশ ॥
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ হৈলা সেইখানে।
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে ॥
এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর।
গড়াগড়ি দেন প্রভু হইয়া বিভোর ॥
জড় সম কখন না থাকে বাহ্যজ্ঞান।
পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান ॥

আধ নীমিলিত চক্ষু যেন মৃতদেহ।
এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ ॥
কাঁটা খোঁচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া ॥
ত্রিরাত্রি কাটিয়া গেল গাছের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় ॥
বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুধারা।
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা ॥
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
আতিথ্য করিল তবে আটা চুণা দিয়া ॥

এ সমুদায় কেন? না, জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন। যাহারা এরূপে উপকৃত হইতেছে, তাহারা জানিতেছে না যে তিনি কে? তৎপর সেথান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত, আর শিবের বিগ্রহ স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্থাপিত। "বড় এক বিল্ববৃক্ষ আছে সেইখানে।
পোয়া পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে ॥"

এই মন্দিরের তিন দিক পর্ব্বত কর্ত্তৃক বেষ্টিত। এখানে একটি সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর মিলন হয়, যাহা শুনিলে বুঝা যায় যে শাস্ত্রে যে যোগীদিগের কথা বর্ণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামান্য-সন্ন্যাসী ও ভণ্ড-সন্ন্যাসী দেখিয়া-দেখিয়া এখন লোক আর যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করিতে চাহে না। প্রভু এই মন্দিরে তুই দিবস কাটাইলেন,—কিরূপে, না—প্রেমেতে বিভোর হয়ে—"আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়েন ধরায়।
কভু হাসি কভু কান্না পাগলের প্রায় ॥
দরদরে অশ্রু পড়ে ধারা অবিরত।"

দুই দিবস এইরূপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভুর কাটিয়া গেল, মোটে চেতন হইল না। তিন দিনের দিন একটি জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড় হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ। তিনি আসিয়া আপন মনে শিবকে পূজা করিয়া, কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্ব্বতোপরি গমন করিলেন। সন্ন্যাসীর দেহটী যেন একখানি "পোড়াকাঠ"। প্রভু যেই চেতন পাইলেন, তাঁহার সঙ্গী সাহস করিয়া প্রভুকে সেই সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন। শুনিবামাত্র প্রভু সেই পর্ব্বতোপরি চলিলেন। প্রভু সচরাচর এক দিনের অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এই নির্জ্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন বোধ হয় এই সন্ন্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিবেন বলিয়া। প্রভু চলিলেন। ক্রমে পর্ব্বতোপরি যাইয়া দেখেন যে সন্ন্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, একেবারে ধ্যানে মগ্ন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

প্রভু প্রথমে সন্ন্যাসীকে বিনয় করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তখন প্রভু দাঁড়াইয়া জোড়হস্তে তাঁহাকে স্তব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন, করিয়া প্রভুর পানে চাহিলেন। চাহিয়া যেন অতি আনন্দের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। এই পোড়াকাষ্ঠের মুখে হাসি, ইহাও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু বসিলেন। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন।" প্রভু কৃষ্ণকথা আরম্ভ করিলেন, এবং ভাবে বিভোর হইলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। এবং "চরণে চরণ বান্ধি পড়িল তখন ॥

প্রভু সেই পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন—

কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায় ॥

মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরারায়॥

সন্ন্যাসী তখন এক নূতন জগত দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম শ্লোক লইয়া কত কাণ্ড করেন, তাহা আপনারা জানেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, যে সমুদায় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন তাহারাও তুলসীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লোভ করেন। এই তত্ত্বটি পূর্ব্বে কেবল শ্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রভু তাহার সারত্ব দেখাইলেন। এই সন্ন্যাসীটি আত্মারাম ও নিগ্র্ন্থি বটে। এখন তুলসীর গন্ধ পাইয়া—

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দতে লাগিল॥
পোড়াকাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস।
খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস॥
শ্মশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।
প্রেমে সেই পোড়াকাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল॥

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। যাঁহারা মনের সমুদায় কমনীয় ভাব নষ্ট করিয়া শুধু যোগ দ্বারা আত্মার পরিবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা একা, তাঁহাদের সঙ্গী নাই; এমন কি ভগবানও তাঁহাদের সঙ্গী নন। তাঁহারা আপনার আত্মার সহিত রমন করেন। আর যাঁহারা অন্তরের কমনীয় ভাবগুলি বর্দ্ধন করিতে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গী জীব মাত্রেই এবং স্বয়ং ভগবান। তাঁহারা ক্রমে প্রেম লাভ করেন, ও শেষে প্রেমানন্দ ভোগ করেন। যাঁহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন, তাঁহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়া পড়িয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত। যাঁহারা প্রেমানন্দ ভোগ করেন, জগৎ তাঁহাদের, আর জগতের তাঁহারা,—ভগবান তাঁহাদের আর

তাঁহারা ভগবানের। তাঁহারা উভয় প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। প্রেমানন্দ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে তাহা জ্ঞানানন্দীরা অবগত নহেন।

এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর একবিন্দু প্রেমসুধা আস্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু এই সন্ন্যাসী দ্বারা দেখাইলেন যে, যাহারা আত্মারাম ও গ্রন্থি শূন্য, তাঁহারাও তুলসীর গন্ধেতে লোভ করেন। পোড়াকাষ্ঠ এখন সরস হইল। রূপ-গর্ব্বিতা স্ত্রী অহঙ্কারে মৃত্তিকায় পা দেন না। কিন্তু তাঁহার রূপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্তি হয়। যদি তিনি দৈবাৎ প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন, আর তাঁহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাঁহার হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি যাহা শুকাইতেছিল তাহা আবার সজীব হইল, আর তাহার সৌন্দর্য্য-শক্তি বাড়িয়া উঠিল। সন্ন্যাসীরও ঠিক তাহাই হইল। তখন—

"ছটফট করিতে লাগিল সন্ন্যাসীবর।
প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর॥"

এই নিগ্রন্থি আত্মারাম সন্ন্যাসীবরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া, প্রভু দ্রুতগতিতে ত্রিপদীনগরে গেলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুর ভ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু বেঙ্কট হইতে ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম দর্শন করিলেন। পরে—

পানানরসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥
শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন।
বিষ্ণুকাঞ্চি আসি দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

ত্রিমল্ল দেখি গেল ত্রিকালহস্তি স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিল প্রণাম॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন।
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী-ভৈরবীদেবী করি দরশন।
কাবেরী-তীরে আইল শচীর নন্দন।

এখন উপরি-উক্ত তীর্থস্থানগুলিতে কি কি লীলা করিলেন বলিতেছি। ত্রিপদি নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়া প্রভু ধূলায় পড়িয়া গেলেন। সেখানে রামায়ৎগণের বাস। সর্ব্বপ্রধান মথুরা-রামায়েত ভারি পণ্ডিত। তখনকার দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, সেই সময় দেশে পরমপণ্ডিতের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, যখন ভারতবাসী বিদ্যাচর্চ্চা ও অধ্যাত্মচর্চ্চা করিতে করিতে চরমসীমায় উপস্থিত হয়েন, প্রভু সেই সময়ে আসিয়া উদয় হইলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সময় কি বাঙ্গলা, কি পশ্চিম, কি উত্তর কি দক্ষিণ ভারতবর্ষের সকল স্থানেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল, আর প্রায় সকলেই শঙ্করের ভাষ্য দ্বারা—হয় প্রত্যক্ষে, নয় পরোক্ষে—চালিত হইতেছিলেন। মথুরা—

"বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত।"

তিনি কাজেই প্রভুর নিকট যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন। বলিতেছেন—

"মথুরা ঠাকুর, আমি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি॥

তিনি বলিতেছেন, "তুমি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্য তোমার নিকট সব তত্ত্ব নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না? ইহাতে আমার উপকার হইবে, আর শ্রীরামচন্দ্রও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে? শুষ্ক তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরমভক্ত, তোমার জিগীষা শোভা পায় না। ইহা কেমন—না, যেমন শুভ্রবস্ত্রে কালির দাগ। তুমি বরং কিছু ভগবৎ-কথা বল, আমি শুনি।" শ্রীভগবানের নাম করিবামাত্র প্রভু আবিষ্ট হইলেন।

"বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতুহলি॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়।
অচেতন হইল প্রভু যেন জনপ্রায়॥"

সেই সঙ্গে রামায়েতগণ—"নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া।'

প্রভু সেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়া চলিলেন। তখন মথুরা আর তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়েন না, তবে সেবার আর যুদ্ধ করিতে নয়। প্রভু অনেক প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এই ত্রিপদী সেই অবধি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ হইল। শেষে প্রভু পানানরসিংহ গমন করিলেন। এই ঠাকুর প্রহ্লাদের প্রভু। সেই ভাবে বিভোর হইয়া প্রভু ঠাকুরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুজা প্রভুর গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন, আর পূজারী দ্রুতগতিতে প্রসাদ আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। প্রভু তাহার কণামাত্র লইয়া "বহুস্তব" করিলেন। স্তব করিতে করিতে তাঁহার দুই পদ্মচক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। এখানকার প্রধান ভোগ—চিনিপানা, তাই ঠাকুরের নাম পানানৃসিংহ। প্রভু সেখান

হইতে, শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি আইলেন। বিষ্ণুকাঞ্চির ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ। তাহার অধিকারী ভবভূতি, ইনি শেঠী,—যেমন ধনবান, তেমনি ভক্ত। ইঁহারা সস্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিত্ত প্রত্যহ দুই মণ ক্ষীরের পায়েস হয়। তাঁহারা ভোগের নিমিত্ত বৎসরে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। তাঁহার স্ত্রীর সেবা আরো চমৎকার। তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে মন্দির ধৌত করেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দূরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরিপট্টশিব। সেখান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়। তার নীচে পক্ষতীর্থ, ভদ্রা-নদীর ধারে। প্রভু সেই নদীতে স্নান করিলেন, আর সেবা করিলেন—চাম্পি ফল। সে ফল কিরূপ? সেখানে বৃক্ষতলে প্রভু ও ভৃত্য রজনী বঞ্চিলেন। সে রজনী প্রভু এক লীলা করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটী ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদের আক্রমণ করিল। ইনি বোধ হয় পক্ষগিরিতে বাস করিতেন। প্রভু হাস্য করিলেন ও হরিধ্বনি করিলেন।

"হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল বনে এক লম্ফ দিয়া॥"

সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে বালতীর্থ। (চরিতামৃত বলেন "কেবল" তীর্থ)। এখানে বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভু পুলকিত ও দরদরিতধারা হইলেন।

"পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইল॥"

সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণে সন্ধিতীর্থ, যেহেতু সেখানে নন্দী ও ভদ্রা দুই নদীর সঙ্গম। সেখানে সদানন্দপুরী বাস করেন। তিনি প্রভুর ভক্তি দুষিলেন, আর তিনি বড়-পণ্ডিত ও 'সোঽহং'—এই গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে তুলসীর গন্ধ শুকাইলেন। অমনি

তাহার 'সদানন্দত্ব' ফুরাইয়া গেল,—তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফল কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পিঁপড়া দংশন করিলে "বাবা-রে মা-রে" করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য জগতে কি কেহ আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রভু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবান্ অতি প্রকাণ্ড বস্তু, আর তিনি কীটাণু; কাজেই আপনি ভগবান্ না হইয়া ভগবান্‌কে ভজন করাই ভাল। সদানন্দ প্রভুর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। সেখান হইতে প্রভু চাঁইপল্লী তীর্থে গমন করিলেন। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী অতি তেজস্বিনী একটি সন্ন্যাসিনী বিল্ববৃক্ষের তলায় বসিয়া একেবারে ধ্যানস্থ। বয়স যেন একশত বৎসর হইয়াছে। সেখানে 'শৃগালী' বা 'শেয়ালী' বিগ্রহ আছেন। অর্থাৎ এখানে শৃগাল পূজার বস্তু, তাহার নাম "শৃগালী-ভৈরবী"। প্রভু তাহার পর কাবেরী তীরে ও সেখান হইতে নাগর নগরে গমন করিলেন। এই কয়েকটি তীর্থে প্রভু কি কি লীলা করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে নাই।

নাগর নগরে বহুতর লোকের বাস। সেখানকার ঠাকুর রামলক্ষ্মণ। প্রভু সেখানে তিন দিবস অনবরত নৃত্যগীত ও নামবিতরণ করেন। ইহাতে কি হইল, না—গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল। অধিকন্তু দশ ক্রোশ দূর হইতে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রভুর প্রতাপ দেখিয়া সেখানকার একজন ব্রাহ্মণের ঈর্ষা হইল। সে আসিয়া প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। বলে, "তুই ভণ্ড সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্ব্বোধ লোককে ভুলাইতেছিস্ তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব।" প্রভু যখন নদীয়ায় ছিলেন তখন প্রহারের ভয়ে সন্ন্যাসী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি সন্ন্যাসী হইয়াও নিস্তার পাইলেন না। তবে তিনি ব্রাহ্মণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন। আর সহাস্যে বলিলেন, "তুমি আমাকে মারিবে সে সোজা কথা, কিন্তু অগ্রে তোমার হরি বলিতে হইবে।" তখন গ্রামের লোক প্রেমে

উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা কিরূপে সহিবে ? তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে এইরূপ উদ্যোগ করিল। প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন সকল লোকে প্রভুর এরূপ বশীভূত হইয়াছে যে, তাঁহার সামান্য ইচ্ছা তাহাদের কাছে ভগবত-আজ্ঞা স্বরূপ অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "শুন দয়াময় ঠাকুর, এ সমুদয় কাজ ভাল নয়, বরং হরি বল, বলিয়া অনন্ত সুখ আহরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে ভক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; তবে তোমার এরূপ প্রবৃত্তি কেন ?—

"আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥"

সকলে দেখিল প্রভুর ক্রোধ নাই, কোন বিকার নাই, বরং যেন হৃদয় দয়াতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বিনা অপরাধে তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করিল, এমন কি অন্যে প্রভুকে রক্ষা না করিলে সত্য-সত্যই তাঁহাকে সে প্রহার করিত। ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং পাছে অন্যে বিপ্রকে প্রহার কি অপমান করে, এই জন্য ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের সহিত সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে মুগ্ধ হইল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইল এই "দয়াময়" ঠাকুর। সে আর থাকিতে পারিল না, "প্রভু, রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার একি দুর্ম্মতি!" বলিয়া—

প্রভুর চরণতলে পড়িল ধরায়॥
এইরূপে ব্রাহ্মণে কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা চৈতন্যদেব নাগর ছাড়িয়া॥

তথা হইতে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরে গেলেন। যথা, চৈতন্য-চরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন—"শিয়ালী-ভৈরবী দেবী করি দরশন।

কাবেরী তীরে আইলা শচীর নন্দন॥

সেখানে গো-সমাজ শিব ও কুম্ভকর্ণের মাথার সরোবর দেখিয়া প্রভু পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। তাঞ্জোর-নগরে ধলেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা করেন। তিনি সেই ঠাকুর-বাড়ীর আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষতলে থাকেন, আর অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সেখানে বাস করেন। গো-সমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধলেশ্বর প্রভুকে কুম্ভকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। এইরূপ প্রবাদ যে এই সরোবরটি কুম্ভকর্ণের মাথা, আর কিছু নয়। কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় মরেন, তাহার অত বড় মাথা তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল? সেখান হইতে অতি সুন্দর চণ্ডালু-পর্ব্বত দেখা যায়। দেখিতে যেন একখানা সুন্দর চিত্র। সেখানে বিস্তর গোফা আছে, উহাতে অনেক সন্ন্যাসী থাকিয়া তপস্যা করেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র পর্ব্বতে লক্ষ লক্ষ গোফা ছিল ও এখনও আছে। তবে তখন সেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন, এখন সে সমুদায় ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান হইয়াছে। দক্ষিণদেশে মুসলমান উপদ্রব তখনও প্রবেশ করে নাই। কাজেই মুসলমানেরা আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা তখনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। এই যে প্রভু চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন, আর সকল স্থানই সাধু-সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র বনে সুরেশ্বর নামক এক সন্ন্যাসী দশজন শিষ্য লইয়া বাস করেন। বনটি অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটি ঝরণার দ্বারা শোভিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ সুন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে তাঁহাদের ভিক্ষা যোগাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে এইরূপ আশ্রম ছিল। প্রভু সেখানে কয়দিন থাকিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটিকে প্রেমে উন্মত্ত করিলেন, শেষে সেই বৈকুণ্ঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মাকোটে গেলেন। সেখানে অষ্টভুজা দেবী থাকেন। প্রভুকে দেখিতে বহুলোক

আসিল। তাহাদের সহিত দুই এক কথা বলিতে বলিতে এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ভাব হইল। প্রভু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবী যেন দুলিতে লাগিলেন, আর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং পদ্মগন্ধে সেই স্থান ভরিয়া গেল, যথা—

বালক যুবক সবে ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভুজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে।
সেইখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥

পশ্চাতে রমণীগণ ছিলেন, তাঁহারা সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি করিতে অর্থাৎ পরস্পরের গাত্রে ফেলিতে লাগিলেন।

এই সমুদয় অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে। সকলে যেন আবেশিত, তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটি অন্ধ সাধু ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে আসিয়া প্রভুর পদ-দু'খানি জড়াইয়া ধরিলেন, এবং কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে জগদীশ্বর, কৃপা কর।" প্রভু বলিলেন, "এখানে জগদীশ্বর কোথা? সম্মুখে জগদীশ্বরী আছেন বটে।" অন্ধ বলিলেন, "প্রভু আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষু ভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার তোমার রূপ দেখিব।" প্রভু বলিলেন, "তোমার চর্ম্মচক্ষু নাই, তুমি কিরূপে দেখিবে? তবে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সমুদয় দেখিতে পার বটে।" কিন্তু অন্ধ পা ছাড়েন না। তিনি শেষে বলিলেন, "তবে শুনিবে? আমি বহুকাল ভগবতীর আশ্রয়ে এই মন্দিরে পড়িয়া আছি। কল্য নিশিতে আমাকে ভগবতী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ, আর তুমিই অগতির গতি। তাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীব তোমাকে 'দয়াময়' বলে। তুমি তোমার দয়ার গুণে আমাকে তোমার রূপটি একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই না।" প্রভু অগ্রে যাহা

বলিয়াছেন, তাহাই আবার বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান্, কারণ জীবমাত্রের হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন। কিন্তু তুমি আমাকে স্বয়ং ভবগান্ বলিয়া অপরাধী করিতেছ।"

অন্ধ বলিলেন, "ও সব কথা থাকুক ; আমাকে তোমার রূপ দেখাও।" ইহাই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন প্রভু অস্থির হইলেন। কারণ প্রভু বরাবর একটী বিষয়ে "দৌর্ব্বল্যের" পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ লোকের আর্ত্তি শুনিলে অস্থির হইতেন, লোকের আর্ত্তি দেখিতে পারিতেন না। যাহা হউক পরে অন্ধের হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র অন্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, আর তখনি নয়ন মেলিলেন এবং স্থির-নয়নে প্রভুর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাহার মুখ অতিশয় প্রফুল্ল হইল, আর অমনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার আর জ্ঞান হইল না, প্রভুকে দর্শন করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রভু সেই মৃতদেহ বেড়িয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন মহা কলরব হইল, প্রভু অমনি লোকের অগোচরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাই তথা হইতে দ্রুতপদে ত্রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দক্ষিণে সমুদ্র হইতে একটু দূরে। ইহা চণ্ডেশ্বর শিবের স্থান। সে মন্দিরে একবার ববম্ শব্দ করিলে একদণ্ডকাল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ আছে, সেখানে অনেক শৈব পণ্ডিত বাস করেন তাঁহাদের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর অতিবৃদ্ধ ভর্গদেব বসিয়া ছিলেন। প্রভু উপস্থিত হইলে অমনি চিনিলেন। প্রভুর যশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে। ভর্গদেব তাঁহার অনুগত জনকে বলিতেছেন, "তোমরা চৈতন্যের কথা শুনিয়াছ, যাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জগৎ

মাতাইতেছেন, তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া এ দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। যেমন শুনিয়াছি তাই বটে, এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমরা কি কখন দেখিয়াছ?" প্রভু অগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, আর ভর্গ তাঁহাকে শুনাইয়া এই সব কথা বলিতেছেন। পরে বলিলেন, "না হবে কেন, উনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। এস আমরা সকলে উহাকে প্রণাম করি।" ইহা বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি প্রতিপ্রণাম করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন, "ভর্গদেব, আপনি আমাকে বড় অপরাধী করিতেছেন। আমার নাম চৈতন্য বটে, আমার বাড়ী বঙ্গদেশে নদীয়ায়। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব।" তখন ভর্গ বলিতেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ, আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছ, আমার সঙ্গে লুকোচুরি ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনিয়াছি, আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও। কি সৌভাগ্য! কি তোমার কৃপা!" ইহা বলিয়া ভর্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু আর করেন কি,—সেখানে তাঁহার সাত দিন থাকিতে হইল। সমুদয় শৈবগণকে মালাধারণ এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে ছাড়িলেন। গোবিন্দ তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন যে, প্রভুকে দেখিবামাত্র যে লোকে আকৃষ্ট হয়, তাহার অনেক কারণ ছিল। যথা—

আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর।
আশ্চর্য্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার॥
দিনান্তে সামান্য ভোজন করে গোরারায়।
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ যষ্টির প্রায়॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর।
তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার॥
মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায়।
অহেতুক পদ্মগন্ধ সদা তার গায়॥

যে জন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায়।
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায়॥

ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনেক বিনয় করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

লক্ষ লক্ষ লোকে আসে প্রভুকে দেখিতে।
কাতর না হয় প্রভু কৃষ্ণনাম দিতে॥
'ক্ষেপা হরিবোলা' বলে প্রভুকে সকলে।
খেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে॥
হরি বলি কত লোক পিছু পিছু ধায়।
নাম শুনি প্রভু মোর ধূলি মাখে গায়॥
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়।
হরি হরি বলি সবে খেপাও উহায়॥
আরম্ভিল খেপাইতে সব শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন।

বালকগণ প্রভুকে কিরূপে হরি বলে খেপাইত পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। তাহারা প্রভুর নাম "খেপা হরিবোলা" দিয়াছিল। বালকগণ বলে "হরি হরি বোল", আর পরস্পর বলাবলি করে, "এই দেখ পাগল খেপে আর কি।" প্রভু তাহাদের ভাব বুঝিয়া কখন বসিয়া গায়ে ধূলা মাখেন, কখন নৃত্য করেন, কখন ধূলায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রভু যখন এই চপল ও সরল বালকের ন্যায় হয়েন, তখনই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন।

সেখান হইতে প্রভু পঞ্চাশ-যোজন-ব্যাপী একটি মহাবনে প্রবেশ করিলেন। আহার কেবল বনফল, তাহারও অভাব ছিল না! তিন দিবস মনুষ্যের মুখ দেখা গেল না, পরে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত দেখা হইল। তখন সকলে একত্রে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে

উপস্থিত হইলেন। এই নগরে আমরা প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পঁহুছিলেন।

সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর।
প্রভুরে লইয়া গেল আপনার ঘর॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
তাহা দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অন্তরে॥

ইঁহার নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইহার পুত্র গোপাল ভট্ট, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একজন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই বেঙ্কট ভট্টের সহোদর, যাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ। গোপাল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ—এই দুইজনের অদ্ভুত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে চাতুর্ম্মাস্য করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটী ভুল। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করিয়া মাঘ মাসে প্রত্যাগমন করেন। যে বৎসর গমন করেন, সেই বৎসর যদি প্রত্যাগমন করেন, তবে তিনি মোট দশ মাস দক্ষিণে ছিলেন। তাহার মধ্যে চারিমাস যদি বেঙ্কটের বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সমুদয় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়? তাহা হয় না। তিনি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়া দ্বারকায় গমন করেন। সেখান হইতে নীচাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং তিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন। যদি চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম তিনি পালন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর একবার উহা পালন করিতে হইয়াছিল। সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে এই

দুইবার চাতুর্ম্মাস্য করিতে তাঁহার আট মাস লাগিয়াছিল। তিনি কি তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অষ্ট মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্তু? তিনি চলিয়াছেন —দৌড়িয়া; তাঁহার ক্ষুধার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যাঘ্রের ভয় নাই, তবে বৃষ্টি কি তাঁহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? আসল কথা, তাঁহার চাতুর্ম্মাস্যের কথা কেহ বলেন নাই।

প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে অবশ্য কিছুকাল ছিলেন, আর বালক গোপাল তাঁহার সেবা করিতেন। যখন প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করেন, তখন বেঙ্কট ও গোপাল দুইজন প্রভুর পিছু লাগিলেন, কিন্তু প্রভু উভয়কে নিরস্ত করিলেন। গোপালকে বলিলেন, "তোমার পিতামাতার অদর্শন ঘটিলে তুমি বৃন্দাবনে গমন করিও। সেখানে আমি তোমার সংবাদ লইব। তাই ইহার কয়েক বৎসর পরে গোপাল বৃন্দাবনে গমন করেন। চরিতামৃত বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড ভালবাসিতেন। কিন্তু নিজের বিদ্যা অধিক ছিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন, আর লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, কারণ—

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠনে॥

মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমি শুনিতে চাই গীতার কোন্ অর্থে আপনার এত সুখ হয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি মূর্খ. অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যখন আমি পড়ি, তখন দেখি অর্জ্জুনের রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাহা দেখিয়াই আমার এত আনন্দ হয় যে, গীতা না পড়িয়া থাকিতে পারি না।" প্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমারি গীতা-পাঠে

অধিকার আছে। তুমিই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝ।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বুঝেছি, তুমিই ত সেই কৃষ্ণ।" গোবিন্দের কড়চায় এই কাহিনীটি এইরূপে বর্ণিত আছে। অর্জ্জুনমিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ করেন, অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন। যথা—

প্রভু বলে কেন কান্দ ব্রাহ্মণ-ঠাকুর।
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণে দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসী-গোসাঞি॥
প্রভু বলে কৃষ্ণ তুমি পাও দরশন।
তবে মোরে দয়া করি দাও আলিঙ্গন॥
বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলা।
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা॥

সেখানে প্রভু শুনিলেন যে—

বৃষভ পর্ব্বতে থাকে পরমানন্দপুরী।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভু হৈলা আগুসারি॥
পুরিসহ কৃষ্ণ-কথা বহুত কহিলা।

চরিতামৃতে পুরী-গোসাঞির সম্বন্ধে আছে—

"তিন দিন প্রেমে দোহে কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে।
এক বিপ্র-ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥

অর্থাৎ প্রভু আর পরমানন্দপুরী তিন দিবস এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকিয়া কৃষ্ণ-কথায় বিহ্বল ছিলেন। প্রভু বলিলেন, "চলুন, নীলাচলে একত্র থাকিব।" পরমানন্দপুরী অবশ্য এই প্রস্তাবে কৃতার্থ হইলেন।

এই পরমানন্দপুরীর প্রতি প্রভু এত সদয় কেন? তাহার কারণ —ইনি ও প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ধর্ম্মভাই। তাঁহারা মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। তাই পরমানন্দপুরীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, আর নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলেন। এই পুরী-গোসাঞি চিরদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করেন। ভক্তগণ ভাবিতেন যে, বিশ্বরূপের তেজ তাঁহাতে ছিল। অর্থাৎ পুরী-গোসাঞির হৃদয়ে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপ প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠ নিমাইর কার্য্যের সহায়তা করেন।

প্রভু সেখান হইতে কামকোটী এবং তথা হইতে দক্ষিণ-মথুরা আইলেন। কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ী প্রভু উপস্থিত হইলেন। ইনি শুধু রামভক্ত নন, রামের নামে একেবারে পাগল। ব্রাহ্মণ কিছু পাক করিতেছেন না দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "কি ঠাকুর, আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পাক কি করিব? এ বনে সামগ্রী কোথায়? লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু আনিতে পারেন তাহা সীতা পাক করিবেন।" প্রভু দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ আপনাকে শ্রীরাম ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ক্রমে ব্রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি পাক করিয়া তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ উপবাস করেন, তাঁহার দুঃখ যে, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। প্রভু তৎপরে রামেশ্বর তীর্থে আসিলেন। সেখানে একখানি পুথিতে দেখিলেন, রাবণ যে সীতা হরণ করে, সে মায়া সীতা। প্রভু সেই পাতা নকল করিয়া, এবং সেই সঙ্গে সেই পুরাতন পাতাখানা সেই ব্রাহ্মণকে আনিয়া দিয়া তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন।

প্রভু রামনদে আসিয়া, সেখানে রামের চরণ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে শিবদর্শন করিলেন। বহুতর পণ্ডিত উদাসীন সেখানে বাস করেন। তাহার মধ্যে যিনি বড় পণ্ডিত তিনি অবশ্য যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তখনি পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তুমি আমাপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত।" প্রভুর এইরূপ বিনয় দেখিয়া সে একটু স্তম্ভিত হইল, হইয়া ভাবিতে লাগিল। প্রভু তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ভাবিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবচ্চরণে প্রীতি হয় তাই কর। বিচারে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়, আর অহঙ্কার বৃদ্ধি হইলে, দর্পহারী ভগবান আছেন, বুঝলে ত?" বলিতে বলিতে প্রভু আবেশিত হইলেন, আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে—

পড়িল চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া।
পাথরের ধারে গেল থুতনী কাটিয়া॥
দরদর রক্তধারা পড়িতে লাগিল।
যতনে পণ্ডিতবর মুছাইয়া দিল॥

সেখানে তিন দিন থাকিয়া তাহাদিগকে ভক্তি দিয়া প্রভু মাধিববনে গমন করিলেন। শুনিলেন, সেখানে একজন উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। প্রকৃতই তিনি যোগসিদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ, শ্বেত-শ্মশ্রুতে তাঁহার হৃদয় আবৃত ও তিনি ধ্যানস্থ। তাঁহার মুখে কোন শব্দ নাই। তিনি বসিয়া আছেন বৃক্ষতলে, সেই তাঁহার ঘর। প্রভু তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন ধ্যানস্থ থাকিবার পরে সন্ন্যাসী সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, সেইদিন প্রভু গিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন দিন রহিলেন। সন্ন্যাসী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা কহিতে লাগিলেন। কি যে কথা হইল তাহা কোন গ্রন্থে নাই।

দুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন।
"চাম্পনি শিউড়ি" বলি হাসিল তখন॥
চাম্পনি শিউড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে।
হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে॥
প্রতি-নমস্কার করি মোর গোরারায়।
আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণগুণ গায়॥

তিনি প্রভুকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও তটস্থ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানে সাত দিন ছিলেন, কিন্তু কি করিলেন, কি বলিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তখন মাঘ মাস। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করেন, দশ মাস পরে রামেশ্বরে আইলেন তাহার প্রমাণ এই যে, মাঘিপূর্ণিমায় তাম্রপর্ণীর মেলায় প্রভু স্নান করেন। তাহার পরে চৈতন্যচরিতামৃতকার সংক্ষেপে এইরূপ প্রভুর তীর্থদর্শন বর্ণনা করিতেছেন। যথা—

তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে।
নব ত্রিপদি দেখি বলে কুতুহলে॥
চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতাপুর আসি দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি কৈলা বিষ্ণু দরশন॥
মলয় পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যাকুমারী তাহা কৈল দরশন॥

প্রভু

তাহার পরে আমলকিতলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়স্বিনী তীরে, আর তথা হইতে আদিকেশব মন্দিরে গেলেন। সেখানে সেই অমূল্য গ্রন্থ "ব্রহ্ম-সংহিতা" পাইলেন। আবার বলিতেছেন—

"পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্করনারাযণে।
শৃঙ্গেরিমঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে॥
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈলা তুঙ্গভদ্রায় স্নান।"

গোবিন্দের কড়চায় আছে, প্রভু পয়স্বিনীতে শিবনারায়ণ দেখিয়া, শঙ্করাচার্য্যের মঠে শঙ্করের শিষ্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, মৎস্যতীর্থে, তথা হইতে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগপঞ্চনদীতীরে ও চিত্তোলে, পরে তুঙ্গভদ্রাতীরে ও কোটিগিরিতে, এবং শেষে চণ্ডপুরে গেলেন।

প্রভু কন্যাকুমারীতে সমুদ্র-স্নান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়া সাঁতাল পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে একজন শেঠি আসিয়া সকল সন্ন্যাসীকে দুগ্ধ ও আটা দিলেন। সে একদিন ছিল যখন দেশের প্রত্যেক শতের মধ্যে পঁচাত্তর জন পরিশ্রম করিত, আর পঁচিশজন তাহাদের দ্বারা পালিত হইয়া ধর্ম্মযাজন করিতেন। এই সন্ন্যাসীদিগের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন না, তবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রবেশ করিলেন। সে দেশবাসীরা পরম হিন্দু, তাঁহারা অতিথিকে অভ্যর্থনা না করা মহাপাপ মনে করিতেন। তথাকার রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি ভারি ঐশ্বর্য্যশালী, বদান্যতাও তাঁহার সেইরূপ। দেশে অতিথির ত কোন দুঃখ নাই। আবার নগরের তিন স্থানে রাজার ব্যয়ে তিনটি অন্নছত্র আছে। সেখানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। সকলেই রাজার সুখ্যাতি করে, বলে রাজা যেমন প্রজাপালক তেমনি ভক্ত। সন্ধ্যাকালে প্রভু ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিলেন, যাইয়া এক

বৃক্ষতলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখনি একজন ভাগ্যবন্ত লোক আহারীয় আনিয়া দিল।

প্রাতে প্রচার হইল যে, এক অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল, আর তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া জোড়হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু ভাবে গরগর হইয়া সেখানে বসিয়া রহিলেন।

"নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে।
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে॥"

ক্রমে গ্রাম্যলোক স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল, আর তাঁহাকে বাড়ী লইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কেহ বা সেইখানেই আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিল। কিন্তু প্রভু তখন ভাবে বিভোর, নয়ন মেলিলেন না। শেষে তর্কপ্রয়াসী একজন আসিলেন; তিনি অবশ্য ব্রহ্মবাদী। ক্রমে রাজাও ইহা শুনিলেন এবং প্রভুকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। রাজদূত প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভু যাইতে অস্বীকার করিলেন। রাজদূত বলিল, "সন্ন্যাসী, তুমি বড় নির্ব্বোধ, রাজা ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য। তুমি গেলে প্রচুর অর্থ পাবে।" প্রভু বলিলেন, "আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই।" দূত প্রভুকে সরলভাবে ভাল পরামর্শ দিতে গিয়াছিল। তাহাতে ধন্যবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা শুনিল, কাজেই ক্রুদ্ধ হইল। শেষে দূত বলিল, "বটে! তোমায় মজা দেখাইতেছি।"

"এই কথা বলি তবে দূত করি ক্রোধ।
রাজদ্বারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ॥"

দূত যাইয়া প্রভুর নামে নানা কথা বলিল। এমন কি, যাহা প্রভু

বলেন নাই তাহাও বলিল। কিন্তু রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সম্বল কৌপিন, আর তিনি রাজা; কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাকে গ্রাহ্য করিল না, এরূপ তিনি ত কখনও দেখেন নাই। এরূপ সন্ন্যাসী যে আছেন তাহা তাঁহার বিশ্বাসও ছিল না।

"সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূরদেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥
দুই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয়।
প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তিভরে কয়॥
জোড়হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম কৃপা করে॥
জ্ঞান শিক্ষা দেও মোরে অধম-তারণ।"

রাজার সঙ্গে আবার ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাও দুইচারি জন পণ্ডিত ছিলেন। রাজা বৈষ্ণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত।. প্রভু বলিলেন, "রাজা, তুমি বড় ভাগ্যবান, আমার নিকট কি জ্ঞান চাও? আমি জ্ঞান জানি না, আমি জানি কেবল—রাধাকৃষ্ণ।" যেই প্রভু "রাধাকৃষ্ণের" নাম লইলেন, অমনি যাহা হইবার তাহা হইল—অর্থাৎ

লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দরদর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু পসারিয়া॥

হরিবোল বলে গোরা অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল॥
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পূরিল।
ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিও নিশ্চয়॥

প্রভু সেখান হইতে শীঘ্র বিদায় লইলেন, কারণ রুদ্রপতি রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে এইরূপ প্রভুকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই প্রভু বলিয়াছিলেন, "ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!" কিন্তু রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ; প্রতাপরুদ্রের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু কোটগিরি ত্যাগ করিয়া চণ্ডপুরে গমন করিলেন। বামে সত্যগিরি পর্ব্বত রাখিয়া প্রভু নগরে প্রবেশ করিলেন, আর এক বটবৃক্ষতলে বসিলেন। কারণ সেখানে একজন বড় সন্ন্যাসী আছেন। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিয়াছেন, ও তাঁহাকে কৃপা করার ইচ্ছা হইয়াছে।

সেই সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। তাহার এক কর্ণে সোনার কুণ্ডল, সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর ভারতী। তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মায়াবাদ-তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। লোকটি সরল, তাঁহার ইচ্ছা প্রভুর কি মত শ্রবণ করেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শনমাত্র তাঁহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তাহা এই যে, এই নূতন সন্ন্যাসী তাঁহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। আবার প্রভু যেমন যাইতেছেন, তাঁহার সুখ্যাতি তেমনি অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। সুখ্যাতি এইরূপ যে, সন্ন্যাসী একজন পরম রূপবান, পরম পণ্ডিত ও পরম ভক্ত। তিনি দেশ সমেত লোককে হরিবোলা করিতেছেন, তাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী তাপী থাকিতেছে না। অতএব তাঁহার নিকট তাঁহার এরূপ শক্তির কারণ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। সে কথা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতেন। কিন্তু মনে অভিমান থাকায় তাহা পারিলেন না। তাই তর্ক উঠাইয়া প্রকারান্তরে প্রভুর সাধন ভজন কি, ও তাহার ভিত্তিভূমি কি ইত্যাদি জানিয়া লইবেন এই ইচ্ছা। অবশ্য প্রভু সন্ন্যাসীর মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাই সন্ন্যাসীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পাঠকের মনে আছে যে, একদিন শচীজননীর ইচ্ছা হইল যে, নিমাইকে কথা বলাইয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিবেন, কারণ তাহার কথা মধু হইতে মধু। কিন্তু ধূর্ত্ত নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া মোটে কথা বলিলেন না। এই সম্বন্ধে আমার একটি কবিতা আছে। বড় পীড়াপীড়ি করিলে নিমাই কেবল মাথা নাড়িতে ও হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী রাগ করিয়া হাতে ঠেঙ্গা ধরিলেন, আর নিমাই দৌড় মারিলেন।

এখানেও প্রভু সন্ন্যাসীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, ও অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী যেরূপ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীও তাই করিলেন; অবশ্য ঠেঙ্গা ধরিলেন না, তবে

ক্রোধ করিলেন, করিয়া প্রভুকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে কড়চার বর্ণনা অতি সুন্দর, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"অল্প হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া ॥
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিরক্ত হইয়া অবশেষে সন্ন্যাসীবর ॥
প্রভু কহেন তুমি নাহি কহ বাণি।
সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি ॥
সর্ব্বলোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত।
মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত ॥
দেশ শুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি।
তোমার কিঞ্চিৎ গুণ নাহি দেখি আমি ॥
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু মুখে নাহি কথা।
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা ॥
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাহি বিচার করিতে।
তবে কেন মূর্খ লোকে ভোলে আচম্বিতে ॥
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া।
সৃষ্টিতত্ত্ব সর্ব্বলোকে দেও দেখাইয়া ॥
এ দেশের মূর্খলোকে হরিবোলা করি।
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী ॥
শক্তি যদি থাকে তবে করহে বিচার।
এইবার বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝিব তোমার ॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি দৌড় দিল।
তিন সঙ্গী সহ পুনঃ আসিয়া মিলিল ॥

চারিজনে বসিল প্রভুর চারিভিতে।
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে॥
ভারতী বলিল তুমি উড়াও হাসিয়া।
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া॥"

ভারতী বলিতেছেন, "এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও যে আমাদের উপাস্য কে?"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু কখন বা কাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বশীভূত করিতেন, তাহার উদাহরণ এই একটি দেখুন। প্রভু তখন রহস্য ভাব ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে পণ্ডিত! আমি বিচার জানি না, তাহাতে আবার তুমি অত বড় পণ্ডিত, তোমার নিকট আমি শতবার হার মানিলাম। তদ্ যথা—"চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি। তোমার বিচারে আমি মানিলাম হারি॥"

যোগীর বিচার ইচ্ছা নয়, জয়ও ইচ্ছা নয়। তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞান উপার্জ্জন, তাই কাতরভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর দয়া হইল। প্রভু বলিলেন, "আমি ভগবান্, আমিও যে, তিনিও সে—এ সমুদয় দম্ভ ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান্ তাঁহাকে ভজনা কর। তাহা হইলে শান্ত হইবে, সুখও পাইবে।" ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা, অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভুর মুখে, কাজেই সুধাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভক্তগণ অবশ্য জানেন যে, যাহার ভক্তি উদয় হয় তাহার সমুদায় লাবণ্যময় হয়, স্বরও মধুর হয়। আবার এরূপ অবস্থাপন্ন ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম কি মধুর তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। তাই পদে আছে, "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?" তাই পদে আছে "লইতে কৃষ্ণ-নাম জিহ্বা নাচে অবিরাম।" প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে

আরম্ভ করিয়া ভাবে একেবারে বিভাবিত হইলেন। যেমন প্রাচীন পদে আছে--

"রাইধনী কৃষ্ণকথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে মুরছিল॥"

সেইরূপ কৃষ্ণকথা কইতে কইতে প্রভুর কথা ঘন হইয়া আসিল, তিনি গদগদ হইলেন, কথা বলিতে যান বলিতে পারেন না, শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাজেই কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল।

পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপিনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া॥
থর থর হৃদ্‌কম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল॥
কৃষ্ণ হে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়॥
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল।
ভাল মন্দ কথা নাহি শুনে বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর॥
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলে ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥

তখন যাহা হইবার তাহাই হইল—যোগী প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন, "আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি চাই ভক্তি। কিন্তু প্রভু তখন সে সমুদায় কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। তবে,—

"অশ্রুজলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায়॥
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল।

সোনার দোসর দেহ ধূলায় পড়িল ॥
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায় ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিন্ধিল কাটায় ॥”

অল্প বাহ্য হইলে প্রভু দেখিলেন, সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, “কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন।” প্রভু সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিতেই তাঁহার প্রেমোদয় হইল। “কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়। প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায় ॥
যোগী বলে তুমি আমার কৃষ্ণ হবে।”

মহাত্মাদিগকে ভক্তেরা ইহাই বলিয়া স্তুতি করেন যে, তুমি পরম ভক্ত, তুমি ভগবানের কৃপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুকে এরূপ স্তুতি কেহ করিতেন না। যিনি স্তুতি করিতেন, তিনিই বলিতেন, “তুমিই সেই কৃষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান।” কারণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিলেই মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মনুষ্য নহেন, তাহা চেয়ে বড়। প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঈশ্বর ভারতী যাইতে দিবেন না। তিনি বলিতেছেন, “আমি তোমায় ভক্তিডোরে বাঁধিয়া রাখিব, যাইতে দিব না।” তদ্‌যথা—“ঈশ্বর-ভারতী তবে এতেক বলিয়া। জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া ॥ প্রভু বলেন, “কৃষ্ণে তোমার এতেক বিশ্বাস। আজি হতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস ॥”

প্রভুর আশ্রয় লইলেই, যে এরূপ ভাগ্যবান তাহার নাম পরিবর্ত্তিত হয়। এই নাম প্রভু স্বয়ং রাখেন, আর নাম প্রায়ই “কৃষ্ণদাস, কি হরিদাস” —এইরূপ হয় ॥ প্রভুর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও কৃষ্ণদাস নামধারী অসংখ্য ছিলেন। তবে বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইত, —যেমন রূপ আর সনাতন, এই নাম প্রভু দুই ভাইকে দর্শনমাত্রেই অর্পণ করেন। প্রভু চণ্ডপুর ত্যাগ করিয়া, দুই দিবস জনমানবশূন্য পর্ব্বত দিয়া

চলিলেন। "কেবল কদম্ববৃক্ষ দেখি সারি সারি" তাঁহারা চলিয়াছেন, ইহার মধ্যে দেখেন অদূরে একটি ব্যাঘ্র জলপান করিতেছে। গোবিন্দ উহা দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব্দ না করিয়া প্রভুকে ইঙ্গিত দ্বারা উহা দেখাইয়া দিলেন। গোবিন্দ লিখিয়াছেন—"মোর ভাব দেখি প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়া॥ হরিনাম বলিলে না রহে যম ভয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়॥"

গোবিন্দ বলিতেছেন, "প্রভুর মুখে ইহা শুনিয়া আমি নির্ভীক হইলাম।" ব্যাঘ্র কিন্তু তাঁহাদিগের দিকে না আসিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। পরে তাঁহারা এক দরিদ্র পল্লীতে গমন করিলেন। প্রভু এক বৃক্ষতলে বসিলে, গোবিন্দ এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু তাই বলে অতিথি ফিরাইতে পারি না, আপনি অপেক্ষা করুন।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। একটু পরে দুটা নারিকেল আনিয়া দিলেন, তাহাই সেদিনকার আহার হইল। সন্ধ্যাকালে প্রভু তাঁহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে করযোড় প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, -"আমরা অতি দরিদ্র, আমাদের ঠাকুর গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সেবা করি। আমি এরূপ দরিদ্র যে বসিতে আসন দিব, তাহাও আমার নাই।" হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, প্রভু জানিয়া শুনিয়া এরূপ দরিদ্রের বাড়ী কেন গমন করিলেন? কিন্তু তাহার কারণ ছিল। ব্রাহ্মণ যখন বলিলেন যে, "বসিতে দিবার আসনখানি পর্য্যন্ত নাই", তখন ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, "ঠাকুর! তুমি আসন আর কি দিবে, মাথা পেতে দাও, দেখিতেছ না স্বয়ং গোপাল আসিয়াছেন। আর ভোগ কি দিবে, শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দাও।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিতে গেলেন। কিন্তু প্রভু তাহা করিতে না দিয়া

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,—"দেখ, আমি সামান্য মানুষ, এই তুলসী চন্দন গোপালকে দাও।" বিপ্র বলিলেন, "ভাল, তুমি না হয় আমাদের ন্যায় মানুষ, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বল দেখি,—"তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন? তবে দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন॥ তুমি যদি ভগবান নহ দয়াময়। তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ পাই॥" এই যে প্রভুর অঙ্গে সর্ব্বদা পদ্মগন্ধের কথা ও সৌদামিনী খেলার কথা, ইহা গোবিন্দ বারম্বার বলিয়াছেন। পদ্মগন্ধ সর্ব্বদাই, এবং সৌদামিনী মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। যেখানে প্রভুর আপনাকে লুকাইবার কোন কারণ থাকিত না, সেখানে ঐ বিদ্যুল্লতা অতি জাজ্জ্বল্যরূপে প্রকাশ পাইত।

প্রভু ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিলেন॥ সেখানে অনেকগুলি অদ্ভুত লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরীনগর ছাড়িয়া পুণা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া একবার বিজাপুরে গেলেন। সেখান হইতে পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুরে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি দেখিলেন, বিশ্বরূপের আত্মা দেহ ছাড়িয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বহুকাল হইল যখন আমরা বোম্বাইনগরে থিওসোফিষ্টগণের অতিথি হইয়া তাঁহাদের সাধনপদ্ধতি শিখিতেছিলাম, তখন সবে তাঁহারা সেখানে আসিয়াছেন। সে সময় একটি পার্সি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাঁহাদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটা বাঙ্গালার বারান্দায় আমি ও অলকট সাহেব একটী মান্দুরে শয়ন করিয়া গল্প করিতেছিলাম। ইহার মধ্যে শুনিলাম যে কীর্ত্তন হইতেছে।

"কীর্ত্তন" হইতেছে কেন বলিলাম ? কারণ খোল করতাল বাজিতেছিল, আর কীর্ত্তনের স্বরে গীত গাওয়া ও আখর দেওয়া হইতেছিল। মোটামুটি আমাদের দেশে যেরূপ কীর্ত্তন হয়, ঠিক সেইরূপ শুনিলাম। প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই-গৌরের নাম শুনিলাম। শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলাম, এবং ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার! অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখি তাহারা চলিয়া গিয়াছে ; আর তাহাদের ঠিকানা পাইলাম না, ইহাতে একটু বিমর্ষ হইলাম, কিন্তু এ কথাটি বরাবর মনে রহিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচী (তিনি দেহ রাখিয়াছেন) কিরূপে গৌরভক্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি এইরূপে বর্ণনা করেন। তাঁহার বাটী শ্রীনবদ্বীপে, কিন্তু ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া কিছু মানিতেন না। একবার তাঁহার দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। ইহা দেখিতে পৃথিবীর অনেক স্থানের লোকে সেখানে গিয়া থাকেন। প্রভু এই ইলোরার নিকট পাণ্ডুপুরে গিয়াছিলেন। রামযাদব বাবু কষ্টে শ্রষ্টে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি, সেখানে একটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে। কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া ঐ দেশীয় কয়েকজন বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমাদের সংকীর্ত্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে কীর্ত্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু উহার ভাব ও অন্যান্য বিষয় ঠিক আমাদের সঙ্কীর্ত্তনের মত। রামযাদব বাগচী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া

উঠিল। এই বহুদূরদেশে, নিবিড় জঙ্গলে, এই খোল করতাল, এই কীর্ত্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণকুমারটির নাম কিরূপে আইল, ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন। কীর্ত্তনান্তে তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামযাদব বাবুর সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়া গেলেন। দুই দিবসের অনুসন্ধানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেখান হইতে এই খোল-করতাল ও এই কীর্ত্তন আসিয়াছে।" কিরূপে আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তোমাদের দেশের শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয়-কীর্ত্তন ইত্যাদি এখানে হইতেছে।

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে পথে যাইতে যাইতে ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে, এই অদ্ভুত কাণ্ড একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহা হইলে বুঝিবেন যে, রামযাদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। "এখানে তোমাদের শ্রীচৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন"—বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ধর্ম্মের বীজ বপন করা হইয়াছিল। তখন রামযাদব বাবু ভাবিবেন, তাঁহার বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, তিনি গৌরাঙ্গের তথ্য কিছুই জানেন না; আর এই ইলোরায় তাঁহাকে পূজা করে! ইহাই ভাবিয়া তাঁহার নিজের উপর ধিক্কার হইল, আর তখন তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। তল্লাস করিতে গিয়া প্রায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, তিনি বান্ধা পড়িলেন। প্রভু পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিত্র স্থান, ভীমা নদীর ধারে,—

যাহাকে ঐ দেশীয় লোকে গঙ্গা বলেন। এখানে অনেক সন্ন্যাসীর বাস ও আসা-যাওয়া আছে। এখানে তুকারামের বাস ছিল। ইনি মহারাষ্ট্রীয় দেশ ভক্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী শ্রবণ করুন। বহুদিন হইল যখন আমি পুণা নগরে গমন করি, তখন কথায় কথায় এক ভদ্র-মজলিসে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছিলাম। তাহাতে বম্বে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যেমন চৈতন্য আছেন, আমাদেরও তেমনি তুকারাম আছেন। সকলেই আপন আপন দ্রব্য বড় দেখে। তুকারামের মাহাত্ম্যের কথা যদি জানিতে, তবে আর তোমার চৈতন্যকে বড় বলিতে না।"

তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, তিনি অতি নীচ জাতীয়, এবং সাতারা ও পুণার নিকট ভীমানদীর তীরস্থ পাণ্ডুপুরবাসী ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। সেখানে বিট্ঠলদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি আছে, তাঁহাকে পূজা করিতেন। তাঁহার প্রেম অকথ্য, আর শিষ্য অগণন; তিনি বিট্ঠলদেবের সম্মুখে গীত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন। তিনি যেমন গীত গাহিতেন, অমনি তাঁহার ভক্তগণ উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। উহা ক্রমে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। আরও শুনিলাম, তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। অদ্যাপি পুণা-দেশের পণ্ডিতগণ ব্যতীত, অপর প্রায় সকলেই তাঁহার শিষ্য। ইহার কয়েক বৎসর পরে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তাঁহার নিকট আমি তুকারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরেজী ও সংস্কৃতে পরম পণ্ডিত। তিনি

তুকারামের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি কৃপা করিয়া তুকারামের একখণ্ড আভঙ্গ আমাকে আনাইয়া দিলেন। এখানি বড় গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা বুঝেন তাঁহাদের নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয়া লইতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তুকারাম আমাদের গোষ্ঠি, এবং ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী। ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। তখন ভাবিলাম তুকারাম এ রস কোথায় পাইলেন? এ ত শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, "ইহা ত অনর্পিত", ইহা ত অন্য স্থানের লোকদিগের জানা নাই, তবে তুকারাম কি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র? তাহার পরে তুকারামের আভঙ্গে তিনি কিরূপে গুরুর নিকট কৃপা লাভ করেন, তাহা দেখিতে পাইলাম। সেটি এই,—

সদগুরু রায়েন কৃপা মুঝো কলি।
পরি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাঁচি।
সাপড় বিলে ওঘাটে যাতা গঙ্গাস্নান।
মণ্ডকি তুজান ঠেকাইল কর।
ভোজন মাগতি তুপ পাওসের।
পড়িল বিসর স্বপ্না মাজি।
কাঁহি করে উপজলা আগুবায়।
মনোনিয়া কাজ তরা গাজি।
রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য।
সাঙ্গতলি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাজি আপনে সাঙ্গিতলে নমোঙ্গ।
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্ল দশমী পাহুনী গুরুবার।
কেলা অঙ্গিকার তুকা ভনে।

এই আভঙ্গের মোটামুটি বঙ্গানুবাদ করিতেছি—

প্রভু গুরু তিনি আমায় করিলেন কৃপা।
কিন্তু আমা হতে তাঁহার নাহিক হেলো সেবা;
আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাস্নান।
মোর শিরে প্রভু কর করিলা প্রদান॥
প্রভু মোরে চেয়েছিল ঘৃত আর অন্ন।
আমি দিতে নারিনু হয়ে ছিনু অচেতন॥
কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল।
কোন কার্য্যের তরে প্রভু কোথা চলি গেল॥
রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য।
তাঁর কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন॥
বাবাজী বলিয়া বলিল নিজ নাম।
রাম-কৃষ্ণ-হরি নাম করিলেন প্রদান॥
মাঘ শুক্ল দশমী গুরুবার দিনে।
প্রভু কৃপা মোরে কৈল তুকারাম ভনে॥

এখন ইহার পরিষ্কার অর্থ করিতেছি। তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ বলিতেছেন,—"মাঘ মাসে এক বৃহস্পতিবারে শুক্ল-দশমী তিথিতে আমি গঙ্গা (ভীমাকে পাণ্ডুপুরে গঙ্গা বলে) স্নানে যাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রভু দর্শন দিলেন এবং আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহাতে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। আমাকে রাম-কৃষ্ণ-হরি এই তিনটি নাম দিলেন, আর কি সঙ্কেত করিলেন, ও রাঘব-চৈতন্য কেশব-চৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে "বাবাজী" বলিলেন। প্রভু আমার নিকট তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমার মস্তকে হাত দিবামাত্র আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। চেতন পাইয়া দেখি যে,

স্বেচ্ছাময় প্রভু নিজের কার্য্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না।" তুকারাম যে প্রভুর সেবা করিতে পারেন নাই, তণ্ডুল ও ঘৃত দিতে পারেন নাই, সেই ক্ষোভ চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ছিল। তুকারাম বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রভু হরি-কৃষ্ণ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জপ করেন, সেটী এই—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥"

প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র হরি, কৃষ্ণ ও রাম—এই তিনটি নাম। তুকারাম যেরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ অনেক সময় ভক্তগণকে কৃপা করিতেন তাহা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিবার সময় প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়াই জীবকে সমুদয় শক্তি সঞ্চার করিতেন। যথা, চরিতামৃত—

"নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশ।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারি দক্ষিণদেশ॥

কৃপাময় পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু এইরূপে কৃপা করিতে করিতে চলিয়াছেন। ক্রমে পাণ্ডুপুর—তুকারাকের স্থানে আসিলেন। এইরূপে যে সকল মহাভাগবত সৃষ্টি করিতে করিতে তিনি যাইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই—তিনি যে কে, কোথা বাড়ী, কি নাম, তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রভু "কৃষ্ণকেশব পাহিমাং, রামরাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় ভীমানদীর তীরে তুকারামকে দেখিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কর্ণে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, হয়ত তিনি

তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভৃত্য হয়ত বলিয়া থাকিবেন যে, প্রভুর নাম, "কৃষ্ণচৈতন্য"। কিন্তু প্রভু যখন তুকারামকে স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যের কাছে শুনিলেন, প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভুর মুখে "রাম-রাঘব কৃষ্ণকেশব" শ্লোক শুনিলেন। ইহাতে তিনি বাবাজীর নাম,—হয় 'কেশবচৈতন্য', নয় 'রাঘবচৈতন্য এইরূপ কিছু হইবে সাব্যস্ত করিলেন। বস্তুত এক সন্ন্যাসীর দুই নাম হইতে পারে না। কাজেই তুকারাম অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে তাঁহার প্রভুর নাম, হয় রাঘবচৈতন্য, নয় কেশবচৈতন্য হইবে। বিশেষতঃ সাধুগণের "বাবাজী" আখ্যা কেবল বাংলায় প্রচলিত আছে, আর কোথায়ও নাই।

আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিতেছেন যে, "গুরুর সহিত পথে দেখা হয়। দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন তাহাতেই আমি অচেতন হই॥" এই গুরু কে? এ শক্তি একমাত্র মহাপ্রভুই জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরুর কাছে তুকা কি তত্ত্ব শিখিলেন? শিখিলেন, 'ব্রজের নিগূঢ় রস, যাহা জগতে পূর্ব্বে ছিল না।' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীরামানুজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায় আছে। এই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই; কেবল আছে, মহাপ্রভু সম্প্রদায়ে। সুতরাং তাঁহার গুরু,—"হয় মহাপ্রভু স্বয়ং, না হয় তাঁহার কোন ভক্ত।" কিন্তু তিনি কে? তুকারাম বলিতেছেন তাঁহাকে চিনি না, একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম. দেখিয়াই অচেতন হই। এমন কি, তিনি যে চাউল আর ঘৃত চাহেন তাহাও দিতে পারি নাই।" তখন তাঁহাকে বলিলাম, "একটু ঠাহুরিয়া দেখ দেখি, তিনি কে বলিতে পার কি না?" তুকারাম বলিলেন,—"তিনি আমাকে তিনটী নাম দেন—কৃষ্ণ,

হরি ও রাম।" [এ তিনটি নাম মহাপ্রভুর বহিরঙ্গের পক্ষে মূলমন্ত্র, ইহাতে মনে হয় তাঁহার গুরু শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং।] তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কিছু কি মনে পড়ে?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার নাম শুনিলাম যেন কি চৈতন্য,—হয় কেশবচৈতন্য, কি রাঘবচৈতন্য।"

[মহাপ্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, সুতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় যে, তুকারামের গুরু আর কেহ নহেন,—মহাপ্রভু স্বয়ং। তাহা যদি না হইবে তবে তুকা "কেশব," "রাঘব" এ কথা কোথা পাইলেন? তাহার উত্তর এই যে, মহাপ্রভু "কৃষ্ণকেশব পাহিমাং" "রামরাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে পথে যাইতেন।]

তাহার পর তুকা বলিলেন,—যেন তাঁহার আর এক নাম শুনিলাম, "বাবাজী"।

[এই বাবাজী শব্দ কেবল বাংলায় প্রচলিত,—বৈষ্ণব ভক্তগণকে বুঝায়। সুতরাং তুকারামের এই গুরু যে বাঙ্গালী, তাহাতে সন্দেহ নাই।]

তখন প্রশ্ন হইল,—"ভাল, তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব?" তুকারাম বলিলেন, "আমরা চৈতন্য-সম্প্রদায়ের।"

এখন দেখুন জগতে চৈতন্য এক বই দুইজন নাই। আমরা দেখিতেছি যে, মহাপ্রভু সেই সময় এই পাণ্ডারপুর গিয়াছিলেন। আমরা আরও দেখিতেছি যে, তিনি এইরূপে "আচার্য্য" সৃষ্টি করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, তুকা মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব ইহা ভুল। আর যদি ভুল না হয়, তবে তুকার সেই গুরু যে প্রভুর কোন ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তুকা চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন না। তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন, আর

সেই অবস্থায় বিট্‌ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য করিতেন ও তখনি রচনা করিয়া গীত গাহিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্রুতবেগে অগম্য দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছেন, সেখানেই তাহাকে কৃপা করিতেছেন। আর যদি পথের মাঝে সে ব্যক্তি না থাকে, তবে প্রভু পথ ত্যাগ করিয়া বিপথ দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি অল্প, দুই এক বৎসরের মধ্যে সমুদয় দক্ষিণদেশে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তাই যখন অন্তর্য্যামী প্রভু জানিলেন যে, কোন স্থানে একটি বিষবৃক্ষ আছে, অমনি সেই স্থানে যাইয়া সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটি কর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে একটি অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। প্রভু শিশুবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরূপ বড় বৃক্ষের নিকট যাইতেন। কারণ শিশুবৃক্ষে বীজ ফলে না, বর্দ্ধিত বৃক্ষেই ফলে। উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিতেছেন। এইরূপে ভুবন-পাবন প্রভু আশ্চর্য্য শক্তি সৃষ্টি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রভু কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, ইহা অমানুষিক শক্তি। মূর্খ নীচজাতি তুকারাম প্রভুর স্পর্শ পাইল, আর তাহার হৃদয়ে উজ্জ্বল-নীলমণির সমস্ত রস স্ফুরিত হইল, ইহা অমানুষিক শক্তি সন্দেহ নাই।

পাণ্ডুপুর হইতে অল্প দূরে ইলোবায় প্রাচীন মন্দিরসমূহ। সেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, প্রভু সেখানে গমন করেন। রামযাদববাবুও সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে কি জানিতে পারিয়াচিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—

"কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাপার্ব্বতী ॥

তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিট্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তুকারাম যেরূপ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন, তাহা শুনিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুর নিজের কার্য্য, অপর কেহ এরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিভাজন বৃন্দাবনের পরমপণ্ডিত ও পরমভক্ত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু কখন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না, আর কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। সুতরাং তাঁহার অনেক লীলা অপ্রকাশ আছে। আমাদের এই পশ্চিমদেশে মহাপ্রভুর একটি শাখা আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে থানেশ্বরী-শ্রীজগন্নাথের পরিবার বলিয়া থাকেন। এই থানেশ্বরী গ্রামটি কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী। থানেশ্বরী-জগন্নাথের বংশধরেরা এই আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, "শ্রীমহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিতের দরজার সম্মুখে একটী বৃক্ষমূলে তিনদিন দিবারাত্র উপবেশন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ শঙ্কর মতানুযায়ী বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ও বাড়ী আসিবার সময় প্রভুকে দেখিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীমহাপ্রভুও নেত্র নিমীলন করিয়া হরিনাম করিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। গ্রামের সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিত, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতের আরও হাসি পাইত। পণ্ডিতপ্রবর যখন প্রভুকে দেখিয়া হাসিয়া যাইতেন, প্রভুও সেই সময় পণ্ডিতের দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পণ্ডিত যদিও বিদ্যাদর্পে হাসিতেন, কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিপাতের সময় তাঁহার মন কেন যে অস্থির হইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তবে তিনি যাইবার সময় প্রভুকে হাসিয়া

একটি কথা বলিয়া যাইতেন, সেটী এই,—"অহং ব্রহ্মোঽস্মি।" তিন দিনের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকবার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ও শ্রীমুখের হরিনাম শ্রবণ করিয়া, চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার পূর্ব্বেকার যে বাক্য "অহং ব্রহ্মোঽস্মি" উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক জোড়হস্তে ক্রন্দন করিয়া, "তত্ত্বমসি" "তত্ত্বমসি" বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পণ্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং তথায় শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রমে রহিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দোহাই দিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন।"

এইরূপ জীবোদ্ধার পদ্ধতি দেখিলে প্রভুর কথা মনে পড়ে। প্রকৃতই এই কাহিনী তুকারামের কাহিনীর সহিত অনেক ঐক্য। তুকারামের গণ দক্ষিণে, আর থানেশ্বরী-জগন্নাথের গণ উত্তরে। তুকারামের গণেরা বলেন, তাঁহারা চৈতন্য-সম্প্রদায়। জগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন। তুকারামকে প্রভু অন্যের অগোচরে কৃপা করেন, জগন্নাথকেও তাহাই করেন। ফল কথা, আবার বলি, ঐ কৃপা-পদ্ধতি দেখিলে বোধ হয় যে ইহা মহাপ্রভুর কাণ্ড। তবে প্রভু যে থানেশ্বর গিয়াছিলেন কোন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ নাই। হয়ত ইহা হইতে পারে, জগন্নাথকে (তাঁহার নিজগ্রামে নয়,) বৃন্দাবনের পথে কোন স্থানে কৃপা করিয়া থাকিবেন।

প্রভু যুবতী ভার্য্যা ও বৃদ্ধা মাতা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়া রাজরাজেশ্বরের সেবা ছাড়িয়া এখন দক্ষিণদেশে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, পথশ্রান্তে তাঁহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। যখন দক্ষিণে গমন করেন, তখন ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করেন সেখানে কেন যাইতেছেন? প্রভু বলিলেন, "আমার দাদার তল্লাসে।"

কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল জীবের মঙ্গল। সেই জীব তাঁহাকে আদর করিতেছে না, তাহাতেও তাহাদের প্রতি তাঁহার মমতা কমিতেছে না। তিনি কৃপা করিলেন, করিয়া পাছে তাঁহাকে তাহারা জানিতে পায়, তাই তথা হইতে দৌড় মারিয়া পালাইলেন। তাঁহার বড় ভয়, তিনি যে কে, পাছে তাহা জানিতে পারিয়া কেহ তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয়, কি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,—"সাধে কি তার লাগি ঝুরে মরি। না জানি কত তার ধার ধারি।"

অনেক সময় প্রভুর এই কৃপাপদ্ধতিতে একটু রহস্য-রস দেখা যাইত। এইরূপে তিনি শিখি মাহিতীকে কৃপা করেন। শিখি স্বপ্নে দেখিলেন যে, প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন। এইরূপে তুকারামের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে পাগল করিয়া প্রভু পলায়ন করিলেন। তুকারাম চেতন পাইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু পাণ্ডুপুর আসিবার পূর্ব্বে প্রভু অনেক মধু হইতেও মধুর লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরীনগরে আসিয়া দেখিলেন সেখানে বহু অট্টালিকা ও অসংখ্য কুণ্ড। সেখানে স্নান করিয়া একটি কুণ্ডতীরে বসিয়া তিনি হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। লোক জুটিতেছে, দাঁড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, আর বলিতেছে "কি মধুর! কৃষ্ণনাম এত মধুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মুখে হরিনাম বড়ই মধুর!" কিন্তু প্রভুর মুদিত নয়ন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

চক্ষু মুদি গোরাচাঁদ ভুলিতে লাগিলা।
নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিলা॥
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়।
কৃষ্ণহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায়॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল।
আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল॥

কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায়॥
ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি।
এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী॥
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি॥
এইভাবে নানা কথা কহে গোরারায়।
ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায়॥
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন।
প্রভুর সমীপে সব করে আগমন॥

অর্জ্জুন নামক একজন মহাপণ্ডিত সেখানে বসিয়া সব দেখিতেছেন। কিন্তু তবু তাঁহার কঠিন মন বিন্দুমাত্র অবশ হইল না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, শুষ্ক বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। এমনি ভাবে ডাকিলেন যেন কৃষ্ণ সম্মুখে, আর সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। এই ডাক শুনিয়া সকলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

সে স্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল।
দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল॥
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া॥
নাম শুনিবারে, যেন স্বর্গে দেবগণ।
মাথার উপরে আসি করিছে শ্রবণ॥

ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥
প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিযা।
হরিনাম শুনিতেছে বিহ্বল হইয়া॥
এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিলা নাচিতে॥

তখন হুঙ্কার গর্জ্জনে সকলকে বিমোহিত করিয়া প্রভু অচেতন হইয়া পড়িলেন। আর সকলে তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। এরূপ তরঙ্গ উঠিল যে সকলেই তাহাতে ডুবিয়া গেলেন; তখন অর্জ্জুনের আর বিচার-ইচ্ছা রহিল না।

সেখান হইতে প্রভু গুর্জ্জরী, আর গুর্জ্জরী হইতে বিজয়পুরে এবং তথা হইতে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুরে বিট্‌ঠল ঠাকুর দর্শন করিতে গেলেন। এই তুকারামের স্থান। সেই পর্ব্বত হইতে নামিয়া তিনি কুলাচলে উঠিলেন এবং অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন। বাঙ্গলায় যেমন নবদ্বীপ, দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছসর সরোবরের তীরে একটি বৃহৎ বকুলতলায় প্রভু বসিলেন। নবদ্বীপে গঙ্গাতীরের ন্যায় সেখানেও অধ্যাপক ও পড়ুয়ার মেলা হয়। প্রভুকে দেখিয়া সেখানেও বিস্তর লোক জুটিতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন, গাত্র ধূলায়

ধূসরিত, উপবাসে শরীর শীর্ণ। আবার তাঁহার সৌন্দর্য্য অমানুষিক, তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কারুণ্যরসের উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, আর এই গোলকের বস্তুটীকে কুসুমাসনে যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া সেবা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রভু নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন আর আপনার মনে কৃষ্ণের সহিত কথা বলিতেছেন, "কৃষ্ণ দেখা দাও, আমি বাঁচি না। আমি কোথায় গেলে তোমায় পাব ··" প্রভুর সেই আবেগপূর্ণ কথা শুনিয়া ও তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া পণ্ডিতগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এই সময় হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি কেন ব্যাকুল হইতেছ? তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন।" "এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিল। লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাঁড়াইল॥ এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।"

তখন প্রভু এরূপ করুণ কণ্ঠে কান্দিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পণ্ডিত আবার ঐ কথা বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর কেন কান্দ, তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরেই আছেন।" আবার প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, হুহুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন।

লোকে তখন প্রভুর ভাব দেখিয়া এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার জলে ঝাঁপ যে তাহার মনোগত কার্য্য, কাচপনা নয় তাহা সকলে বুঝিলেন। কাজেই বহুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন; এবং প্রভুকে উঠাইয়া সকলে সেই পণ্ডিতকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন চেতন পাইয়াছেন। সেখান হইতে প্রভু ভোলেশ্বর গেলেন। প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব। সেখান হইতে দেবলেশ্বরে এবং তথা হইতে জিজুরিনগরে খাণ্ডবাকে দর্শন

করিতে চলিলেন। এখানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হয়েন। ইহাদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কন্যার বিবাহ না হয়, তাহার বিবাহ খাণ্ডবার সঙ্গে হয়,—ইহারাই মুরারি। খাণ্ডবা মন্দির তাহাদিগকে পালন করেন। আর সেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহারা যেন খৃষ্টিয়ানদিগের "নন"। ননদিগের ন্যায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেশ্যাবৃত্তি করেন। এমন কি, তাহাদের এক পাড়া হইয়াছে, সেখানে কোন ভদ্রলোক যায় না। ইহাদের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়া উপজিল। দেখুন, প্রভুকে যে সকলে দয়ার-ঠাকুর বলে, সে সাধে নহে। দুঃখ তিনি দেখিতে পারিতেন না, দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। মুরারিগণের কথা শুনিবামাত্র প্রভুর হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে নগ্নপদে, অনাহারে, অনিদ্রায় হাঁটিতেছেন কেন? কেবল জীবের প্রতি দয়ার নিমিত্ত। প্রভুর কি ইহাতে কিছু স্বার্থ আছে? কিছুই না। বরং তিনি যদি দেখেন যে কোন স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি সেখান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলে "তুমি ভগবান," অমনি জিভ কাটেন; যদি রাজা পদতলে পড়েন, অমনি তাহাকে দূর দূর করেন। যে তাঁহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। তাই বাসুঘোষ প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥"

গোবিন্দ ভয়ে আকুল; বলিলেন, "প্রভু, করেন কি সেখানে যাবেন না; লোকে কি বলিবে?" প্রভু সে কথা শুনিলেন না,—একেবারে মুরারিপাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই মুরারিগণ অপরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নির্ম্মল পবিত্র বদন, ও অরুণ করুণ নয়ন

দেখিয়া মুরারিগণের হৃদয় ভক্তি ও কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইল; আর তাঁহারা অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমাদের পতি কৃষ্ণ, তোমাদের আর ভাবনা কি? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে ভজিতে হইবে।" ইহা বলিয়া প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শেষে যাহা হইবার তাহাই হইল,—মুরারিগণ তাঁহাদের পাপ স্মরণ করিয়া অস্থির হইলেন, আর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দিরা বলিলেন —"বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকর্ম্ম করিয়া। উদ্ধার কর হে মোরে পদধূলি দিয়া॥ ইহা বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।" এখন প্রভুর কাণ্ড শ্রবণ করুন। মুরারিরা সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত্ত হইলেন, একজনও আর কুপথে রহিলেন না।—এত দিনে প্রকৃতই তাহারা দেবদাসী হইলেন।

সেখান হইতে প্রভু চোরানন্দী চলিলেন। এখানে ডাকাতের বাস, তাহারা বড় বলবান। সকলে প্রভুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামস্বামী বলিলেন, "স্বামিন, অবশ্য তোমার কোন ভয় নাই, কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাও? সে ত তীর্থস্থান নয়, তুমি যেও না। কারণ—"যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ। তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন।"

প্রভু অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।" তাঁহার কি প্রয়োজন, পরে জানা গেল। সেখানে প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ আছে, সেটী ছেদন করিতে হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রভু গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটী বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়া যেন বিশ্রাম করিতে তাহার তলে বসিলেন। তখন বেলা আন্দাজ এক প্রহর। দস্যুগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, কেহ যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের গ্রামে

প্রবেশ করিতে না পারে। এই জন্য প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রভুকে দেখিল, দেখিয়া নিকটে আসিল। সেই সঙ্গে আরও দুই এক জন আসিল। তাহারা আসিয়া প্রভুকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর না পাইয়া বলিল যে, তিনি সেখানে বসিতে পারিবেন না। তাহাদের সর্দ্দারের নিকট তাঁহার যাইতে হইবে। প্রভু মাথা নাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহরীরা জিদ্ করিতে লাগিল, ইচ্ছা যেন বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রভুকে যে জোর করিয়া লইয়া যাইবে, সে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রভুকে দেখিয়াই তাহাদের একটু নরম হইতে হইয়াছে। পরে তাহারা অভ্যন্তরে যাইয়া সর্দ্দারকে সংবাদ দিল,—সর্দ্দারের নাম নারোজী। সে অতিশয় বলবান, ভারি যোদ্ধা, বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সর্দ্দার একটি সন্ন্যাসী আগমনের কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, এবং প্রভুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক। তাঁহার বর্ণ কাঁচা-সোনার ন্যায়, অঙ্গ দিয়া লাবণ্য চোঁয়াইয়া পড়িতেছে, বদন সুন্দর, নির্ম্মল ও চিত্তাকর্ষক। নারোজীর যাহা কখনো হয় নাই, এখন তাহাই হইল,—অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। তখন সে সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করিল, এবং তাহার দেখাদেখি সমুদয় দস্যুগণ তাহাই করিল।

প্রভু হাঁ না কিছু না বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তখন নারোজী করজোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন, আপনার সেবা করিব।" প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও যাইবেন না, এই বৃক্ষতলেই থাকিবেন। দস্যুপতির ইহাতে ক্রোধ করা উচিত ছিল, কারণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ যে পারে, ইহা তাহার জানা ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ করিল না, অনুচরগণকে গোঁসাইর

নিমিত্ত দুধ আটা চিনি ইত্যাদি আনিতে বলিল। অনুচরগণ ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের কর্ত্তার কাহাকেও এরূপ আদর করা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহারা নানাজনে নানারূপ আহরীয় দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভু তখন নয়ন মুদিয়া আছেন, আর নারোজী স্থিরনেত্রে তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই বিচলিত হইতেছেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় গেল। তখন মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, যাহা মনে আসিতেছে তাহাই বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "কত পাপ করিয়াছি! কেন পাপ করিয়াছি? লোকের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হস্তে বধ করিয়াছি, কেন? স্ত্রী-পুত্রের নিমিত্ত? আমার ত স্ত্রী-পুত্র নাই। আপনার উদরের জন্য? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা করিয়া দুটা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম, এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে। আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, প্রাণের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর একি বিপদ? আমার হৃদয়ে দয়ামায়া নাই। কিন্তু—সন্ন্যাসী দেখিয়া আমার প্রাণ কান্দে কেন?"

প্রভু নয়ন মুদিয়া আছেন, পরে উহা হইতে দরদরিত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, এবং উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে আহারীয় দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, প্রভু তাহার মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে জিনিস সব নষ্ট হইতে লাগিল। তদ্ যথা—

"দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্যরাশি॥"

নারোজী বলিলেন—

"নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়
পুনঃ যোগাইব আমি এই দ্রব্যচয় ॥"

এইরূপে—"অপরাহ্নকালে মোর গোরাগুণমণি। প্রেমে মুরছিত হইয়া পড়িল ধরণী ॥"

তখন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া আশ্রয় চাহিলেন। অগ্রে হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাকি ছিল কৌপীন-পরিধান, তাহাও করিলেন; করিয়া সেই প্রকাণ্ড দেহধারী যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতেছেন—

"এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তিধূমে।
আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিলাম ভূমে ॥
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি।
এই হস্তে কত নর হত্যা করিয়াছি ॥

নারোজী তাহার দলস্থগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাও, সুপথে গমন কর, আর কুকার্য্য করিও না ॥" ইহা বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু চলিলেন, পশ্চাতে নারোজীও চলিলেন, প্রভু নিষেধ করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, মুখে বাক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভু জানিলেন কি না তাহাও বুঝা গেল না। সেই দিন হইতে তাঁহারা তিন জন হইলেন। সেই চোরানন্দী, যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন উহা "কিরকি" উপনগর, সেখানে বম্বের লাটসাহেব বাস করেন। সেখানে হইতে খণ্ডলা যাইয়া প্রভু মূলানদীতে স্নান করিলেন। খণ্ডলাবাসিগণ আতিথ্যধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তদ্‌যথা—

"বড় আতিথেয় হয় যত খণ্ডলিয়া।
টানাটানি করে সবে প্রভুকে লইয়া॥
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল।
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল॥

প্রভু বলিলেন, "আমার সঙ্গীরা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। আমাদের যাহা প্রযোজন তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।"

এত বলি প্রভু আর বাক্য না কহিল।
নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল॥

পরে প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত রজনী প্রভু নৃত্য করিয়া কাটাইলেন। এই এক রজনীর মধ্যে উপস্থিত সমস্ত লোককে হরিনাম বিতরণ করিতে হইবে। সেখানে বহুলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই রজনীতে প্রচুর ভজনের ফললাভ করিয়া চিরজীবন, এমন কি পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শনে মন পবিত্র হয়, তাঁহার সঙ্গে এক রজনী যাপন করিয়া ফল কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। গৌরাঙ্গ প্রভুর পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে যে ফল হয়, খণ্ডলাবাসিগণের তাহাই হইল। নারোজী সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। সে কিরূপে না—"কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায়।"

প্রভু সেখান হইতে নাসিক, নাসিক হইতে দমনগরে ও তৎপরে পঞ্চদশ দিবস পথ চলিয়া সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট হইতে বরোচ, বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। সেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে বিপদ ঘটিল। এ পর্য্যন্ত আন্দাজ দেড়মাসকাল নারোজী প্রভুর পশ্চাতে ছায়ার মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রভুর সঙ্গে আসিতেছেন ইহাতে প্রভু আপত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, নারোজী ভেক

লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার যে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তাহাও প্রভু অবশ্য জানিতেন। নারোজী প্রভুর নানা সেবা করিতে করিতে যাইতেছেন, যথা—পাদসম্বাহন বায়ুবীজন, মূর্চ্ছার সময় সন্তর্পণ ইত্যাদি।

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে নারোজীর জ্বর হইল, এবং তিন দিন পরে—"জ্বররোগে নারোজীর মরণ ঘটিল।
মৃত্যুকালে সম্মুখে বসিয়া গোরারায়। পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায়॥
নারোজী মরণকালে জোড়-হাত করি। চাহিয়া প্রভুর পানে বলে হরি-হরি॥
যেই কালে নারোজী নয়ন মুদিল। আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণনাম দিল॥
নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর। তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর॥"

আপনারা এখন বলুন—মৃত্যুর পরে নারোজীর কি গতি হইল? যদি কেহ অন্যের এক কপর্দ্দক হরণ করে, তবে সে দণ্ডার্হ হয়। নারোজী বহুতর লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে আঘাত করে, তবে সে দণ্ডনীয় হয়। নারোজী বহু লোকের প্রাণ বধ করিয়াছেন। অতএব নারোজীর কি গতি হইল? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন।

যাঁহারা মহাজ্ঞানী, তাঁহারা বলেন যে, কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, তাহা হইতে কাহারও অব্যাহতি পাইবার যো নেই। অর্থাৎ তুমি তোমার ভালমন্দের কর্ত্তা। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে ভাল ফল আহরণ করিতে পারিবে, কিম্বা যদি ইচ্ছা কর আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে। তাহা যদি হইল, তবে ভগবান কোথা থাকিলেন? বরং লোকে ভগবানকে অবহেলা করিয়া বলিবে,—"আমি যদি ভাল হই, তবে তুমি ভগবান ক্রোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে তুমি ভগবান আমাকে রক্ষা করিতেও পারিবে না।" তাহা যদি হইল,

তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব? এই সমুদয় জ্ঞানীলোক প্রকারান্তরে বলেন যে, আমাদের কর্ত্তা অপর কেহ নাই, আমাদের কর্ম্মই আমাদের কর্ত্তা। সুতরাং ভগবদ্‌ভজনের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বলেন,—"শ্রীভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম্ম ধ্বংস করেন।" ইহার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? এই তত্ত্ব নারোজীর জীবনী হইতে মীমাংসা হইবে।

নারোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর ভজন করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার হত্যাকারীদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। আর নারোজী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মনুষ্য বধ করিয়া আসিয়াছেন। হরিদাসের দেহ লইয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহটি তখন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতেই প্রভু তাঁহার দেহ কোলে লইলেন, তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইলেন, আর তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম দিলেন। প্রভুর দয়া ও শক্তি প্রবোধানন্দ এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিধু ক্কাপি নো সন্।
যদ্দত্তং শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং॥"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখনও পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন-রচিত স্থানে গমন করে নাই, সেই ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার।

প্রভু জগাই-মাধাইকে নিমেষ মধ্যে জীবাধম হইতে ভক্তশিরোমণি

করিলেন। নদীয়ার লোক তাহাতে কি প্রভুকে দুষিয়াছিল? মনে ভাবুন, জগাই মাধাই কর্ত্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমত লোক নদীয়ায় বিস্তর ছিল। তাহারা জগাই মাধাইর উদ্ধার শুনিয়া প্রতিশোধের ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল যে, যাইয়া তাঁহাদিগকে বলিবে, "কেমন রে ডাকাত, এখন কেমন?" কিন্তু যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতিশোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ পাইল। যিনি ঘাটে যাইতেছেন জগাই মাধাই অমনি তাঁহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, "জানিয়া বা না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে আমাদের মাপ কর।" যাহাদের কাছে ইহারা প্রকৃত অপরাধ করিয়াছেন তাহারা তাঁহাদের তখনকার দশা দেখিয়া আর তাঁহাদের প্রতি কৃপার্ত্ত না হইয়া পারিতেছে না, পুর্ব্বেকার শত্রুতার নিমিত্ত যে প্রতিশোধের ইচ্ছা তাহা লোপ হইয়া যাইতেছে। মাধাই যাহার অনিষ্ট করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বকার প্রতাপ ও এখানকার দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপার্ত্ত হইতেছে, তখন ভগবান কেন হইবে না? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই দণ্ড প্রার্থনা করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না।

বিদ্যাপতি প্রার্থনা করিলেন যে, "হে প্রভু, যখন তুমি বিচার করিবে তখন আমার গুণলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি করুণা চাই। আবার বড়লোকেরা ভগবানের ন্যায়পরায়ণতার বড় পক্ষপাতী। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিৎ, যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, তবে তাঁহাদের নিজেদের কি দশা হইবে? ভগবান যদি বিচারপতি হইয়া বসেন তবে আমাদের কাহারও অব্যাহতি নাই, তুমি যে এতবড় লোক তোমারও অব্যাহতি নাই। অতএব "আমি আমার ভালমন্দের

কর্ত্তা, শ্রীভগবান নহেন", ইহা বাতুলের কথা, প্রকৃত জ্ঞানীর কথা নয়।

পূর্ব্বে বলিলাম, প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এখানে স্থর্পনখার নাসিকা ছেদন করা হয় বলিয়া ইহা তীর্থস্থান। সেখানে রামের কুটীর ও তাঁহার চরণচিহ্ন আছে। প্রভু সেখানে গিয়া—

কোথা মেরি রাম বলি উঠিল কান্দিয়া॥
পদ্মগন্ধ বহিতেছে প্রভুর শরীরে।
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে॥
কিকব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥
কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥

সেখানে লক্ষ্মণ স্থাপিত গণেশ আছেন। সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় প্রভু একা বসিয়া আছেন। গোবিন্দ ভিক্ষা নিমিত্ত গিয়াছেন, নারোজী দূরে ফল আহরণ করিতেছেন।

গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে জঙ্গলে আলো দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি নিঃশব্দে প্রভুর নিকটে আসিতে লাগিলেন। দেখেন কি—

ঝিম্ ঝম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে শ্রীগৌরসুন্দর॥
অঙ্গ হতে বাহির হতেছে তেজোরাশি।

তেজ দেখিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাঁধা লাগিল। তিনি গুটি গুটি আরো নিকটে যাইয়া এক ধারে দাঁড়াইলেন।

পদ শব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচম্বিতে।
সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে॥

শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মুহুর্মুহু প্রকাশ হইতেন, তখন তাঁহার শরীর সহস্র সূর্য্যের তেজ ধরিত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আর প্রকাশ হইতেন না।

সেখান হইতে দামন নগরে আসিলেন। সে স্থান ত্যাগ করিয়াও পঞ্চদশ দিবস হাঁটিয়া সুরাটে গেলেন। প্রভু আজ সমুদ্রধারে আসিয়াছেন, এবার পশ্চিমধারে। সেখানে সুরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজাদেবী আছেন। প্রভু সেখানে তিন দিবস ছিলেন। একজন ভালমানুষ সন্ন্যাসী প্রভুর নিকট সাধনভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তাহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগ বলি দিতে আসিল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা পাইয়া তাহাকে বলিলেন, "দেবী বৈষ্ণবী, তিনি মাংস আহার করেন না। তাঁহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমরা মাংস ভক্ষণ করিবে? জীবটা পরিত্যাগ কর।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। তাহার পরে প্রভু তাপ্তী-নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। সেখানে বলি-স্থাপিত বামন আছেন, আর সেই নিমিত্ত সেই নদী তীর্থরূপে পরিগণিত। সেখান হইতে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবার নিমিত্ত বরোচ নগরে নর্ম্মদার তীরে গমন করিলেন। সেখান হইতে বরোদা নগরে যাইয়া ডাঁকরজী দেখিতে চলিলেন। ডাঁকরজী দেখিয়া আবার বরোদায় ফিরিয়া আসিলেন। বরোদার রাজা পরম বৈষ্ণব। সেখানে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপ রুদ্রের ন্যায় স্থানীয় রাজা স্বহস্তে মন্দির পরিস্কার করেন, স্বহস্তে

তুলসীমঞ্জরী তুলিয়া গোবিন্দের পাদপদ্মে দিয়া তাঁহার পূজা করেন। প্রভু সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়া প্রেমে অধীর হইলেন।

ছিন্ন এক বহির্ব্বাস পাগলের বেশ।
সদা উনমত প্রভুর কৃষ্ণের আবেশ॥

এখানে নারোজী এক তমাল-তলায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিলেন। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু অমনি তমাল-তলা হইতে নারোজীর দেহ স্থানান্তরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সমাধি দিলেন। পরে যেরূপ হরিদাসের অন্তর্ধানের সময়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সমাধি বেড়িয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাকলরব হইল, শেষে রাজা আসিলেন। রাজার ইচ্ছা প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন। প্রভু বলিলেন যে, বিলাসীর ভিক্ষা তিনি লয়েন না। কিন্তু রাজা ছাড়েন না। তখন প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টিভিক্ষা লইলেন। প্রভু বরোদা ত্যাগ করিয়া মহানদী (যাহা মানচিত্রে মাহি বলিয়া পরিচিত) পার হইলেন। পরে আহম্মদাবাদে যাইয়া প্রভু প্রথমে মুসলমানরাজ্যের নিদর্শন পাইলেন। বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া আর উহা দেখেন নাই। প্রতাপ-রুদ্রের সাম্রাজ্য গোদাবরীর ওপার পর্য্যন্ত। সেখান হইতে যত দেশে গিয়াছেন, সমুদয় হিন্দুশাসনাধীনে। আহম্মদাবাদে কোন মুসলমানকে দেখিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। নগর অতি জাঁকের, বড় বড় অট্টালিকা দ্বারা শোভিত। নগরবাসীরা অতিথি-সেবায় অনুরক্ত। প্রভুকে লইয়া সকলে টানাটানি করিতে লাগিল। প্রভু গৃহস্থের বাটী যাইতে অস্বীকার করিলেন। বহুতর লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবতের কথা উঠাইয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রভুর একটু কথা হইল।

পরে লোক-কলরব, কীর্ত্তন, প্রভুর নৃত্য। তাহার পরে যাহা হয় তাহা হইল,—প্রভু বহুলোকের হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিলেন।

তাহার পরে শুভ্রামতী নদী পার হইয়া প্রভু নদীতে স্নান করিতে গেলেন। এমন সময় গোবিন্দ দেখিলেন কয়েকজন লোক দ্বারকা-তীর্থে গমন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী আছেন মনে হওয়ায় গোবিন্দের তাহাদের সহিত আলাপ হইল। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কুলীনগ্রামের বসু-পরিবারের একজন আছেন, নাম রামানন্দ, অপরের নাম গোবিন্দচরণ। রামানন্দ গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তিনি কোথা?" গোবিন্দ বলিলেন, "ঐ যে তিনি নদীতে (শুভ্রামতী) স্নান করিতেছেন।" রামানন্দ অমনি দ্রুতপদে গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি আমাকে দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে।" নিত্যানন্দ প্রভৃতি দুইশত জনে নীলাচলে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাঁহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার অভাবে শ্রীনবদ্বীপ অন্ধকার। যথা, প্রেমদাসের গীত—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া সুধায়, যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ? ধ্রু।
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা॥

আর প্রভুর নিজ বাড়ী, তাঁহার জননী ও তাঁহার ঘরণী, কোথায় তাঁহারা? আর কোথায় আমাদের প্রভু? সকলকে ছাড়িয়া, সংসার

ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কৌপীন পরিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। সকলে একত্র হইয়া বাঙ্গালায় কথা কহিতে কহিতে দ্বারকায় চলিলেন। দুই গোবিন্দ মিতালি পাতাইয়াছেন। প্রভু গোবিন্দকে ও গোবিন্দচরণকে বলিতেছেন, "তোমরা যদি মিতা হইলে, তবে রামানন্দও আমার মিতা।" রামানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া করজোড়ে যেন অনুনয় করিতে লাগিলেন। রামানন্দকে কে না জানে? ইনি বিখ্যাত পদকর্ত্তা। প্রভু সমুদয় ভুলিয়াছেন, কেন? তাহার হৃদয়ে কেবল এক ইচ্ছা রহিয়াছে—জীবোদ্ধার, তাই রামানন্দ ও গোবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন, "আমার যে একটা দেশ আছে, তাহা তোমারা স্মরণ করাইয়া দিলে।" রামানন্দ নিজ পদে বলিয়াছেন—

"রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি, গৌর আমায় পাগল করিলে।"

পরে সকলে ঘোগা নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুদ্রের ধারে ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেখানে এখন রেলপথ গিয়াছে। এখানে বারমুখী নামক বেশ্যা বাস করে। তাহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে আর নাই, তাহার ঐশ্বর্য্যেরও সীমা নাই। যথা—

"বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহুধন।
বহুমূল্য হয় তার বসন ভূষণ॥
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে সেইখানে।
জাঁক পসারের কথা সব লোক জানে॥
"প্রকাণ্ড বাগিচা---নামে পিয়ারা-কানন।
কাননের ধারে প্রভু করেন গমন॥
অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে সেইখানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে॥"

বারমুখীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ীর পার্শ্বে প্রকাণ্ড

বাগানে, এমন স্থানে বসিলেন যে, বারমুখী জানালায় বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। প্রভু বাগানে, বারমুখী দোতালায় জানালায় বসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে, অথচ প্রভুর তাহাকে দেখিবার কোন সুবিধা নাই। তবু ঠিক জানিবেন যে, প্রভু জানিতেছেন যে, বারমুখী তাঁহাকে দেখিতেছে। বারমুখী তাঁহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেখানে গিয়াছেন কেন? বারমুখী যেমন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরীর শিরোমণি, প্রভুও তেমনি সুন্দরের শিরোমণি। প্রভু ও তাঁহার তিনজন ভক্ত সেখানেই সেবা করিলেন। সেখানে যে লোক জুটিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

পিচকারী সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরি-সংকীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারিজন॥
গ্রাম্যলোক-জনের নয়নে বহে বারি।
বহুলোক আসি দাঁড়াইল সারি॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়।
অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায়॥
কখন হাসিছে প্রভু কখন কান্দিছে।
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে॥
থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম্ম-বারি বহে।
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে॥
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণকৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃষ্ণ প্রেমে সদা মত্ত নবীন-সন্ন্যাসী।
এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী॥

হরি হরি বলিতে আনন্দ-ধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাড়াইয়া রহে॥
"কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ" এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি উর্দ্ধমুখে থাকে॥
একবার ঐ যে বলি ধাইয়া চলিলা।
বাহু পসারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিলা॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুঞি কভু দেখি নাই॥
প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে॥

বারমুখী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্যকে বরাবর মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। এখন প্রভু আপনার রূপ দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছেন,—দেহের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। বারমুখী তখন এরূপ হইয়াছে যে, প্রভুর চরণে আসিয়া পড়ে আর কি,—কিন্তু ভয় করিতেছে। ভাবিতেছে, প্রভু তাহার উপর কৃপা কেন করিবেন? সে না নগরের অথবা জাতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম? বারমুখীর সেই ভ্রম প্রভুর ঘুচাইতে হইতেছে। ভ্রম এই যে,—সে অতি অধম সেই নিমিত্ত কৃপা পাইবার অনুপযুক্ত। এইরূপে প্রভু তাহার ভ্রম ঘুচাইলেন।

বালাজী বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ সেখানে ছিল, প্রভুর উপর তাহার ক্রোধ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন, তবে ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল ঐরূপ শত্রুতা। প্রভু যত উন্মত্ত হইতেছেন, তাঁহার প্রতি বালাজীর দ্বেষ তত বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল।

বলিতেছে—"তুই ভণ্ড, তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভণ্ডামি চলিবে না… ।" কেন যে ভণ্ডামি চলিবে না, তাহা আর বালাজী খুলিয়া বলিল না। বোধহয় মনের ভাব এই যে, আমি বালাজী যেখানে আছি সেখানে অন্যলোকে ভণ্ডামি করিয়া কি করে উহা জীর্ণ করিবে? শেষে প্রভুকে মারিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার উদ্যোগও করিল। অবশ্য বালাজী ভাবিতেছে যে, এ তাহার স্থান, আর সন্ন্যাসী বিদেশী, তাহার বলে সন্ন্যাসী পারিবে কেন? কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া বালাজী একটু ফাঁপরে পড়িল। কারণ সকলে হাহাকার করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল। ইহাতে প্রভুর বাহ্য হইল! কাজেই তিনি বালাজীর পক্ষ হইলেন। তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "ছি! এ সমস্ত প্রবৃত্তি কেন পোষণ করিতেছ? উহা পোষণ করিয়া তোমার লাভ কি? এসো তোমাকে পরম-ধন দিতেছি।" ইহাই বলিয়া প্রভু তাহাকে বাৎসল্যভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন বালাজী দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, গ্রহগ্রস্তের ন্যায় শুনিতে লাগিল। যেহেতু প্রভু তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কর্ণে হরিনাম দিলেন, অমনি বালাজী শক্তি পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল। বালাজীর উদ্ধার কার্য্য সমাধা হইল।– কেন না সে অহেতুক প্রভুকে প্রহার করিতে গিয়াছিল। বোধহয় প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই বালাজীর ঘাড়ে দুষ্ট-সরস্বতী আশ্রয় করেন। প্রভু বালাজীকে দেখাইলেন যে, ভগবানের দয়া মনুষ্যের দয়ার জাতীয় নয়—সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। বালাজীর উদ্ধার দেখিয়া বারমুখী আশ্বাসিত হইল। তখন আপনার গণকে এই কথা বলিল যে, আমি উদাসিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব, সেই নিমিত্ত যাইতেছি। তাহারা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, বারমুখীর সঙ্কল্প দৃঢ়। তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুখী

অগ্রবর্ত্তী হইলে, তাহার অধীনা-সহচরী মীরা ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বারমুখী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, তাই পতিতপাবন সন্ন্যাসীর স্মরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কিন্তু কেবল সৎকার্য্যে ব্যয় করিও। আমি অবশ্য কৃপা পাইব। বালাজী, ঠাকুরকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। আমার তাই দেখিয়া ভরসা হইয়াছে।"

বারমুখী আসিতেছে, এবং কি জন্য আসিতেছে, তাহাও তখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বারমুখীর আসিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল হইয়াছে। লোকে একেবারে বিস্ময় ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে। বারমুখী আসিতেছে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। প্রভু নয়ন মুদিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বারমুখী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর— "তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল। তখন সে উঠিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আপনার কেশ এলাইয়া দিল। সে কেশ তাহার গৌরবর্ণের নিকট কিরূপ দেখাইতেছিল, না—"বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘ রাশি রাশি।" তারপর সে করজোড়ে বলিতেছে, "প্রভু, আমি আর পাপ করিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও।" মীরাদাসী সঙ্গে একখানি কাঁচি ও বসন আনিয়াছিল, সেই কাঁচিখানা লইয়া বারমুখী আপনার দীর্ঘ-কেশ কচ্‌কচ্‌ করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন বসন পরিয়া জোড়হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ইহাতে দর্শকগণের কিরূপ মনের ভাব হইল বিচার করুন।

প্রভু বারমুখীকে চুপে চুপে কৃপা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কি করিলেন? না—সেই পরমাসুন্দরী ধনশালী বেশ্যাকে সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার কচচ্ছেদন (কেশচ্ছেদন)

করাইলেন ও কৌপীন পরাইলেন,—পরাইয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। উদ্দেশ্য যে, বারমুখীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহস্র সহস্র লোক পবিত্র হউক।

বারমুখীকে প্রভু আশ্বাস দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,—"তুমি তুলসী-কানন করিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" বারমুখী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত, আবার ভাল-লোক উহা দেখিয়া ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন তিনি চুল কাটিয়াছেন, ভুষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন-বসন পরিয়াছেন, ইহাতে কি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়,—বারমুখীর এক নূতন সৌন্দর্য্য হইল। পূর্ব্বের রূপে কেবল মন্দ-লোকে মুগ্ধ হইত, কিন্তু বারমুখীর এখন যে রূপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। বারমুখীর সৌন্দর্য্য ক্রমে এখন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু—এই যে বলিলাম,—সে আর একরূপ সৌন্দর্য্য, পূর্ব্বেকার সৌন্দর্য্য নয়।

বিবেচনা করুন, নারোজী প্রথম-শ্রেণীর ডাকাইত, বারমুখী প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা। প্রভুকে দর্শনমাত্র ইহাদের পুনর্জন্ম হইল। ইহাতে প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। সহচরী মীরাবাঈ অনেক কান্দিল। কিন্তু বারমুখী কিছু গ্রাহ্য করিল না; বরং মীরাকে উপদেশ দিল,—"ভাই, আপনার পথ দেখ, আর কুকর্ম্ম করিও না।"

সেখান হইতে প্রভু ছয় দিন হাঁটিয়া সোমনাথে গেলেন,—এই সোমনাথ মুসলমান কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া প্রভু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন, ইহার মধ্যে ঝড় উঠিল। প্রভু বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় দুই চারিজন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত, বলিল—"টাকা দাও।" প্রভু বলিলেন, "আমরা

সন্ন্যাসী, টাকা কোথা পাব ?” ইহাতে গোবিন্দচরণ দুটি মুদ্রা দিলেন। এই পাণ্ডার উৎপাতে আমাদের দেবস্থানগুলির দশা এইরূপ হইয়াছে। সেখান হইতে জুনাগড়ে গেলেন। দেখিলেন, ইহা একটি খুব বড় সহর। সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্ন আছে, তাহাই দেখিতে প্রভু পাহাড়ে উঠিলেন। পথে দেখেন দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী দুঃখ-মনে বসিয়া আছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের বৃদ্ধ-গুরু ভার্গদেব পীড়িত। প্রভু অমনি যাইতে নিরস্ত হইলেন, হইয়া ভার্গদেবকে রোগমুক্ত করিলেন। তাহাতে—

“রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি।
প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার চক্ষুরোগ হইয়াছে বোধহয়। কারণ আমি ত তোমাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছি। প্রভু ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গদেব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, “আমি তোমায় চিনেছি। কার কাছে ফাঁকি দেহ নবীন সন্ন্যাসী ?” প্রভু তাঁহাকে নয়ন-ভঙ্গিতে কি বলিলেন। যথা—

“কি কহিলা ভার্গদেবে প্রভু আঁখি ঠারি।
অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥”

পরে সকলে মিলিয়া গির্ণার পাহাড়ে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। সেখানে প্রভু অকথ্য প্রেম-তরঙ্গ উঠাইলেন। তখন রামানন্দ ও গোবিন্দ দুইজন প্রভুর চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভদ্রানদী-তীরে রজনী কাটাইলেন। সম্মুখে ধরিধরঝারি নামক বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে অদ্যাপি সিংহ পাওয়া যায়। এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল। কিন্তু তখন তাঁহারা ষোলজন। বোধহয় এই বন পার হইতে প্রভুর সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভার্গদেব পীড়িত হইয়া পড়েন। সুঁড়ি

পথ দিয়া যইতে হয়, দুই প্রহর হইলে সূর্য্য দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে কাষ্ঠের দুর্গ আছে, সেখানে যাত্রিগণ রজনীতে বাস করেন, আহার বৃক্ষের ফল। এত ফল যে—

সহস্র লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে ॥
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে ॥

তাহার একপ্রকার ফল কামরাঙ্গার মত।

চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥
টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দচরণ।
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন ॥"

গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু বলিলেন—

"উদর পুরিয়া ফল যত পারি খাই।"

মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জঙ্গলে প্রভু গান ধরিতেছেন :—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।"

যখন তখন প্রভু এই নামগান করেন, আর এই ষোলজন সঙ্গে তান ধরেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা প্রভাসতীর্থে আসিলেন। প্রভু অবশ্য যদুকুলের দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই,—

"কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়।
কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥"

পরিশেষে প্রভু দ্বারকায় গমন করিলেন। কৃষ্ণের দুই স্থান,—বৃন্দাবন ও দ্বারকা। বৃন্দাবনে প্রভু গমন করিয়া কি কি করিয়াছিলেন, তাহা

আপনারা জানেন। এখন দ্বারকায় সেই প্রকার লীলা আরম্ভ হইল। প্রভু সেখানে এক পক্ষকাল ছিলেন, দ্বারকানগর একেবারে উন্মত্ত হইল। যথা—

"ধর্ম্মের ভারেতে পুরী করে টলমল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্ম্মল॥
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্প গন্ধে সব বাড়ী যেন আমোদিল॥
যেইখানে মরুক্ষেত্র, কিছুমাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোঁসাই॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।

পাণ্ডাগণ প্রভুর আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিলেন, সকলের নিমন্ত্রণ, প্রভু নিজে এক ভার লইলেন, যথা—

"পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরামণি।
প্রসাদ বণ্টন প্রভু করেন আপনি॥"

দ্বারকা দেখা হইল। তাহার ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই। অমনি প্রভু বলিলেন,—চল নীলাচলে যাই। দ্বারকা ত্যাগ করিবার সময় বহুলোক প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, পুনরায় বরোদায় আসিলেন। আর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া, ষোল দিনে নর্ম্মদায় স্নান করিলেন, সেখানে প্রভু ভার্গদেবকে বিদায় দিয়া নর্ম্মদার ধারে ধারে চলিলেন। প্রভুর দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এখন আমরা অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

দেহদ বা ধীনগর হইয়া তাঁহারা কুক্ষী আসিলেন। এখানে অনেক বৈষ্ণবের বাস। এখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা আছে। প্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ অতি কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি দরিদ্র, আতিথ্য করিবার শক্তি আমার নাই।"

প্রভু বলিলেন, "তাহাতে ব্যস্ত কি, যিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্য দুগ্ধ চিনি আটা আনিয়া উপস্থিত করিল। সে বলিল, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর! তোমার লক্ষ্মী-নারায়ণ বড় জাগ্রত। কল্য নিশিতে তিনি নবরূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বড় পায়স খাইতে সাধ গিয়াছে, তাই আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আনিতে বলিয়াছেন। এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া পায়স রান্ধিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণকে দাও।" ব্রাহ্মণ ত কাঁদিয়া আকুল। তখন প্রভুকে বলিতেছেন,—"ঠাকুর এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" তখন বৈশ্য প্রভুর পানে চাহিয়া একেবারে বিভোর হইল, এবং একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"কি হে বণিক! তুমি কি দেখিতেছ?" তখন বণিক গদ্‌গদ্ হইয়া বলিলেন,—"কি আর দেখিব, যিনি নবরূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি ঠিক ইহার মত, তিনিই এই।" প্রভু ইহাতে বৈশ্যকে একটা ধমক দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,—"আচ্ছা লোক ত তুমি! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়াছি, ইহার মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিলে?" বৈশ্য ভয়ে আর কিছু বলিল না। প্রভু তখন দুগ্ধ দিয়া পায়স রান্ধিলেন, এবং সকলে প্রসাদ পাইলেন। প্রভু আপনি বৈশ্যকে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন। প্রাতে প্রভু যাইতেছেন, সেই সময় বৈশ্য আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িল। সে প্রভুকে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়াছিল। বলিতেছে, "তুমি সেই তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতান্ত যাবে ত আমাকে কৃপা করিয়া যাও।" প্রভু তখন ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, ও কর্ণে হরিনাম দিয়া বলিলেন,—"সব ত্যাগ করিয়া তুলসী-কানন কর, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" ইহার পরে সম্মুখে আবার জঙ্গল। দুইদিন হাঁটিয়া গভীর জঙ্গল

পার হইয়া সকলে আমঝোড়া নগরে পঁহুছিলেন। সেখানে যে লীলা করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ বলিতেছেন—

"ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছটফট করি।
নির্ব্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি॥"

পরে গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ষোলখানা রুটী করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়া হইল। সকলে সেবা করিতে বসিয়াছেন—

"হেনকালে এক নারী বালক লইয়া।
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া॥
শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়াময়।
আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায়॥"

দুঃখিনী খুসি হইয়া চলিয়া গেল। প্রভু এই স্থানে যে দয়া দেখাইলেন তাহা আমার ভাল লাগিল না। দুঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্তু যে সব নিজজন ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। তাহাদের আহারীয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কাজেই প্রভুকে আর দিতে পারিলেন না। রজনীতে প্রভু কিছু ফল আহার করিয়া রহিলেন।

পথে এক কুণ্ড পাইলেন। কথিত আছে, সীতা পিপাসাতুর হইলে লক্ষ্মণ বাণদ্বারা সেই কুণ্ড খনন করিয়া জল আহরণ করেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সকলে বিন্ধ্যগিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দুরা নগরে যাইয়া এক যোগীর কথা শুনিলেন। তিনি গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন, দেখিতে সুন্দর কাঞ্চনবর্ণ। ইনি প্রকৃত একজন যোগসিদ্ধ। তারপর—

"মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলা।
তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিলা॥

"যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন।
অমনি তপস্বীবর হাসিল তখন ॥"

তপস্বীর সঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হইল, তাহা গোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন না। সেখান হইতে সকলে মণ্ডলনগরে গেলেন ও তথা হইতে দেবঘর নগরে যাইয়া আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন। আদিনারায়ণ একজন ধনী বণিক, অথচ পরমবৈষ্ণব,—কিন্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, সর্ব্বদা অসুখী। প্রভু গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বসিলেন। সেখানে ভোগকার্য্য সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কাজেই লোককলরব হইল, সেই সঙ্গে আদিনারায়ণও আসিলেন। তিনি আসিয়া "নিস্তার কর প্রভু" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে তাঁহার ভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দিলেন।

"ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপভোগ।
তখনি তাঁহার দূর হৈল কুষ্ঠরোগ ॥"

তখন বহু রোগী আসিবে এই ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

তাহার পরে শিবানী (শিউনি) নগর, মালয় পর্ব্বত, চণ্ডীপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে প্রভু বিদ্যানগরে রামানন্দের বাড়ী আসিলেন। এতদিন পরে প্রভু নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "রামরায়, আমার সঙ্গে চল, দুইজনে কৃষ্ণকথার সুখে দিন কাটাইব।" রাম রায় একটি রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। তিনি যখন স্নান করিতে যান, তখন বাদ্য বাজাইয়া সঙ্গে সহস্র লোক যায়। তিনি ইহা ফেলিয়া কুটিরে বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতে কেন যাইবেন? কিন্তু রামরায় তাহা

ভাবিলেন না, প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন। শেষে বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করা অবধি এই রাজ্যশাসন আমার বিষের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আমা হইতে আর তাঁহার এ কাজ হইবে না, তিনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। তোমার নিকট থাকিব—এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা রাজা জানিতেন, তাই তিনি তদ্দণ্ডে ছুটি দিলেন। তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া আছেন। তুমি অগ্রে যাও। আমার সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত যাইবে, কাজেই তোমার আমার একত্র যাওয়া সুবিধা হইবে না।" তাই প্রভু রামানন্দকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে বিলাইতে যাইতে লাগিলেন। পুনরুক্তির ভয়ে সে সব কথা আর উল্লেখ করিলাম না। তবে এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেটা বলিতে হইতেছে। সেরূপ কয়েকটী লীলা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রভুর মারখেয়ে দয়া করা। কিন্তু এই মাড়ুয়া সম্বন্ধে যে লীলা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহা একটু বিবরিয়া বলিব। এই লীলা রসালকুণ্ডে হয়। সেখানে এই মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। আর মনেও খুব অভিমান আছে যে, সে স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহাকে ভয় করে না ইত্যাদি—অর্থাৎ সে একটি বর্ব্বর, মনুষ্যের হৃদয়ে যে সমুদয় কমনীয় ভাব আছে, তাহা তাহার কিছুই নাই, যাহা ছিল, সব উৎপাটন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে কোন কমনীয় ভাব নাই বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে।

এই ব্রাহ্মণের একটি প্রহ্লাদ জন্মিয়াছে। কাজেই সে প্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে বসিয়া আছে,—সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি নড়িতে পারিতেছে না। প্রভুও তাহার প্রতি স্নেহ নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শুনিল যে, সে প্রভুর

কাছে আছে। সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে আসিল, আসিয়া দেখিল যে প্রকৃতই তাহার পুত্র করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "তুই এখানে কি করিতেছিস?" বালক বলিল, "এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় দয়াময়।" বালকের মুখে প্রভুর স্তুতিবাণী শুনিয়া মাড়ুয়ার যে ক্রোধ পুত্রের প্রতি হইয়াছিল, তাহা সমুদয় প্রভুতে নিয়োজিত হইল। অবশ্য তাহার হাতে একখানা যষ্টি ছিল, আর উহা পুত্রের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করিবে বলিয়াই আনিয়াছিল। এখন উহা হস্তে করিয়া প্রভুকে মারিতে চলিল। আর মারিবার আগে প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। যাহারা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাইয়াই প্রহার করে, তাহারা লোক মন্দ নহে, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পাগল, নিজ কার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্তু যাহারা কুটিল, তাহারা অগ্রে গালি দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া লয়, ক্রোধ হইলে কুকর্ম্ম করিতে আর বাধা থাকে না। এই জন্য ব্রাহ্মণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল, কি গালি দিল, তাহা অনুভব করা যায়। অর্থাৎ বলিতেছে,—"তুই ভণ্ড জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুত্রকে নষ্ট করিলি। অদ্য তোকে প্রহার করিয়া তোর ভণ্ডামি ঘুচাইব॥"

ইহাতে বালকের মনে কি ভাব হইল তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহার পিতা পাষণ্ড, সে নিজে অতি স্নেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায় একেবারে আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছে। অবশ্য সে পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল হইবে না। কাজেই সে পিতাকে ছাড়িয়া প্রভুকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই—"প্রভু, উনি আমার পিতা, আমার নিমিত্ত পিতার অপরাধ না লইয়া উঁহাকে মাপ কর।" ইহাতে

প্রভুর উপর তাহার পিতার ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। যদি পুত্র তাহার সহিত জুটিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিত, তবে সে পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিত। কিন্তু পুত্র সন্ন্যাসীর দিকে যাইয়া প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহার পিতা পাষণ্ড, প্রভুর দয়ার উপযুক্ত পাত্র। সুতরাং পুত্রের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ আরও জ্বলিয়া উঠিল। ইহার পরে আর এক কাণ্ড হইল, যাহাতে ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণকে বেশ জানিত, কাজেই তাহারা প্রভুর দিকে হইল, এবং ব্রাহ্মণকে কটু বলিতে লাগিল। প্রভুও ব্যঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"মারিবে, কিন্তু তাহার মূল্য চাই।" যথা—

"যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে।
ততবার যষ্টিঘাত করিতে পারিবে॥"

প্রভুর এই ব্যঙ্গোক্তিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বালক, পিতার চরণ ধরিয়া বলিল,—"বাবা দেখিতেছেন না, উনি স্বয়ং জগন্নাথ!" তাহাতে সে পিতার পদাঘাত খাইল। তখন বালক প্রভুর চরণে পড়িল। এইরূপে একবার প্রভুকে, একবার পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিল। তখন প্রভু ব্রাহ্মণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, সে চাহনির তুলনা নাই। চাহিয়া বলিতেছেন,—"তোমার যে কঠিন মরুভূমির ন্যায় হৃদয়, তাহা কৃষ্ণের কৃপায় রসাল হউক।"

যেই মাত্র প্রভু এই বর দিলেন, অমনি ব্রাহ্মণ কাঁপিতে লাগিলেন। তখন—

"ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়।
কাঁদিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায়॥

প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।
দুই হাতে দুই পদ ধরে জড়াইয়া
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়।
কৃপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময়॥"

প্রভু যখন ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তখন তাহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তাহার কি কৃষ্ণপ্রেম হইল? না তাহার ভক্তির উদয় হইল? ইহার কিছুই তাহার হয় নাই, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগূঢ় অর্থ পরিগ্রহ করুন। সকল আধার একরূপ নয়, সকলের পীড়া একরূপ নয়, সকল পীড়ার ঔষধও একরূপ হইতে পারে না। তবে কিনা বিষস্যবিষমৌষধি। যাহা হইতে যাহার পীড়া উৎপত্তি, তাহাকে তাহাই দিয়া আরাম করিতে হইবে। সার্ব্বভৌমের পীড়ার কারণ বিদ্যা, তাহাকে বিদ্যাদ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে। চাঁদকাজির পীড়া লোকবল, তাহাকে লোকবল দিয়া সুস্থ করিতে হইবে। জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার ঔষধ—চক্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন কেবল ভয়, সে এত ভয় যে বস্ত্রখানি নষ্ট করিলেন, এবং এই ভয় হইতে পরিণামে তাহার ভক্তির উদয় হইল।

পুরীধামের নিকট আসিয়া প্রভু আঁগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তখন নিতাই, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া আলালনাথে প্রভুর দেখা পাইলেন।*

* "গোবিন্দের কড়চা" বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ ও শেষ কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত। প্রভুর সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পুর্ব্বে এই মুদ্রিত কড়চা গ্রন্থে যাহা আছে তাহা অলীক। আবার, আলালনাথে আসিয়া প্রভুর যে বহু ভক্তের সহিত

চতুর্থ অধ্যায়

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু বিচার করিব। জীবকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যে এই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রভু একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাহা ভুলেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা ছিল যে, যতদূর সম্ভব এই ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে এই ধর্ম্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার এক কাবণ, তখন ভারতবর্ষের দক্ষিণেই বিশুদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, অন্যান্য অংশের ন্যায় দক্ষিণে মুসলমান-আধিপত্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। আর এক কারণ দক্ষিণ-অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম এক প্রকার ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তর-ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ-অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল। শঙ্করাচার্যের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেখানে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। উদাসীন. সাধু, সন্ন্যাসিগণ ঐরূপে মুসলমান উৎপাতে

মিলন হইল, সেখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কড়চায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সমস্তই অলীক। গ্রন্থখানি প্রামাণিক করিবার নিমিত্ত—গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে যে, "আমি ও কালা কৃষ্ণদাস চলিলাম।" অথচ হস্তলিখিত কড়চায় কালা কৃষ্ণদাসের নামগন্ধও নাই। যে কড়চা গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহাতে রামানন্দ রায়ের মিলন হইতে আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্য্যন্ত প্রামাণিক। অবশিষ্ট সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া পরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েন। তাহার পর তিনি তাঁহার দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যতদুর সম্ভব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। "গোবিন্দ দাসের করচা রহস্য পুস্তক পড়িয়া দেখিবেন।

দেশে স্থান না পাইয়া কতক হিমালয়ের গহ্বরে, আর অবশিষ্ট দক্ষিণদেশে পলায়ন করিলেন। অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির নিমিত্ত, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তবু বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। আপনারা দেখিবেন যে, দক্ষিণে প্রভু সন্ন্যাসী ও যোগীদিগকে যেন তল্লাস করিয়া কৃপা করেন।

দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে বেশীই শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী, বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তবে সেখানে অনেক রামায়ত অর্থাৎ রামোপাসক বাস করিতেন। অবশ্য ইঁহাদিগকেও একশ্রেণীর বৈষ্ণব বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহারা নহেন। তবে রামানুজ দক্ষিণে ধর্ম্মের জয়পাতাকা লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও প্রচলিত শাক্তধর্ম্ম—প্রায় এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপাস্য দেবতা শিব ও দুর্গা, আর রামানুজের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ,—কিন্তু সে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-বিবর্জ্জিত দ্বিভুজ-মুরলীধর নহেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। সুতরাং দক্ষিণে প্রকৃত-বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল।

প্রভুর দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ, রামানন্দ রায়কে সংগ্রহ করা। প্রভু যে ব্রজের নিগূঢ়রস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে অধিকারী জানিয়া, তাঁহার হৃদয়ে সেই রসের বীজ বপন করিলেন। এই নিগূঢ়-রস কি, যদি প্রভু শক্তি দেন তবে পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। যাঁহারা লীলার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর নিকট আপনি আসিলেন, কাহাকে আনিতে প্রভুর তাঁহার কাছে যাইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, ইনি তপনমিশ্রের তনয়। প্রভু তপনমিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়া এই রঘুনাথের সৃষ্টি করেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে ডাকাইয়া আনিলেন। পরে

একবার, কেশে ধরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি আসিলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভুর আকর্ষণে আপনি আসিয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী হইতে প্রভুর ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। উপরে যাঁহাদের নাম করিলাম, ইঁহারা সকলেই লীলার সহায়। অদ্বৈত বৈষ্ণবধর্ম্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, আর হরিদাস নাম-সংকীর্ত্তনের প্রতিনিধি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তাঁহাদের পীঠস্থান বৃন্দাবন। কিন্তু বৃন্দাবন কোথায়? বৃন্দাবন তখন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করিতে হইবে, সেই বৃন্দাবন গঠন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে হইবে, আর বড় বড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর এক কপর্দ্দকও নাই। কাহার সাধ্য এই বৃন্দাবন সৃষ্টি করে? তাই উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন।

আবার কোন নূতন-ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি লিখিত শাস্ত্র চাই। কারণ ধর্ম্মের উপদেশগুলি মুখে-মুখে থাকিলে সত্বর কলঙ্কিত হয়। কিন্তু এই শাস্ত্র গ্রন্থিত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। প্রভু এই সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কোন বড় সম্রাট, কি অতি বড় কোন পণ্ডিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার কৌপীনধারী প্রভু, ধন-জন-সহায়শূন্য একক সমুদয় করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কার্য্য যাঁহাদিগের দ্বারা করাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলে। এইরূপ ছয় গোস্বামী বৃন্দাবনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, সেখানে এই ছয় গোস্বামী সেনাপতিরূপে রহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু দেখিলেন যে, গৌড়ীয় পাতসাহের পরমপণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্ত্রিদ্বয়, রূপ ও সনাতনই কেবল এই সমুদয় বৃহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহারা গৌড়ে, আর প্রভু নীলাচলে।

প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তাঁহারা এই গোস্বামীগণের, বিশেষতঃ রূপ-সনাতনের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন।

দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ গোপালভট্টকে শক্তিসঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে আনয়ন করা। ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। প্রভু বারাণসীতে যাইয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে আহরণ করেন। সরস্বতী ঠাকুরের অমূল্য "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগ্য। মহাপ্রভু যে কি তত্ত্ব, তাহার অতি প্রধান সাক্ষী প্রবোধানন্দ। ইহার সাক্ষ্য অমান্য করিবার একেবারে যো নাই। যখন বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের যশ ভারত ব্যাপিল, তখন রূপ-সনাতন ও জীব নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকে দীক্ষা দেওয়ার ভার গোপালভট্ট গোস্বামীর উপর ন্যস্ত হয়।

প্রভু দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে ফলবান বিষবৃক্ষ পাইলেই তাহা ছেদন করেন। আবার স্থানে স্থানে অমৃতবৃক্ষ রোপণও করিয়াছেন। এইরূপে বেশ্যা, দস্যু ও মায়াবাদী প্রভৃতি বহুবিধ বিষবৃক্ষ নষ্ট করিলেন, আর তুকারামের ন্যায় ফলবান অমৃতবৃক্ষ রোপন করিলেন। প্রভু উন্মাদের মত যাইতেছেন বটে, কিন্তু কাজের কোন ভুল হইতেছে না। সমুদ্রধার দিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অভ্যন্তরেও যাইতেছেন। কেন যাইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে—অর্থাৎ আচার্য্য সৃষ্টি করিবার জন্য।

কোন মহাপুরুষ কি অবতার যদি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহা বৃদ্ধি পায়। পরে মনুষ্যের দুর্ম্মতিতে আবার উহার শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের এইরূপ গ্লানি

হইলে, শ্রীভগবান্ সেখানে অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই ভক্তিধর্ম্ম স্থাপন করেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য। তাই প্রভু যখন ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তখন এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সমুদয় ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। এই বাঙ্গলায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময়, শাক্তধর্ম্ম প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্য আবার ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহার ফলে এখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছায়ামাত্র আছে।

সেইরূপ প্রভু যদিও সমুদয় দক্ষিণদেশে নব জাগরণ আনিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে আবার ধর্ম্মের নির্জ্জীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তবু দক্ষিণে প্রায় সমুদয় স্থানে, বৈষ্ণবধর্ম্মের আর এক আকার হইয়াছে। তুকারামের শিক্ষা-গুলি ঠিক আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মত। আমি বোম্বাই সহরে আমাদের গৌড়ীয় কীর্ত্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী বম্বে পরিভ্রমণকালীন সমুদ্র-তীরে শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে একটি বৈষ্ণবের মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবধূতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিলেন যে, খ্যাতনামা গৌরভক্ত পরমপণ্ডিত বিশ্বনাথ তাঁহার শেষজীবন শ্রীবর্দ্ধনে যাপন করেন। তবে হয়ত স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, তাঁহার শিষ্য দ্বারা ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রাচ, মহাপ্রভুর একজন গৌড়ীয় ভৃত্য কর্ত্তৃক ঐ মঠ যে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রামযাদব বাগচি ইলোরা নগরে যাইয়া রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি অগ্রে দক্ষিণে বৈষ্ণবগণ দ্বিভুজ মুরলীধর, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ভজনা করিতেন না। তাঁহাদের সেবার বস্তু ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দ্দন,—অর্থাৎ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ আর লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মূর্ত্তিও দক্ষিণে ক্ষিত হইত,—যেমন বিট্‌ঠলদেব। দক্ষিণে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান সমুদ্ম ীবঙ্গপত্তন। সেখানে ভজনীয় বস্তু—লক্ষ্মী-জনার্দ্দন। তবে

দক্ষিণে যে একেবারে রাধাকৃষ্ণ ভজন ছিল না, তাহা বলা যায় না। থাকিলেও সে অতি বিরল। মহাপ্রভু যাইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচলিত করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিবেন তাহার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তির কারণ যে মহাপ্রভু, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামযাদববাবু শুনিলেন যে, সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখে প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন।

আপনারা অগ্রে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু ত্রিপতিনগরে গমন করেন। ইহা আরকট জেলায়, মাদ্রাজ হইতে বহুদূরে নয়। সেখানে সাহিত্যসেবী শ্রীমান গোপাল শাস্ত্রী অল্পদিন হইল গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া একটী তৈলঙ্গিপদ শুনিলেন।

যথা—

"চেয়ে দেখ ডুলু গোসাঞি বীর।
আর কোথায় কে দেখেছ এমন খোলা শির ?

অর্থাৎ ভারতবর্ষের অপর সমস্ত স্থানে লোক মাথায় আবরণ দিয়া থাকে, "নাঙ্গাশির" কেবল বাঙ্গলায়। ঐ সকল স্থানের লোকের বিশ্বাস যে, যদি কোন স্ত্রীলোক নাঙ্গাশির দেখেন তবে সেদিন তাহার উপবাস থাকিতে হয়। ডুলু গোসাঞি বাঙ্গালী, কাজেই তাঁহার মাথায় কোন আবরণ ছিল না। তাহা হইতেই ঐ তৈলঙ্গি কবিতাটি হইয়াছে। সে যাহা হউক, ডুলু গোসাঞি কে ? তিনি যে বাঙ্গালী, তাহা জানা

পুণা নগরে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে আর আমি একখানা অনাবৃত গাড়ীতে অর্থাৎ ফেটিনে বেড়াইতেছিলাম। আমার মাথা খোলা। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ কূপে জল তুলিতেছিলেন। এমন সময় রাণাডে আমাকে বলিলেন, "রুমাল দিয়া তোমার মাথা ঢাকো। ঐ দেখ, ঐ সব স্ত্রীলোকে তোমাকে গালি দিতেছেন, যেহেতু অদ্য তাঁহাদের উপবাসী থাকিতে হইবে।" কাজেই আমার তাহাই করিতে হইল।

গেল, তবে তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তিনি ঐ ত্রিপতিতে অবশ্য খ্যাতিপন্ন ছিলেন, তাহা না হইলে গ্রাম্যকবি তাঁহাকে এক কটিবিতার নায়ক করিবে কেন? শ্রীল গোপাল শাস্ত্রী অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তিনি একজন বৈষ্ণব-মোহান্ত, সেখানে ছিলেন এবং তাঁহার সমাধিও সেখানে পর্ব্বতের উপরে আছে। এই কথা শুনিয়া গোপালবাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ গোকর্ণগিরির উপর উঠিলেন। দেখেন যে, পর্ব্বত নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ। পর্ব্বতে বহুতর গুহা আছে, তাহার মধ্যে সাধু বাস করিয়া ভজন করিতেন, হয়ত এখনও করেন। তাঁহারা একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অভ্যন্তরে মন্দির, মনোহর কূপ, পুষ্পোদ্যান ও বাসের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটির। এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি বৈষ্ণবগণের একটি মহাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পরে জানিতে পারেন ঢুলু গোসাঞির নাম দুর্ল্লভচন্দ্র সেন, পরে ভেক লইয়া ঢুলু গোসাঞি হন। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি সেখানে পূজিত হইতেছে। দুর্ল্লভ গোসাঞির আশ্রমে মহাপ্রভু পূজিত হইতেন, গোসাঞির অন্তর্দ্ধানের পর সেই বিগ্রহ কম্বোকাননের একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছেন ও সেই শ্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে পূজিত হইতেছেন। কম্বোকানন কুম্ভকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দুর্ল্লভ গোস্বামীর পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও সেখানকার বৈষ্ণবগণের মধ্যে রক্ষিত আছে।

মনে করুন, এই ত্রিপতিনগরে, প্রভু সেখানে যাইবার পূর্ব্বে একটিও বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন কেবল রামায়তগণ। তাঁহারা শ্রীরামের উপাসক। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মথুর স্বামী। তিনি প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া, পরে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

প্রভুর ধর্ম্ম কিরূপে উত্তর-পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতে গুঞ্জমালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকদিগের নাম করিয়াছি। এইরূপে সুরাট, গুজরাট, মালাবার, লাহোর ও সিন্ধুদেশে, প্রভুর ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস ধর্ম্ম-প্রচারার্থ দেরাগাজিখায় গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া দেখিলেন সেখানে একটি মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছেন। আর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ৫০।৬০ জন বৈষ্ণবও সেখানে আছেন।

মহাপ্রভুর লীলাকথা এখনও বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ পাইবে ততই তাঁহার নূতন নূতন কীর্ত্তি জানা যাইবে। প্রভুর লীলা যখন তেলুগু, তৈলাঙ্গ, ও মহারাঠি ভাষায় প্রকাশ হইবে, তখন উহা সর্ব্বসাধারনে জানিবেন। আমার বিশ্বাস যে অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রভুর অসংখ্য কীর্ত্তি পাওয়া যাইবে এবং এই সমুদয় ক্রমে প্রকাশ হইবে, তবে আমাদ্বারা অবশ্য হইবে না। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এ কথা কোন গ্রন্থে পাই নাই তবে একটি পদে পাইয়াছি, যথা—

"জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী॥"

তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর যে বৃন্দাবনে গোস্বামী দর্শন করিতে আইসেন আর তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাহা তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রভু দক্ষিণে আর এক মহৎ কার্য্য করেন। সেখানে বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। যদিও ব্রহ্মসংহিতা অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রন্থ লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু কর্ণামৃত লিখে কাহার সাধ্য? কেবল তাঁহারি সাধ্য যিনি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপাপাত্র! তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত কৃপা কেন হইল? কারণ তাঁহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই বেলের কাঁটা দিয়া সে দুটী নয়ন ধ্বংস করেন। কাজেই কৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইলেন। প্রভুর প্রকাশের পূর্ব্বে মাধুর্য্য ভজন যাহা কিছু ছিল, তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, রামরায়, বিল্বমঙ্গল জগতে দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভু ২৪ বৎসব বয়সে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই হইতে তাঁহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ। তবু ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে নাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রকৃত কার্য্য কি বলিতেছি। তাঁহার এক কার্য্য অন্তরঙ্গের সহিত, ও আর এক কার্য্য বহিরঙ্গের সহিত। অন্তরঙ্গের সহিত তাঁহার যে কার্য্য সে কথা পরে বলিব। বহিরঙ্গের সঙ্গে তাঁহার কার্য্য—শ্রীভগবানের প্রকৃতি ও ভজন কিরূপ, তাহা শিক্ষা

দেওয়া। যে অবধি মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অবধি জীব শ্রীভগবানকে একটী অসুর সাজাইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে গিয়া কেবল তাঁহার গ্লানি করিয়াছে। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ ও তাঁহার ভজন কিরূপ।

ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যও অন্যান্য মহাপুরুষেরা পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচারপদ্ধতি ও প্রভুর প্রচারপদ্ধতি একরূপ নহে। যীশুখৃষ্ট চারি বৎসর পরিশ্রম করিয়া মূর্খ লোকের মধ্যে মোটে দ্বাদশটি শিষ্য পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন তাঁহার সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। মহাম্মদ মদিনা সহর হইতে অনুগত লোক সংগ্রহ করিয়া মক্কা জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরের সমুদয় লোককে তাঁহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে, তাঁহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক মুহূর্ত্তে নগর সমেত লোক তাঁহার অনুগত হইল। কিন্তু প্রভুর প্রচারপদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, তাঁহার অনুমোদিত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি জীবকে বক্তৃতা কি তর্ক করিয়া বুঝাইলেন না,—বুঝাইলেন আপনি আচরিয়া। সহস্র লোকের মধ্যে আপনি কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হইয়া দেখাইলেন যে কৃষ্ণপ্রেম কি। আর তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রায় সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল। তিনি মাত্র ৪।৫ বৎসর প্রচার করিয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোককে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। এইরূপে নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক সার্ব্বভৌম, সন্ন্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রধান শ্রীঅদ্বৈত, স্বাধীন ভূপতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্রাট প্রতাপচন্দ্র, গৌড়ের বাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আনিয়া প্রচারের সুবিধা করিলেন।

অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রচার তাঁহাদের শিষ্যদিগের দ্বারা হইয়াছিল। যীশু যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মাত্র একাদশটী শিষ্য ছিল। প্রভু কিন্তু স্বয়ং যত প্রচারকার্য্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। এই শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান-নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভুর ধর্ম্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইলে একটী শাস্ত্রের প্রয়োজন। খৃষ্টিয়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি ২।৪ খানি খৃষ্টের লীলাগ্রন্থ যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্ম অতি অল্প দিনের মধ্যে লোপ পাইত। মুসলমানদের কোরান না থাকিলে তাঁহাদের ধর্ম্মেরও সেই অবস্থা হইত। প্রভু সেই নিমিত্ত বৈষ্ণবদের একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন।

প্রভু রূপকে প্রয়াগে দশ দিন ও সনাতনকে কাশীতে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। প্রভু আমাদের সমুদয় শাস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, নূতন একটি করিতে পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার গ্রন্থন করার পদ্ধতি প্রভুর অনুমোদনীয় নহে। তিনি সমুদয় শাস্ত্র রাখিলেন। এমন কি, তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতা ও জ্ঞানবাদীদিগের তত্ত্বকথাও রাখিলেন। সে সমুদয় রাখিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করা প্রভুর মনের ইচ্ছা। মনে ভাবুন এ অতি অসম্ভব ব্যাপার। শিব থাকিবেন, কালী দুর্গা থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস রাখিবেন। এই সমুদয় দেবদেবীর উপাসনা, আর ব্রজের নিগূঢ় রসের সামঞ্জস্য করা ত বহু-দূরের কথা, বিচার করিলে দেখা যায় ইহারা পরস্পরের ধ্বংসকারী। রস-বিচারের সময় পাঠক দেখিবেন, কালীপূজা ও রাধাকৃষ্ণ-ভজন পরস্পর ঘোরবিরোধী। দ্বৈতবাদে ও অদ্বৈতবাদে সেইরূপ অহীনকুলতা সম্বন্ধ, কিন্তু প্রভু এইরূপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

আবার বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান সম্মানের বস্তু। এই বেদ কি বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষকতা করে? যদি না করে তবে হিন্দুরা এই ধর্ম্ম লইবেন না; আর যদি পোষকতা করে, তবে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়তম হইবে। অতএব এই অসম্ভব কার্য্য,—বেদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষকতা করা—তাহাও প্রভু করিলেন। দ্বিতীয় কার্য্য ন্যায়শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করা। বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে যে, শ্রীভগবান আছেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, আর তাঁহার ভজন করিতে হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অংশ বর্জ্জন না করিলে উহা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে শেষ তত্ত্বটী কেবল বৈষ্ণবগণ মান্য করেন, আর কেহ করেন না। আর এক কাজ রসবিস্তার। বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রধান ভজন ব্রজের রস লইয়া। সে রস কি, তাহার একটী নূতন শাস্ত্র রচনা করা আবশ্যক। এই রস পূর্ব্বে জগতে ভজনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। চতুর্থ বৈষ্ণবদিগের স্মৃতি করা। ইহারা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবে, কাজেই নিয়মের আবশ্যক। আবার, নিয়মগুলি এরূপ হওয়া চাই যাহা বৈষ্ণব মাত্রই মান্য করিতে বাধ্য হইবে। এই সমস্ত শাস্ত্র কিরূপ ভাবে লিখিত হইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ জানিতেন না। প্রভুরই এই সমুদয় অমানুষিক কার্য্য করিতে হইবে। আর তিনি ইহা কি ভাবে করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি ও বৈষ্ণবশাস্ত্র সৃষ্টি, এ উভয় কার্য্যই তিনি প্রধানতঃ রূপ ও সনাতন দ্বারা সমাধা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন প্রয়োগে, রূপ ও অনুপমের সহিত প্রভুর দেখা হইল। অমনি প্রভু সেখানে রহিয়া গেলেন—কেন না, রূপকে শিক্ষা দিবার জন্য। দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন; বলিলেন, “যাও, যাইয়া কার্য্য উদ্ধার কর।” প্রভু তথা হইতে কাশীতে গমন করিলেন। সেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ

হইল, এবং তাঁহাকে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। সুতরাং যদিও প্রভু প্রেমে উন্মত্ত, তবু জীবের মঙ্গলকামনা সর্ব্বদা মনে জাগরুক রাখিতেন; প্রভু জননী, স্ত্রী ও বন্ধুগণ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ছিলেন, সেখানে অনেকের সহিত প্রীতি হইয়াছিল। এখন আবার তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া কাশী ও প্রয়াগে যাইয়া নির্জ্জন কুটিরে বসিয়া সনাতন ও রূপকে আড়াই মাস যাবৎ তত্ত্বকথা শিক্ষা দিলেন। ইঁহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। অর্থাৎ যে সমুদয় লোক তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। তাই, সে সমুদয় শাস্ত্র কি এবং তাহাতে কি কি থাকিবে তাহা শিখাইলেন। এই সমুদয় শাস্ত্র পরিশেষে গোস্বামীরা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারা কি লিখিবেন কিছুই জানিতেন না। সে সমুদয় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া—যথা চরিতামৃতে—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লৈয়া॥
নীচ জাতি নীচসেবী মুঞি ত পামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলা এই ব্রহ্মার অগোচর॥
তুমি যে কহিলা এই সিদ্ধান্তামৃত সিন্ধু।
মোর মন ছুতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
'মুই যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তির মত যে বেদসম্মত, ইহা না দেখাইলে হিন্দুগণ উহা লইবে না। কিন্তু জগতে সকলেই জানিত যে বেদ প্রেম-ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী। তাই সার্ব্বভৌম, প্রভুকে তাঁহার নাচন গায়ন ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভু প্রথমে সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্মের বিরোধী নয়, বরং পক্ষপাতী। তাই সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি স্বয়ং বেদ!" ঠিক এই লীলা কাশীতে হয়। তখনকার সন্ন্যাসীর স্থান কাশী, আর কাশীর প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভু বেদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাঁহাকে বুঝাইলেন অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর ভাবকালিকে দুষিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপা পাইলে তাঁহার মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে দেখা যাইবে।

এই প্রথম প্রভু দেখাইলেন যে, বেদ তাঁহার ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার সে কাহিনী অতি অদ্ভুত! তাঁহার পরে প্রভু—শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ, ভজন সাধন কিরূপ, প্রেম-ভক্তি কিরূপ ইত্যাদি সমুদয় বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিলেন, আর শিক্ষা দিলেন যে, প্রেমভক্তি-রস দিয়া যে ভজন করিতে হইবে, সে সমুদয় রস কি।

তাহার পরে কিরূপে বৈষ্ণব-স্মৃতি করিতে হইবে, তাহাও শিখাইলেন। যেমন রঘুনন্দনের স্মৃতি শাক্তদের নিমিত্ত, সেইরূপ বৈষ্ণবদের স্মৃতি 'হরি-ভক্তি বিলাস'। গোস্বামী গোপাল ভট্ট, গোস্বামী সনাতনের নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রকাশ করেন। এইরূপে বৈষ্ণব শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই সমুদয় বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকখানির নাম ক্রমে করিতেছি। প্রভুর

লীলালেখক শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মোটামুটি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে। যখন প্রভু প্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, বৃন্দাবনে কিছু নাই, কেবল আছেন—যমুনা ও গোবর্দ্ধন। তাহার পরে প্রভু গেলেন। যাইয়া শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলেন। তাহার পরে রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও সেখানে প্রেরণ করিলেন। ইহারা কেহই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন, "বৃন্দাবনে সত্বর যাইয়া আমার কার্য্য উদ্ধার কর।" অতএব সেই করঙ্গ, কৌপীন এবং কাঁথাধারী দুই চারি মূর্ত্তি বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিত হইলেন,—ইহারা সকলেই প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান।

তপন মিশ্রের আলয়ে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টকে প্রভু বলিলেন, "পিতামাতার সেবা কর; তাঁহাদের অন্তর্ধানে আমার এখানে আসিও, আর বিবাহ করিও না।" রঘুনাথ ভট্ট তাহাই করিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া বলিলেন,—"এখন বৃন্দাবনে যাও।" রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলেন, যাইতে চাহিলেন না। কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহার যাইতেই হইল। রঘুনাথকে যে আজ্ঞা করেন, শ্রীরঙ্গপত্তনে বালক গোপালকেও ঠিক তাহাই করিলেন। পিতামাতা গোলোকগত হইলে, গোপাল আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পারিলেন না, একেবারে বৃন্দাবনে গেলেন। জীব এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বশেষে বন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভার, প্রধানতঃ ও প্রবোধানন্দের উপর ন্যস্ত হইল। প্রবোধানন্দের তত নাম

নাই, কারণ রূপ-সনাতনের সহিত তাঁহার মতের একটু পার্থক্য ছিল। সে আর কিছু নয়,—রূপ-সনাতনের কার্য্য রাধাকৃষ্ণের ভজন প্রচলন করা, আর প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ,—শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীনবদ্বীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া, প্রভু তাঁহাকে শঙ্করীয় মায়াবাদীগণ হইতে ভক্তিধর্ম্ম রক্ষা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনে রাখেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপের শিষ্য। তিনি রূপ-সনাতনের ছোট ভাই অনুপমের পুত্র। অনুপম অদর্শন হইলে, রূপ-সনাতন উদাসীন হইলেন। রূপ বাড়ী আসিয়া অতুল সম্পত্তি নানা ভাল ভাল কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, তাঁহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন। তখন নিঃসম্বল হইয়া তিনি একেবারে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

শ্রীজীব কিছুকাল রাজত্ব কবিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিল না। শেষে তিনি শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া নিতাইর স্মরণ লইলেন। বলিলেন, "আমি সংসারে থাকিতে পারিতেছি না, অথচ পিতৃব্যের ইচ্ছায় আমি রাজত্ব করি।" নিতাই বলিলেন, "প্রভু শ্রীবৃন্দাবন তোমাদের গোষ্ঠীকে দিয়াছেন। তোমার পিতৃব্যদ্বয় বৃদ্ধ হইলে তখন বৃন্দাবন কে রক্ষা করিবে? তুমি বৃন্দাবন যাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই পিতৃব্যদ্বয় তাঁহাকে রাখিলেন।

শেষে রঘুনাথ দাস আসেন। প্রভু ইহাকে গোস্বামী পদ দিয়া কাছে রাখিয়াছিলেন। প্রভুর অন্তর্ধানের পর তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানে রহিলেন,—এই হইলেন ছয় গোস্বামী।

নূতন যে বৈষ্ণব-সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে একজন ব্যাস

বলা যায়। বৈষ্ণব-স্মৃতি যেরূপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, রঘুনন্দনের স্মৃতি সেরূপ নয়।

ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জীব গোস্বামী যেরূপ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ জগতে নাই। ইহা অনুবাদ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিবেন যে, ঐ গোস্বামীগণ আধ্যাত্মিক জগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টি, এক প্রকার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভুর শেষ লীলা

হৃদয়েরি রাজা প্রাণায়াম! অনাথিনী করি,
কোথা গেলে প্রাণনাথ।
তোমা বিনা ভুবন আন্ধার। ধ্রু
কবে তোমা পাব চাঁদ, আমার চাঁদ চাঁদ।
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাঁদ॥
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্ণে প্রবেশিল।
সেই হতে মতি গতি সব ফিরে গেল॥
অলক্ষিতে তুমি আমার হিয়ায় প্রবেশিলে।
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে॥
বড় বড় কত লোক ছিল এ জগতে।
তাহা সব ছাড়ি কৃপা করিলে আমাতে॥
তুমি জান তোমার মন আমি কিবা জানি।
আমারে মেরো না প্রাণে শুন গুণমণি॥

তুমি ছাড়া মোর আর কেবা কোথা আছে।
তুমি তেয়াগিলে বল যাই কার কাছে॥
আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ।
দরশন দিয়ে আমার ঘুচাও মনের ধন্দ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও কোথা মোর যাদু।
মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু॥
অনন্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে।
অতি ক্ষুদ্র বলরামে মনেতে কি আছে?
আমি চাতকিনী তুমি নবজলধর।
তুমি পূর্ণচন্দ্র আমি চকোর কাতর॥
আগে আসি বস প্রভু মুখখানি দেখি।
এ দীন বলাই দুঃখী কর নাথ সুখি॥

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদীয়া হইতে দুই শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাটিয়া যাইতে অন্ততঃ তিন চারি সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পর্য্যন্ত থাকিবেন। অতএব ৪।৫ মাসের সম্বল লইয়া, আর ৪।৫ মাসের সম্বল বাড়ীতে রাখিয়া, ভক্তগণ নীলাচলে চলিলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে ছিলেন, তখন নদীয়ার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বাসুঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

গোরা বিনা প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥
গোরা বিনা শূন্য ভেল নদীয়া নগরী। ইত্যাদি।

এই দুই বৎসর নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ

রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে সম্ভবে না।

তাঁহারা প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভু তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। তিনি নীলাচলে থাকিবেন, কেন না উহা হিন্দুর রাজ্য। কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি পাষণ্ড হয়েন, তবে সেখানে কিরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন? অতএব অগ্রে তাঁহাকে ভক্তিধর্ম্ম অর্পণ করা প্রয়োজন। তুমি আমি হইলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিতাম। প্রতাপরুদ্র বস্তুটী কি একবার দেখুন। তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারী সম্রাট। তাঁহার রাজ্য এক সময় ত্রিবেণী হইতে গোদাবরীর ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন, সে রাজ্য কত বড়। এইরূপ রাজাকে করায়ত্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কার্য্য পণ্ড হইবে।

প্রভু রাজাকে কিরূপে চরণানুগত করিলেন তাহা আপনারা জানেন। রথাগ্রে প্রভু মূর্চ্ছা গিয়াছেন। রথ আসিতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিবে সকলের এরূপ ভয় হইল। রাজা সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই তিনি প্রভুকে ধরিলেন,—অভিপ্রায়, স্থানান্তরিত করিবেন। কিন্তু রাজার স্পর্শ মাত্র প্রভুর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সম্মুখে প্রভু তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন; বলিলেন,—"ছি! বিষয়ী লোকে আমায় স্পর্শ করিল?" রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু লক্ষ লোকের সম্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অস্পৃশ্য, হাড়ি, না চামার? তা নয়,—তিনি ক্ষত্রিয়, জগন্নাথের সেবক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্য্যে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাকে এইরূপ অহেতুক অপমান! তাহাও নয়, তিনি প্রভুকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে অপমান!

প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভু এইরূপ ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুরের ও বরোদার রাজার সহিত বিনা আপত্তিতে ইষ্টগোষ্ঠি করিলেন। আবার তাঁহার প্রধান কার্য্য পতিত ও অস্পৃশ্য পামরকে আলিঙ্গন দান করা। অতএব প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল ? কিন্তু প্রভুর নিগূঢ় অভিপ্রায় কি, শ্রবণ করুন। তিনি যথেচ্ছাচারী সম্রাটকে চরণতলে আনিবেন, তাই তাঁহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা, তবু পাষণ্ড, অতএব অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ রাজা অপমানিত হইয়া প্রভুর কৃপা আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ করিলেন।

তাহার পরে প্রভু উদ্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রামরায়ের পরামর্শ অনুসারে রাজা তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা করিতে করিতে রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া উঠিয়া ইহাই বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—'কে গা তুমি আমাকে সুধা পিয়াইলে ?" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। সেই আলিঙ্গনের দ্বারা প্রভু রাজার শরীরে প্রবেশ করিলেন, আর তখন প্রতাপরুদ্র চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। সেখানে ভক্তগণ বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সকলকে প্রণাম করিতে করিতে চলিলেন। এইরূপে প্রভুর সহিত রাজার গোপনে মিলন হইল।

তাঁহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন কটক—অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী—হইয়া আইলেন। সেই সময় প্রকাশ্যে প্রভুতে ও রাজাতে মিলন হইল। প্রভু বকুলতলায় বসিয়া। রামরায় প্রভুকে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন। রসিক রামরায় রাজাকে এবার সাজাইয়া আনিলেন। রাজা আসিতেছেন কিরূপে,—না রাজবেশে, রাজসজ্জায়। রাজা হস্তীর উপরে, মন্ত্রিগণ হস্তীর উপরে,

সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও রণবাদ্যের সহিত প্রতাপরুদ্র আইলেন।

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা যোড়-করে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু পসারিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দিবেন এই ভাব করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না,—রাজা দীঘল হইয়া প্রভুর শীতল চরণে মস্তক রাখিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, আর সেই মণিমুক্তাখচিত মুকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল।

রামরায় রসিক লোক। তিনি এইরূপ মিলনে দেখাইলেন যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন; আর যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি প্রতাপরুদ্র রাজার রাজা।

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, আর পথের ভয় রহিল না। ভক্তগণ পুরীধামে আসিয়া দেখিলেন যে, রাজা, প্রজা ও মন্দিরের সেবক অর্থাৎ সমগ্র পুরীবাসী প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছেন।

প্রভু নিত্যানন্দকে দ্বাদশজন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

প্রভু স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করিলেন, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান যে সকল লুপ্ততীর্থ তাহা তিনি উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন সময় প্রবোধানন্দ ও রূপ-সনাতনকে শক্তিসঞ্চার করিয়া উজাড় বৃন্দাবন ও ভক্তিশাস্ত্র গঠন করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রভুর জগতের সমুদয় বাহিরের কার্য্য একরূপ শেষ হইয়া গেল। আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিকট "বাউলকে কহিও বাউল" তর্জ্জা পাঠাইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মূল ঘটনার মূলোৎপাটন

এই প্রস্তাবে জীবের—বিশেষতঃ ভারতবাসীর—দুর্দ্দশার কথা কিছু বলিব। ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন সৃষ্টি হইল, বৈষ্ণবশাস্ত্র রচিত হইল, বড় বড় গ্রন্থ প্রণীত হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী-অনুগা ভজন প্রচলিত হইল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূলঘটনা কি?

ইহার মধ্যে মূলঘটনা প্রভুর অবতার, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মনুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। আর অন্যান্য ঘটনা সেই মুলঘটনার ফল বই নয়। ষটসন্দর্ভ বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তব সে মূলঘটনা নয়,—মূলঘটনার ফল মাত্র। মূলঘটনা—**শ্রীভগবানের মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করা।**

এই মূলঘটনা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা আরো বিস্তার করিয়া বলিতেছি। সেটী এই যে,—সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের—যাঁহার নখচ্ছটা সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও যোগিগণ দেখিতে পান না, তাঁহার মনুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়া নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, তাহাদের সহিত হাস্য ক্রন্দন শয়ন ভোজন ইত্যাদি করা। এরূপ ঘটনা জগতে কখনও হয় নাই। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীরামচন্দ্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য ও উপদেশ কুজ্ঝটিকায় আবৃত। তাঁহাদের লীলা যে সত্য তাহার প্রমাণ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে, যিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন। তিনি কি

বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, তাহা সমুদয়—পাথরে খোদিতের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান—মনুষ্যের চক্ষের উপরে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি একজন ক্ষুদ্র লোক, শুনিলাম (সে ত্রিশ বৎসরের কথা) যে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জগতে বিচরণ করেন, তখন বহুতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার লীলা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্লেশে মরিয়া গেলাম,—কেন, বলিতেছি। আচায্যগণের নিকট গেলাম, যাইয়া বলিলাম যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর কথা আমাকে বলুন। দেখিলাম, তাঁহারা প্রভুকে ভগবান বলিয়া মানেন, অথচ তাঁহার কথা কিছুই জানেন না। তাঁহারা আমাব নিকট বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি শ্লোক লইয়া কি করিব? আমার পিপাসায় প্রাণ যাইতেছিল, আমাকে এক অঞ্জলি মোহরে কেন শান্তি দিবে?

কেহ কেহ বলিলেন, তুমি 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়। তাই সেই গ্রন্থ পড়িতে গেলাম। দেখি, সেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা, সেই অবতারের কথা, সেই মনুষ্য-দেহধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে কি না সাত শত সংস্কৃত শ্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি কে?" তিনি তাহা জানিতেন না, আমার নিকট প্রথম জানিলেন তিনি কে।

অনেক তল্লাস করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাইলাম। কোথা? না—বটতলায়। বহুদিন কদর্য্যরূপে ছাপা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ কিনে না। যাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহারা শ্রীচরিতামৃত লয়েন, চৈতন্য-ভাগবতের সংবাদও রাখেন না। সেই পুস্তক পাইবামাত্র আমি ভাল করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকখানি ভদ্রলোকেরা

হাতে পেলেন। দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটনাটীর কথা অর্থাৎ প্রভুর লীলা-কথা আছে। কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রয় করে না, কেহ পড়ে না, কেহ জানে না!

পরে মুরারির কড়চার কথা শুনিলাম,—সেই প্রভুর লীলার আদিগ্রন্থ। মুরারি চক্ষে দেখিয়া প্রভুর সব লীলা লিখিয়াছেন। সে গ্রন্থ তখন একখানিও পাইলাম না। ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধহয় উহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন, কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই যে শ্রীভগবান্ ২৫ বৎসর মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিলেন, তাহাব নিদর্শন কি ছিল?—কিছুই না। তবে ছিল হরিভক্তি-বিলাস, প্রেমের রত্নাবলী, ষট্‌সন্দর্ভ ইত্যাদি, আর দশ সহস্র উত্তম দুর্ব্বোধ্য শ্লোক! কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু ইত্যাদি সংবাদ তাহাতে ছিল না। যাহা কিছু ছিল, চৈতন্যভাগবতে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আমাদিগের মধ্যে আইলেন, তাঁহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল, তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে বুকের মধ্যে গোটা কয়েক তত্ত্বকথা যত্ন করিয়া রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একখণ্ড চৈতন্যভাগবত না পাওয়া যাইত, যদি উহা ভাল করিয়া ছাপা না হইত, যদি বাঙ্গালায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুর লীলা ধারাবাহিক না লেখা হইত, তবে এত দিন প্রভুর নিদর্শন পাওয়া দুর্ঘট হইত। প্রভু জগৎ হইতে "এবলিস" হইয়া যাইতেন।

আমাদের ঐ দুর্দ্দশার কারণ শ্রবণ করুন। প্রভু যখন প্রকাশ হইলেন তখন ভক্তগণ বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ভুলিয়া গৌর-নদীয়ানাগরীর ভজন আরম্ভ করিলেন। ইহা পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছি। তাহার পরে গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে যাইয়া মন্দির গঠন, বিগ্রহ স্থাপন ও শাস্ত্রলিখন কার্য্য সমাধা করিলেন। তাঁহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন পড়ুয়া পণ্ডিতগণ। তাঁহারা ভাবিলেন, এই পড়ুয়া পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। পড়ুয়া পণ্ডিতগণকে নিরস্ত করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের সাহায্য চাই।

ইহা ভাবিয়া তাঁহার লীলা-কথা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূলঘটনা (অর্থাৎ ভগবানের অবতার) ও লীলা (মনুষ্যের সহিত তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী করা) ভুলিয়া গেলেন।

তাহার পরে এই মূলঘটনা বিবর্জ্জিত যে বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহা তাঁহারা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান ঘটনাশূন্য ও শ্লোকপূর্ণ বৈষ্ণবশাস্ত্র এখানে আসিল। কাজেই প্রভুর বাঙ্গালার ভক্তগণ (যাহারা রাধাকৃষ্ণ ভজনের পরিবর্ত্তে গৌর-নদীয়ানাগরীর ভজন করিতেছিলেন,) আবার উহা ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিলেন। তাই গৌর-কথা ক্রমে উঠিয়া যাইতে লাগিল। উহা উঠিয়া যাইতে যাইতে আমি যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন অতি প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য জানেন না যে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান আচার্য্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের সমুদায় জানেন, কেবল জানেন না প্রভুর কথা,—মূলঘটনার কথা।

প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন সেইস্থান এই প্রধান ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভুর অদর্শনে এই কেন্দ্র বৃন্দাবনে সরিয়া গেল, আর বৃন্দাবন হইতে এই মূলঘটনা উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল। যখন শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত আইলেন, তখন গোস্বামিগণ তাঁহাদের আসনে উপবেশন করেন নাই। তখনকার এই যে মূলঘটনা উহা জাজ্জ্বল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল।

আমার দয়াময় প্রভু কি বলিয়া নিতাইকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা স্মরণ করুন। তিনি বলিলেন—"শ্রীপাদ, প্রাণ সর্ব্বদা কান্দিতেছে। জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণনামের শক্তিতে আমি পাগল হয়েছি, আমাদ্বারা আর হইবে না। জীবগণের নিকট আমি ঋণী, আমি সেই দায়ে বিকাইয়া যাইতেছি। আমার যে সম্বল ছিল তাহা

ফুরাইয়াছে। তুমি আমার ব্যথার ব্যথী, তোমা ছাড়া আমার হৃদয়ের এই ব্যথা আর কাহাকে বলিব? তুমি আমাকে জীবের ঋণ হইতে মুক্ত কর—গৌড়দেশে গমন করিয়া ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকে উদ্ধার কর। যদিও পড়ুয়া পণ্ডিতগণ তোমার বিশেষ কৃপার পাত্র, তবে দেখিও যেন কেহ বাদ না যায়।"*

নিতাই গৌড়ে যাইয়া কি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বহুতর পদে বর্ণিত আছে। আমরা সেই সমুদয় পদ হইতে প্রধানতঃ এই বিবরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটীও নাই। যথা একটী পদ—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই যায়।
যারে দেখে তারে প্রেমেতে ভাসায়॥
অধম পতিত পাপীর ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিতেছে যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদিয়ার?

নিতাই আপনার পার্ষদগণ সঙ্গে লইয়া পায়ে নূপুর দিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন আর বলিতে বলিতে যাইতেছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ॥

---

* এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমুদয় প্রভুর নিজ মুখের কথা, কল্পিত একটিও নয়।

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবসনে গোলোকের ঈশ্বর॥
গোলোকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া।
ঘরে ঘরে বিলাইতেছেন আপনি যাচিয়া॥ ইত্যাদি

এই গেল নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি। যেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, সেখানে নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন—"ভাই, তোমরা কি নদীয়ার অবতারের কথা শুন নাই? তোমরা কি শুন নাই যে, সেই গোলোকের পতি, জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, আপনি ভক্ত হইয়া, ধরাধামে আসিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি কেবল তোমাদের জন্যই আসিয়াছেন। আর ভয় কি? তিনি তোমা-দিগকে কোলে করিয়া গোলোকে লইয়া যাইবেন। বলিতে বলিতে—

গৌর-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই।
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায়॥

আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দও উন্মাদ হইলেন। নিতাই সম্মুখস্থ সকলকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ভাই সকল, এসো তোমাদের জনা জনা কোলে করি। তোমরা আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই, তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না, ঐ তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের গোলোকধামে লইয়া যাইবেন তাই দাঁড়াইয়া আছেন।"

নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন ক্রমেই দ্রব হইতেছে না, তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছে। তিনি তখন দুই হস্তে ও দন্তে তৃণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"ভাই

সকল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমাদের দাসের দাস হইলাম, তোমরা মুখে একবার গৌর গৌর বল।”

হয়ত ইহাতেও হইল না। তখন নিতাই “ভাই” “ভাই” বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তখন এমন হইল যেন তাহারা নাম না লইলে নিতাই প্রাণে মরিবেন। শেষে একজন দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া বলিতেছে, “ঠাকুর শান্ত হও, আমি বলিতেছি। কি দয়া! কি দয়া!” ইহা বলিয়া যেই সে মুখে নাম বলিল, আর নাম তাহার মুখে লাগিয়া গেল, সে আর উহা ছাড়িতে পারিল না, আর সেই সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল। তাহার বায়ু অন্যের অঙ্গে লাগিল, আর সেও দ্রবীভূত হইল।

গোস্বামীদের প্রচার-পদ্ধতি ও নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি কত বিভিন্ন দেখ। গোস্বামী তর্ক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, আর নিতাই কান্দিয়া কান্দাইলেন। কাজেই গোস্বামিগণ কতকগুলি নীরস কঠিন পণ্ডিত-বৈষ্ণব, আর নিতাই কতকগুলি সরল প্রেমিক-বৈষ্ণব সৃষ্টি করিলেন। গোস্বামী অকাট্য তর্কের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, ভগবান আছেন; আর নিতাই অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন—, ঐ দেখ তিনি! গোস্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন যে, ভগবান প্রেমময়। কিন্তু নিতাই আপনি প্রেমে মাতিয়া ভগবানের প্রেম দেখাইতেছেন, আর স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গও নয়ন-জল দেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন।

গোস্বামিগণ সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, অতি সূক্ষ্মতত্ত্বকে কোটি ভাগে বিভাগ করিয়া তাঁহাদের সতেজ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন; যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা স্তম্ভিত হয়েন। আর নিতাই আবেগভরে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

"দেখ, তোদের সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
তোদের গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥"

কাহার শিক্ষার শক্তি অধিক ?—গোস্বামীদের না নিতাইয়ের ? আমরা শতবার বলিব যে, নিতাইয়ের যে শিক্ষা ইহা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। নিতাই শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান জীবের দুঃখে গোলোকে রহিতে না পারিয়া ধরাধামে আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছিলেন, কেন না, ইহাতে তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব আছে অগ্রে তাহা লোকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার অভ্যুদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় তাহারা "জানিলেন।" অতএব নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবগণ কি **জানিলেন ?**

(১) আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবগণ জন্মাবধি চেষ্টা করিয়াও কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দিতেছেন।

(২) যাহারা মনে মনে ভাবেন যে, ভগবান থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি লইয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে। কেহ তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা দিয়াছে, আবার কেহ তাঁহার হস্তে বাঁশী দিয়াছে। এখন সে বিবাদ আর রহিল না।

(৩) তিনি মনুষ্যকে কিরূপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন বিবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন যে, জীব আপনার কর্ম্মের ফল ভোগ করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন, ভগবান বিচারক, অপরাধ হইলে তিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাপীকে চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে থাকিতে হয়। নিতাই দেখাইয়া দিলেন যে, সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—"তিনি

তোমার” আর “তুমি তাঁহার” ; বলিতে কি, তাঁহাতে ও তোমাতে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ তোমাতে আর তোমার স্ত্রীতেও নাই। অর্থাৎ জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন শ্রীভগবান। নিতাই এ সমুদয় দেখাইয়া দিলেন, অথচ আগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্তও করিলেন না।

এখন আচার্য্যগণের শিক্ষা দেখুন। তাঁহারা শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান অবশ্য আছেন এবং তাহার নানাবিধ কারণ দেখাইলেন। তাঁহাকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহাও তাঁহারা দেখাইলেন। তাঁহারা বলিলেন—যেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী-অনুগা ভজন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। “তিনি আমাদের” আর “আমরা তাঁহার” সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাই বলিয়া তাঁহারা এক এক করিয়া সমুদয় কারণগুলি বলিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের শিক্ষায় জীব **জানিলেন** যে, ভগবান আছেন, আর “তিনি তোমার” ও “তুমি তাঁহার।” বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষায় জীবকে বুঝাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। কিন্তু নিতাই ইহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কাজেই শাস্ত্রের উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন মাত্র, কিন্তু তিনি যেমন তেমনই থাকিলেন। নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবের পুনর্জ্জন্ম হইল এবং তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল, অর্থাৎ তিনি ‘কৃষ্ণপ্রেম’ পাইলেন। ইহাদের উভয়ের শিক্ষার মোটামুটী ফল এই—

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইয়ের শিক্ষায় প্রেম পাইলেন। কাজেই এই পদটির সৃষ্টি হইল—

“ধর লও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়॥”

অতএব যাঁহারা নিতাইয়ের শিক্ষা পাইলেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের শিক্ষার কিছু প্রয়োজন রহিল না। যাঁহারা শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ

নিতাইয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহাদের বিশেষ কিছুই লাভ হইল না।

এমন সময় কথা উঠে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশে বৈষ্ণব-প্রচারক পাঠাইতে হইবে। তখন এমন কথাও হয় যে, গৌরগতপ্রাণ পরম পণ্ডিত বৃন্দাবনের রাধারমণ-সেবাইত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহোদয় প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে যাইবেন। আর তখন ইহাও সাব্যস্ত হয় যে, যিনি যাইবেন তাঁহাকে নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ—

"কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবের সনে গোলোকের ঈশ্বর॥"

এই ভাবে প্রচার করিতে হইবে।

জীব গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিলে শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধাকৃষ্ণ আপনি আসিবেন,—অর্থাৎ গোস্বামিগণ যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সব আপনি আসিবে। আর তাহা না করিয়া যদি ইহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে আর কেহ আসুন না আসুন, প্রভু যে আসিবেন না তাহা নিশ্চয়।

অতএব বাসুঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নদিয়ানাগরী-অনুগা ভজন, আর নিতাইয়ের (ভজ গৌরাঙ্গ) প্রচার-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের সর্ব্বনাশ হইযাছে। কারণ আগে গৌর—আগে মূলঘটনা; অপর সমুদয় পরে আপনিই আসিবে।

অতএব হে জীবের দুঃখে কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখাও, সর্ব্বদেশে ইহা প্রচার কর যে,—১৪০৭ শকে এই দেশে শ্রীভগবান আসিয়া ৪৮ বৎসর মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন। আর ইহাও জানাও যে—একথা যে সত্য তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। ইহা যদি কর, তবে নিতাই যেমন ভগবানকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রভুর দৌর্ব্বল্যের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। শুধু যে আহার অল্প হওয়াতে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল তাহা নহে,—সাধন ভজন করিলেও শরীর এইরূপ ক্ষীণ হয়। কিন্তু ইহাতে যদিও শরীর ক্ষীণ হয়, তত্রাচ আভ্যন্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে। প্রভুর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইত। এমন কি, তাঁহার বায়ু কাহারও গাত্রে লাগিলে, তাহার হৃদয়ে ঐরূপ ভক্তিভাবের উদয় হইত। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। ভাগ্যবান শুভানন্দ সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেনের এক বিন্দু লইয়া পান করিলেন, আর তদ্দণ্ডে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর দেহের অলৌকিক তেজের কথা আর কি কহিব! ধীবর তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ সমুদ্র হইতে উঠাইতে উহা স্পর্শ করিল, আর তৎক্ষণাৎ সে উন্মত্ত হইল, এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল। তাহার ভাব দেখিয়া স্বরূপ জানিতে পারিলেন যে, সে প্রভুকে স্পর্শ করিয়াছে, আর প্রকৃতই সেই প্রভুর ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত বহুমূল্য দ্রব্য। রঘুনাথ দাস গোসাঞির খুড়া কালিদাসের প্রধান ভজন ছিল উচ্ছিষ্ট-সেবন। তাহাই সেবন করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেন। তিনি কোন বৈষ্ণবের বাড়ী গমন করিতেন, করিয়া প্রসাদ চাহিতেন। অবশ্য প্রথমে পাইতেন না। তখন ধন্না দিতেন, এবং প্রসাদ সেবন না করিয়া আসিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে

কৃতকার্য্য হইতে না পারিতেন, সেখানে আঁস্তাকুঁড়ের পরিত্যক্ত পাত্র চাটিতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি।

এইরূপে কালিদাস একদিন ঝড়ুঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। ঝড়ুঠাকুর জাতিতে ভুঁইমালী, অতএব অতি নীচ; কিন্তু বৈষ্ণবগণের এই মহিমা অতি বড় যে, তাঁহারা ভক্তি দেখিয়া ছোট বড় বিচার করেন, জাতি দেখিয়া নয়। ঝড়ু যদিও ভুঁইমালী, তবু তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে ঠাকুর হইলেন। কালিদাস পাতার দোনা করিয়া পাকা আম আনিয়া ঝড়ুকে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্তু প্রসাদ দিতে চাহিলেন না। পরে যখন ঝড়ু সেই আমের আঁটি চুষিয়া ফেলিয়া দিলেন, কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় চুষিলেন,—এই তাঁহার ভজন।

কালিদাস নীলাচলে গিয়াছেন; কি জন্য?—না, তাঁহার চিরদিনের সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া। বৈষ্ণবেরা কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া যে প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে বুঝা যায়। কোন বৈষ্ণবের নিকট প্রসাদ চাহিলে তিনি দৈন্য করিয়া দিতে অস্বীকার করেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকে দিতে নাই যাহার উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি না থাকে। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভুও উপযুক্ত লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রভু অন্তর্য্যামী, কাজেই জানিতেন—কে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত। কালিদাস যে উপযুক্ত পাত্র তাহা অবশ্য প্রভু জানিতেন। কালিদাস প্রভুর প্রসাদ আহরণ করিতে নীলাচলে গিয়াছেন, প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে আছেন। প্রভু মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। প্রভুর নিয়ম আছে তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর দর্শন করেন না। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে কপাটের আড়ালে বাইশ

পশারের তলে একটী গর্ত্ত আছে, প্রভু প্রত্যহ সেখানে পদধৌত করেন। প্রভুর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না। প্রভু পদ বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, আর গোবিন্দ জলদ্বারা উহা প্রক্ষালন করেন। আজও প্রভু তাহাই করিলেন, আর কালিদাস অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার নীচে অঞ্জলি করিয়া হাত পাতিলেন। মহাপ্রভু ইহা দেখিলেন, দেখিয়া কিছু বলিলেন না। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও কিছু বলিলেন না। এইরূপে কালিদাস অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীপদ-ধৌত জল পান করিতে লাগিলেন॥ তিনবার এইরূপ পান করিলে প্রভু নিষেধ করিলেন ; বলিলেন,—"আর নয়, ঢের হয়েছে।"

পরে কালিদাস প্রভুর বাসায় আসিলেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস হইতেছে না, বসিয়া আছেন। প্রভু সেবা করিতেছেন, অন্তর্য্যামী প্রভু আপনার সেবা হইলে, গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন, আর সেই প্রসাদ তিনি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রসাদের বড় মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ মানে শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট। অতএব ভক্তের প্রসাদে যদি ভক্তি উদ্দীপনা করে, তবে শ্রীভগবানের প্রসাদে উহা আরও বেশী করিবে। কিন্তু কথা এই, ভগবানকে অর্পণ করিলেই তিনি তাহা ভোগ করেন না ; আর যদি ঠিক ভক্তিপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তবে তিনি তাহা উপেক্ষাও করিতে পারেন না।

মনে ভাবুন, ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবেন। শ্রীভগবান সে ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাহার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম বৃথা হয়। ভক্ত পায়স রন্ধন করিয়া, একটি অতি পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া, করযোড়ে বলিতেছেন, "শ্রীভগবান, এই পায়সের গন্ধে আমার প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি উহা মুখে কিরূপে দিব ? তুমি যদি একটু মুখে দাও, তবেই আমার পায়স সুস্বাদ হইবে।" ইহাই বলিয়া

প্রাণের সহিত "খাও, খাও" বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন,—"আমার সম্মুখে সেবা করিবে না? আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি।" ইহা বলিয়া বস্ত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদন করিলেন, করিয়া তিনি করযোড়ে বসিয়া থাকিলেন। যদি কেহ এরূপ একান্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই সেই মহাপ্রসাদ শ্রীভগবানের অধরামৃত দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দের তনয় (নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র) রঘুনন্দনের ঠাকুরকে নাড়ু খাওয়াইবার কথা, বৈষ্ণবমাত্রই জানেন। মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, তাই তাহার পুত্র রঘুকে বলিয়া গেলেন যে, সে যেন ঠাকুরের সেবা করে। রঘু সেই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ঠাকুরের কাছে সেবাদ্রব্য লইয়া যাইয়া বলিলেন,—"ধর খাও।" বালকের মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে দিলেই তিনি খাইবেন। কিন্তু কৈ তাহা ত নয়, বরং ঠাকুর খাইতেছেন না। রঘু কান্দিয়া আকুল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন,—"তুমি খাবে না, বাবা আমাকে মারিবেন; বলিবেন, তুই দিস নাই, আপনি খেয়ে ফেলেছিস।" ইহা বলিয়া বালক রঘু ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঠাকুর করেন কি, দস্যুহস্তে পড়িয়াছেন, কাজেই সব খাইতে হইল। মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলে রঘু বলিল,—"প্রসাদ সমুদয় ঠাকুর আপনি খাইয়া ফেলিয়াছেন।" রঘুর মুখ দেখিয়া মুকুন্দ বুঝিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে না। তবে উহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাই পুত্রকে বলিলেন,—"তুই আবার খাওয়া দেখি।" তাহাই ঠিক হইল, রঘু আবার খাওয়াইবে। রঘু তাই করিল, আর ঠাকুর হাতে নাড়ু লইয়া নিতান্ত লোভীর ন্যায় খাইতে লাগিলেন। তখনি চেঁচাইয়া রঘু বলিতেছেন, "বাবা, দেখে যাও ঠাকুর খাইতেছেন।" মুকুন্দ দৌড়িয়া আইলেন, আর অমনি খাওয়া বন্ধ হইল। তবে যে

নাড়ুটী মুখে দিতে যাইতেছিলেন সেইটি ঠাকুরের হাতে রহিল। অত্যাপি সেই নাড়ু-হাতে ঠাকুর, শ্রীখণ্ডে ভক্তের সুখ দিতেছেন।

প্রভু মহাপ্রসাদকে কিরূপ ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পানা নরসিংহে প্রভু গমন করিলে, অধিকারী মাধবভুঞা কিছু প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। যথা—

পূজারি প্রসাদ কিছু আনিল ত্বরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইয়া প্রভু হাতে॥
হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে জল ঝরে॥

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোপালবল্লভ-ভোগ আরম্ভ হইল, দ্বারে কপাট পড়িল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ভোগ সমাপ্ত হইলে, সেবকগণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আসিল। প্রভুকে দিলে তিনি এক কণা জিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়া বলিলেন,—"সুকৃতি লভ্য ফেলা লব।" ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, আর নয়নজলে ভাসিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,— "প্রভু, আপনি বারে বারে 'সুকৃতি লভ্য ফেলা লব' কেন বলিতেছেন?" প্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ তাহাকে 'ফেলা' বলে।" আর 'লব' মানে 'অল্প অংশ। ইহার অর্থ এই যে, যিনি সুকৃতি তিনি এইরূপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ উহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে। দেখ, ইহার গন্ধে মন মোহিত হইতেছে। আশ্চয্য দেখ, যদিও এ সামান্য ও প্রাকৃত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু আস্বাদ ইহার অপ্রাকৃত। জগতের কোনদ্রব্যে এইরূপ আস্বাদ মিলে না।"

প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আস্বাদ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

প্রভুর সারাদিন এই ভাবেই গেল। পরে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া ভক্তগণ লইয়া আবার বসিলেন, আবার প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, আর পুরী ভারতীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

পুরীধামে প্রভুর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, উহা অপবিত্র হয় না। উহা যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর সেখানে অন্নে দোষ নাই। কিন্তু বাহিরে কেন উহা অপবিত্র হয়? তাহার কারণ, ইহা বেদবিধির শাসন। বহুদিন হইল, একদা আমার দেওঘরের বাটিতে প্রায় পঞ্চাশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান পবিত্র করিলেন। সে বাসাবাড়ী, কাজেই তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু ব্যস্ত হইলাম। এমন সময় সর্দ্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি আতিথ্যের ভার লইলেন। তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা আছে তাঁহার প্রসাদ পাঠাইয়া দিবেন এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং প্রকৃতই মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণগণ ভারে ভাবে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পুরিয়া ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত। বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে আমার পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইলাম। এমন সময় আমার মনে পড়িল আমি শূদ্রাধম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণঠাকুর; তখনই স্তম্ভিত হইলাম, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"প্রভুসন্তান ও ভক্ত মহাশয়গণ! আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অনুমতি না পাইলে করিতে পারি না, কারণ আমি শূদ্রাধম। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে না, বরং আমি পবিত্র হইব। আপনারা বলেন কি?" দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল হইলেন,—কারণ 'হাঁ' বলিতে পারেন না, আবার 'না'ও বলিতে পারেন না। এই তাঁহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম। যখন

সার্ব্বভৌম প্রাতে মুখ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—

আজই নিষ্কপটে তুমি লইলে কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়॥
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন।
আজি-কৃষ্ণ প্রাপ্তি-যোগ্য হইল তোমার মন॥
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

কথা এই, কুল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় না লইলে কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন না, আর বেদ-ধর্ম্ম মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না,—প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য। তাহার প্রমাণ—উপরে শ্রীমুখের আদেশ।

অগ্রে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বিদায় দিলেন, তবু সে বিদায়ের পরে আরও দ্বাদশ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন, প্রভু যে জন্য আসিয়াছেন সে কার্য্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আর তিনি কেন এ মলিন জগতে থাকিবেন, তাঁহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু প্রভুর কিছু কাজ বাকি ছিল, তাহা শ্রীঅদ্বৈতও জানিতেন না। সে কাজ কি? না—আপনি আচরিয়া জীবকে সর্ব্বোত্তম ভজন শিক্ষা দেওয়া।

এই ভজন ব্রজের নিগূঢ়-রস দিয়া করিতে হয়। ব্রজের সেই রস কি, আর রসদ্বারা কিরূপে ভজন করিতে হয়, তাহা জগতে অনর্পিত ছিল, প্রভু আপনি আচরিয়া তাহা জগৎকে শিখাইলেন। রস-বস্তু কি তাহার একটু আভাস এখানে দিব। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রস একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটি গৌণ ও চারিটি মুখ্য। গৌণরস কি? না—হাস্য, অদ্ভুত, ইত্যাদি সাত প্রকার। মুখ্যরস কি? না—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরসের ভজন কিরূপ তাহার বিচার এখন থাকুক।

তবে গৌণ ও মুখ্য রসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজন করিতে হইলে যে রস প্রয়োজন, তাহাকে বলে মুখ্য রস। নিজজন কাহারা? না—মাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, সখা, ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহাদের মধ্যে কাহারও স্থানে বসাইয়া, "পিতা" কি "মাতা" কি "নাথ" বলিয়া ভজনা করা মুখ্য রস দ্বারা হয়।

আবার যে রসে শ্রীভগবানকে স্পষ্টরূপে নিজজন বুঝায় না, তাঁহাকে বলে গৌণরস। যেমন শ্রীভগবানকে "শক্তিধর", বা "করুণাময়" বলিয়া ভজনা করা। কোন বস্তু নিজজন না হইলেও তাঁহাকে "শক্তিধর" বা "করুণাময়" বলিয়া ভজনা করা যায়। যেমন শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন বলিয়া কালীকে ভজনা করা। এ ভজনা "বীররস" দ্বারা করিতে হয়, এই বীররস গৌণরসের মধ্যে গণনীয়।

মুখ্যরস চারিটি এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া চারি ভাবের ভজনা করা যায়। যথা, কর্ত্তা বা পিতা ভাবে, মাতা বা ভ্রাতা ভাবে, বাৎসল্য বা সন্তান ভাবে, আর কান্তা বা পতি কি উপপতি ভাবে। শ্রীদাম সুবলের ভজন সখা ভাবে, যশোমতির ভজন বাৎসল্য ভাবে ও গোপীগণের ভজন কান্তা ভাবে। জগতে শেষের তিনটা রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাঁহাদের ভজন কেবল দাস্য-শক্তি লইয়াই ছিল। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানকে পিতা বা প্রভু বলিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন অতি স্থূল। এইরূপ ভজনে হৃদয়ের ধনকে দূরে রাখিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ ভজন কান্তা ভাবে।

কান্তা ভাবে শ্রীভগবানকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহার আভাস এখন সংক্ষেপে দিতেছি। অবশ্য এই রসের ভজনের কথা শ্রীভাগবত গ্রন্থে আছে, কিন্তু প্রভু উহা আপনি আচরিয়া জগতে দেখাইলেন।

অর্থাৎ উহা শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল, কিন্তু প্রভু উহা আচরিয়া দেখাইলেন। কান্তা ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন স্ত্রীলোক পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেইরূপ আপনাকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি ভাবে ভজন করা।

এই কান্তা ভাবে ভজন দুই প্রকারে হয়—প্রত্যক্ষ ও অনুগা ভাবে। প্রত্যক্ষ ভজন এই যে, আপনাকে গোপী ভাবিয়া শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করা। আর "অনুগা-ভজন" মানে আপনি মধ্যস্থ হইয়া গোপীর সহিত শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আপনার ভগবৎ-প্রেম বৃদ্ধি করা। একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন। যথা—

নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ।
হে মোর হরি, তৃষিত চাতকী সমান॥

এই গীতে সাধক তানসেন বলিতেছেন যে, "হে ভগবান! যেমন চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি তোমার লাগি ব্যাকুল!" ভগবানে এত পিপাসা অবশ্য গাঢ়-প্রেম হইতে হয়, আর যাঁহার এরূপ পিসাসা আছে, তিনি তাহা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের অধিকারী। কিন্তু এতখানি পিপাসা যাঁহার নাই, তিনি যদি ঐরূপ বলেন, তবে তাঁহার ভজন হয় না, ভণ্ডামি হয়। সেই জন্য কান্তা-ভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, বলিতে কি, একবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া আউল বাউলের কদর্য্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, সুতরাং গোপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ-লীলার রস প্রত্যক্ষরূপে

আস্বাদ করিতে গিয়া আপনারা রাধা-কৃষ্ণ সাজিলেন, সাজিয়া আপনারা রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই ভাগবত-সেবা স্থানে ইন্দ্রিয়-সেবা প্রবেশ করিল।

প্রত্যক্ষ-ভজনের পরিবর্ত্তে গোপী-অনুগা-ভজন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গোপী-অনুগা-ভজন কিরূপ বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, গোপীরা যাইতে দিবেন না বলিয়া কেহ কেহ বা অশ্বের সম্মুখে শয়ন করিয়া আছেন। আর বলিতেছেন, "নাথ! যাবে ত আমার বুকের উপর দিয়া যাও।" এইরূপে গোপীরা প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে যাইতে দিতেছেন না। এই যে চিত্রটি তোমার হৃদয়পটে অঙ্কিত করিলে, ইহাতে তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সম্যকরূপে সেই গোপীদের যে প্রেম তাহার আস্বাদ পাইতেছ। এ চিত্র হৃদয়ে দেখিলে তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব, তুমি মাথুরের গীত শুনিতেছ, ইহাতে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বর্ণিত আছে। তাহা শুনিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে কেন? তুমি ত রাধা নও, তুমি ত আর কৃষ্ণ-বিরহ প্রপীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত হইবে কেন? মনে ভাব তুমি প্রভাসের গীত শুনিতেছ, যশোমতী বলিতেছেন, "আয় গোপাল, দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচা।' তাহা শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন? তুমি ত যশামতী নও। ইহাকে বলে গোপী-অনুগা-ভজন। তুমি রাধার কান্তাভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কান্তভাবের আস্বাদ পাইবে। তুমি যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সেই বাৎসল্য-প্রেমের কিছু ভাব আহরণ করিবে। এইরূপে গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি আহরণ করাকে গোপী-অনুগা ভজন বলে। বৈষ্ণবগণ এইরূপে গোপী-অনুগা-ভজন করিয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। এরূপ ভজন আর কোন ধর্ম্মে নাই।

মনে ভাব, অতি রসাল একটী প্রেমঘটিত গল্প যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে কি কি প্রকরণ প্রয়োজন ?

ইহার প্রকরণ একটী সুন্দর নাগর ও সুন্দরী নাগরী, একটী সঙ্কেত স্থান, একটী মিলন স্থান, ইত্যাদি। একটী নাগর ও একটী নাগরীর হঠাৎ এক স্থানে দেখা হইল, হইয়া উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। তখন দূতি যাইয়া মধ্যস্থ হইলেন, ক্রমে তাঁহারি সাহায্যে উভয়ের মিলন হইল। হয়ত তখন আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ঈর্ষার সৃষ্টি হইল, পরে মান হইল, মানের পর কলহ, কলহের পরে অনুতাপ ও আবার মিলন হইল। এইরূপে সেই গল্প নানা রস দ্বারা সুস্বাদু করা যায়।

আরো শুনুন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, তখন নাগর ক্রন্দন করেন, নাগরী ক্রন্দন করেন, শেষে আবার উভয়ের মিলন হইল।

মনে করুন শকুন্তলার কাহিনী। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দেখা সাক্ষাৎ হইল, সখিগণ দৌত্য করিলেন, ক্রমে মিলন হইল, বিচ্ছেদ হইল, ঘোর বিরহ উপস্থিত হইল, পরে আবার মিলন হইল। এই কাহিনী পড়িতে পড়িতে পাঠক, নাগর ও নাগরীর সহিত সহানুভূতি করিয়া কান্দিবেন, হাসিবেন ইত্যাদি। পাঠকের নাগর ও নাগরীর প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইবে, অনেক দিন তাহাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না। এইরূপ যদি শকুন্তলার কাহিনী লইয়া চর্চ্চা করিতে থাক, তবে ক্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তোমার হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে অধিকার করবেন।

দুষ্মন্ত রাজার স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ও শকুন্তলার স্থানে শ্রীরাধাকে স্থাপিত কর, তাহা হইলে কৃষ্ণলীলা হইল। এই লীলা আস্বাদন করিতে করিতে সাধক কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিবেন, এবং তাঁহার রাধাকৃষ্ণের প্রতি

অনিবার্য্য আকর্ষণ হইবে! এইরূপ করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের সঞ্চার হইবে। মহাজনগণ জীবের নিমিত্ত বহুতর শ্রীকৃষ্ণলীলা রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে কল্পনার দ্বারা ইহা পরিবর্ত্তন করিতে, কি কল্পনার দ্বারা নূতন কৃষ্ণলীলা গঠন করিতে পার। তুমি যদিও কল্পনা করিয়া লীলা সাজাইবে, কিন্তু তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে ফলভোগী হইবে। যেমন, যদিও শকুন্তলার কাহিনী কল্পনার সৃষ্টি, তবু উহার আলোচনায় উহার নাগর-নাগরীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। 'শ্রীকালাচাঁদ গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন—

তথাস্তু তথাস্তু বলিলা মাধবে।
যে খেলনা খেলিবে মোদের পাইবে ॥
খেলিবে তোমরা যাহা হয় মনে।
নিশ্চয় তাহাতে রব দুই জনে ॥
কল্পনা করিয়া খেলা সাজাইবে।
আমার বরেতে সব সত্য হবে ॥

অর্থাৎ কালাচাঁদ ভক্তগণকে এই বর দিতেছেন যে, "তোমরা আমাকে ও শ্রীমতী রাধাকে লইয়া খেলা করিও। এই খেলা তোমরা কল্পনা বলে প্রস্তুত করিও, কিন্তু যদিও তোমরা কল্পনা দ্বারা খেলা সাজাইবে, তবু আমি আর শ্রীমতী সেই খেলায় থাকিব।" মনে ভাব তুমি গ্রীষ্মকালে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে কুসুমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে বসাইলে, সম্মুখে নৃত্যকারী ময়ূর রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বায়ুব্যজন করিতে লাগিলে। কালাচাঁদ বলিতেছেন, এরূপ যদি তোমরা কর, তবে এই ছবিটী আমরা সত্য করিব। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতই সাধকের সম্মুখে কুসুমাসনে বসিয়া তাহার বায়ু-ব্যঞ্জন-রূপ উপহার গ্রহণ করিব। এই যে কালাচাঁদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বর, ইহার ভিত্তিভূমি গীতা—গীতায়

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমাকে যে যেরূপ ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।" যদি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন থাকে, তবে এ তত্ত্বটি সত্য। যদি তুমি শ্রীদুর্গা বলিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট দুর্গা হইবেন। যদি তুমি নিরাকার উপাসনা কর, তবে তোমার নিকট তিনি নিরাকার হইবেন। তুমি নাস্তিক হইলে, তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধাকৃষ্ণরূপে যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকৃষ্ণ হইয়া তোমাকে ভজনা করিবেন। গীতার বাক্যের তাৎপর্য্য এই।

এইরূপে ভক্তগণ, এই যে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান যিনি অপরিমেয়, তাঁহার সঙ্গ করিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের লোভের সৃষ্টি হয় ও পরিশেষে তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করেন। যখন আমরা ব্রাহ্ম ছিলাম, তখন ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম যে,—"হে ঈশ্বর, আমি পাপী, তুমি দয়াময়, তুমি আমার পাপ মার্জ্জনা কর।" এইরূপ প্রার্থনা প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথা কহিবার ছিল না। খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম-যাজকগণ এই একরূপ প্রার্থনা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঐ এক কথা, কারণ আশাতীত জ্ঞানাতীত নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর কোন কথা হইতে পারে না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল তাঁহাকেই চান। 'শ্রীকালাচাঁদ-গীতা'র এক গোপী শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া।
খেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া॥
কখন ভাঙ্গিছ কখন গড়িছ।
এই মত দিবা রজনী খেলিছ॥

এই মত মোরা তু দুহারে লয়ে।
খেলিব সকলে যাহা চাহে হিয়ে ॥
কখন মিলাব কখন ছাড়াব।
কখন দুজনে কলহ করাব ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা এই যে,—আমরা তোমাকে দেখিব, দিবানিশি তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমার সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠি করিব, তোমার কাছে শিখিব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাদি। অর্থাৎ—তোমাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ করিব,—তাহা হইলেই আমাদের অনিবার্য্য পিপাসা মিটিবে। তাই শ্রীভগবান উত্তরে বলিলেন যে,—"তুমি আমাকে যেরূপ ভজনা করিবে, আমিও তোমাকে সেইরূপ ভজনা করিব। তুমি আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে চাও, আমিও তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিব। তুমি ইষ্টগোষ্ঠি করিবে, আমিও করিব। ইত্যাদি।

এইরূপ ভজনে ভক্তগণ সেই মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্যামসুন্দর, সেই বনমালী, সেই নটবর, সেই রসরাজকে খেলার সঙ্গী করিতে পারেন। যাঁহারা ওতপ্রোত জগদ্ব্যাপী নিরাকার পরমেশ্বরকে ভজনা করেন, তাঁহারা বড়লোক, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু—মূর্খ গোপিগণ বলেন যে—

হৃদ-সিংহাসনে রসের বালিস।
শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস ॥

অর্থাৎ তোমাকে হৃদয়ে করিয়া শয়ন করিব, যেমন স্ত্রীলোক পতিকে কি উপপতিকে লইয়া করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রস গৌণ সাত প্রকার ও মুখ্য চারি প্রকার। গৌণ সাত, যথা—হাস্য প্রভৃতি। এই সমুদয় রস দ্বারা কিরূপে ভজনা করা যায়,

পরে বলিতেছি। মুখ্য যে চারি রস, অর্থাৎ দাস্য সখ্য ইত্যাদি, ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। আর বোধ হয় ইহার তথ্য ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন।

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত দুইটি বস্তুর প্রয়োজন, যথা—নায়ক ও নায়িকা, বা ভগবান ও ভক্ত। আপনারা জানেন, নায়ক নায়িকা কত প্রকারের আছেন। নায়ক সুন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পণ্ডিত আছেন ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন প্রকৃতির ইত্যাদি। এখন শ্রীকৃষ্ণকে ইহার একটি নায়ক করিয়া বিচার করা হউক।

যদি শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমরা তিন প্রকারের শ্রীকৃষ্ণ পাইতেছি, যথা—প্রথম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ। ইনি কিরূপ, না—বনমালী, সরল, প্রেমভিখারী, প্রেমিক ইত্যাদি। দ্বিতীয় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী, শাসনকর্ত্তা, রাজা। তৃতীয় দ্বারকার কৃষ্ণ। ইনি মহাসংহারী,—স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত। যদিও তিন জনেই শ্রীকৃষ্ণ, তথাচ তাঁহাদের প্রকৃতি অনেক বিভিন্ন। কাজেই ইঁহাদের ভজনও সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্। শ্রীরাধিকার ভজনীয় যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাঁহার যে ভজন, তাহা মথুরার কৃষ্ণের ভজন হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম দিয়া প্রেমভিক্ষা করেন। ইহার আর কোন সাধ নাই, ভজন নাই। তিনি কৃষ্ণকে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, শ্রবণ করুন—

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদমুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি॥
দুই বাহু প্রসারিয়া, হৃদি মাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তোমায় রাখি॥

শ্রীমতী রাধা যেরূপ নায়ক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কাঙ্গাচাঁদ ঠিক তাই। ইহার হাতে দণ্ড নাই, আছে বাঁশী; মাথায় পাগ নাই,

আছে চূড়া। অর্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন না, মুগ্ধ করেন; তাঁহার আর কোন কাজ নাই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দ ভোগ করা।

শ্রীমতীর মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। এই ভাব মনে উদয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন—

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে ও রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥

অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে সখীকে বলিতেছেন, "সখী! কৃষ্ণ যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি? আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব।" এখন পরাৎপর পরমেশ্বর সম্বন্ধে কি ঐরূপ ভজনা করা যায় যে, সেই নিরাকার পরম-ঈশ্বর যখন আমার বাড়ী আসিবেন, তখন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব? তা হইবে না, সে একেবারে বাতুলের কার্য্য হইবে। আমরা এখনি দেখাইব যে, এরূপ ভাবোল্লাস কুব্জার সম্ভবে না, রুক্মিণীরও সম্ভবে না,—এই রস দ্বারা কেবল ব্রজের কৃষ্ণকে ভজনা করা যায়। অতএব যেরূপ নায়ক হইবেন, তাঁহার ভজন-প্রণালীও তাহার উপযোগী হওয়া চাই,—নতুবা সে ভজন ভণ্ডামি হইবে। যাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিবেদন করিবেন, তাঁহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে করিতে হইবে। মথুরায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই।

তাহার পরে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি রাজ্যেশ্বর, ইহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ইহার নিকটে যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে মথুরাবাসীরা ঐশ্বর্য্য চাহিবেন,—প্রেম নহে; আর ঐশ্বর্য্যই তিনি দিয়া থাকেন, মথুরাবাসীরা প্রেমের ধার ধারেন না। আর কি, না—তিনি অপরাধীকে দণ্ড বা

মার্জ্জনা করিতে পারেন। ব্রজের গোপীর প্রার্থনা বা নিবেদন উপরে দিয়াছি। এখন মথুরাবাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এটি বিদ্যাপতির গীত—

মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোমায়।
আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিল,
দয়া করি না ছাড়িবে আমায়॥
গণইতে দোষগুণ, গুণলেশ না পাওবি,
যবে তুমি করিবে বিচার।
তুমি জগন্নাথ, জগতে বলাইয়াছ,
'জগ ছাড়া নহি মুই ছার'॥

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ! আমি তুলসী তিল দিয়া আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে একেবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ করিও না। অবশ্য যখন তুমি দোষগুণ বিচার করিবে, তখন আমার কোন গুণ পাইবে না। কিন্তু তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই জগতে বাস করি, আমাকে তুমি একেবারে ত্যাগ করিতে পার না।"

উপরে দুই প্রকার কৃষ্ণ দেখাইলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ দুই প্রকার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, "হে কৃষ্ণ! আমার পাপ মার্জ্জনা কর," তাঁহার কৃষ্ণ দণ্ডধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর যিনি বলেন, "তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি," তাঁহার কৃষ্ণ আর ঐশ্বর্য্যশালী পাগবান্ধা হইতে পারেন না, তাঁহার কৃষ্ণ রাখাল-রাজা ইত্যাদি।

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেম-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাঁহারা ব্রজবাসী। তাঁহাদের লীলাময় সুন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট পাপ-মার্জ্জনা, মুক্তি প্রভৃতি, কি কোন আধ্যাত্মিক

ঐশ্বর্য্য, যথা অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করেন, তাঁহারা মথুরার লোক। তাঁহাদের ঠাকুর সুন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন, কি তেজোময় হউন, ইহাতে আইসে যায় না। যাঁহারা শুদ্ধ সাংসারিক উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার বাসনা করেন, তাঁহারা দ্বারকার লোক। তাঁহাদের ঠাকুরও যেরূপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শাক্ত মহাশয়গণের শ্রীদুর্গা যেরূপ, বৈষ্ণবগণের দ্বারকার কৃষ্ণ সেইরূপ। দুর্গা-পূজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহি, পুত্রং দেহি ইত্যাদি। দ্বারকার কৃষ্ণও সেইরূপ, ধনবর, পুত্রবর ইত্যাদি দিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা নিরাকারবাদী, অথচ বলেন, ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা, তাঁহাদের কথার মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাময় বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভগবানের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ত্ব না মানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে এই মাত্র বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার নিকটে ঘেষিতে পারি নাই, তিনি চিরদিন সমান দূরে ছিলেন।

আবার নাগর উপরি-উক্ত তিন প্রকার কেন, বহুপ্রকারের হইতে পারেন। এমন কি ব্রজের, কি মথুরার, কি দ্বারকার কৃষ্ণেরও নানা রূপ আছে, ইহা ক্রমে দেখাইতেছি।

সাতটি গৌণ রস, যথা—হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

১। হাস্য। ইহার অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, উদ্দীপক কৃষ্ণের বিদূষক। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে মধুমঙ্গল নামক একটি বিদূষক দিয়াছেন। ইনি একটী ব্রাহ্মণ যুবক, অত্যন্ত

পেটুক, দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেন। বড়াইকে দেখিয়া ডাকিনী ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হয়েন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিদূষক হয়েন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বিদূষক সাজাইয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দে আকুল হয়েন।

২। বীর। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা বীররস দ্বারা ভজন করেন, তাহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কখন কখন ভক্তগণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা শক্তি-উপাসক তাঁহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন। যেমন শুম্ভ-নিশুম্ভ কাহিনী ইত্যাদি।

৩। করুণরস। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্দাইয়া থাকেন, কখনও দয়াতে আর্দ্র করিয়া থাকেন। দুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, আর বৃন্দাবনে আসিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেই যশোমতী নানা কুচিন্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। তিনি ধনিষ্ঠা সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা পদ—

দুদিনের তরে, যাবে মথুরানগরে,
যাবার বেলা কেন কান্দিল ?

তিনি বলিতেছেন, "সখি! মথুরায় কৃষ্ণ গেল, কালি আসিবে বলিয়া গেল, তবে যখন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন কান্দিল কেন?" কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, তিনি আর আসিবেন না, আর এই কথা জননীর নিকটে গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জননীর নিকট বিদায় হয়েন, তখন ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, কান্দিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ভক্তগণ এই লীলা মনে করিয়া দ্রবীভূত হয়েন।

শ্রীভগবান কিরূপ স্নেহশীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার আর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তেরা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের করুণ-হৃদয় বর্ণনা

করিয়া ভক্তিতে গদগদ হয়েন। দেবকী কৃষ্ণকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া আনিয়াছেন। কৃষ্ণ অন্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাতে লইয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা মাগী যশোদা নাকি তোমাকে ননী খাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড় ভালবাসিতে। আজ আমি তোমাকে সেইরূপ ননী খাওয়াইব।" এই কথা বলিয়া ননী লইয়া কৃষ্ণের মুখে দিতে গেলেন, আর শ্রীভগবানের বদন একেবারে আন্ধার হইয়া গেল। কারণ তখন তাহার দুঃখিনী জননীর ও তাঁহার প্রেমের কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয় ও ঔদার্য্য দেখাইবার আর একটি মাত্র কাহিনী বলিব।

মুনিগণের মধ্যে বিচার হইতেছে, কে বড়—মহাদেব, ব্রহ্মা, না কৃষ্ণ? ইহা সাব্যস্ত করার ভার পাইলেন ভৃগুমণি। তিনি অগ্রে ব্রহ্মার ওখানে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আদর করিলেন, আর ভৃগু তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আসিলেন, পরে নারদের অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃগু পরে মহাদেবের ওখানে গমন করিলেন, যাইয়া "তুমি ভাঙ্গখোর, উলঙ্গ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য" ইত্যাদি বচনে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাদেব ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। আর ভগবতী তাঁহার হাত ধরিলেন।

পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ওখানে গেলেন। যাইয়াই তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভৃগুর হাত দুইখানি ধরিয়া অতি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, অবশ্য তোমাকে আমি উপযুক্ত সমাদর করি নাই। আমার কঠিন হৃদয়ে তোমাব কোমল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে।" ইহা

বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সেবা করিতে লাগিলেন। সেই ভৃগুপদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে একটি অতি সুন্দর শোভা হইল। ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যত ভূষণ আছে, তাহার মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন সর্ব্বপ্রধান।

৪। অদ্ভুত। এই রসের দ্বারা প্রধানতঃ নিরাকারবাদিগণ ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা নাস্তিক হইতে এক সিঁড়ি উপরে। তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠি, তাহা কেবল তাঁহার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লইয়া, সুতরাং তাঁহারা অদ্ভুতরসের সাহায্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া থাকেন। একটি কীট এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু যন্ত্রে দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুদ্র তবু তাহার জীবনযাত্রা দিব্য চলিতেছে। অমনি ভক্ত বলিবেন—অদ্ভুত! বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, এক সেকেণ্ডে একটি ধূমকেতু সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করে। অমনি ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন।

গৌণ-রসের মধ্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত দ্বারা শক্তি-উপাসকগণ (যাঁহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করেন) এইরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-উপাসক, সুতরাং তাঁহাদের গৌণরসের মধ্যে হাস্য আর করুণ ব্যতীত অন্য রসের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। শক্তি-উপাসকগণ শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমুদয় অভদ্র রসের কেন আশ্রয় লয়েন, তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না।* মনে ভাবুন,

* শক্তি-উপাসকগণ সাধনদ্বারা কুলকুণ্ডলিনী—যিনি নিদ্রিত আছেন,—তাঁহাকে জাগরূক করেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বলেন শ্রীমতীর কৃপালাভ করা, কি প্রেমলাভ করা। যাঁহারা কুলকুণ্ডলিনী জাগরূক করেন তাঁহারা অষ্টসিদ্ধি পান, আর যাঁহারা শ্রীমতীর কৃপালাভ করেন তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পান।

ভক্তের শ্রীভগবানের গলে মুণ্ডমালা, শিরোভূষণ সর্প ইত্যাদি। বীভৎস রস শ্রীভগবানের ভজনায় কিরূপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না। বীভৎস কি রৌদ্ররস দ্বারা যে শ্রীভগবানের ভজনা হইতে পারে, উহা আপাততঃ মনে ধরে না। কিন্তু আমরা চক্ষে দেখিতেছি, ভগবানের গলায় মুণ্ডমালা, গাত্রে মনুষ্যরক্ত ইত্যাদি। তবে বীভৎস-রস দ্বারা প্রকৃত ভজনা হয় না সে ঠিক। যাঁহারা এইরূপ ভজনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভগবদ্-প্রেম আহরণ নয়—শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা। বোধ হয় সেই নিমিত্ত তাঁহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় না।

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই। রসশাস্ত্রেব মর্ম্ম আমরা ভাষা-কথায় প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা ইচ্ছা করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল নীলমণি" পড়িতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রভু গম্ভীরা-লীলায় যে সমুদয় রসের চর্চ্চা করেন, তাহারই আলোচনা করা। এখানে মাথুরের পালা দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের মর্ম্ম প্রকাশ পাইবে।

ভক্তগণের ভজন স্থবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীলা দ্বারা অনেকটী পালা বিভক্ত হইয়াছে। যথা—পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, মাথুর, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড। এই সমুদয় প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন;—কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গম্ভীরায়। নদীয়ায় মাথুর, দান ও নৌকাখণ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব এবং গম্ভীরায় প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও মান। দানখণ্ড চন্দ্রশেখরের বাড়ী কৃষ্ণযাত্রার দিবস দেখান হয়, নৌকাখণ্ড তাহার পরে ও মাথুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বে আপনার বাড়ীতে। নীলাচলে যে রাস-রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। তবে এ সমুদয় আবার গম্ভীরায় আরো পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এখন মাথুরের পালা একবার

আলোচনা করুন। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মাথুরের পালা আরম্ভ করেন ;— তাহার পর শ্রবণ করুন—

অক্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবই পূরত পীরিত।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ লই যাও হে
ডারি মোরে শোকের কূপে।
কো পুন বারণ, বোলে নাহি ঐছন.
সব জন রহল নিচুপে ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রভু অক্রুর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, "হে অক্রুর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া যাও আমাকে শোকে ডুবাইয়া ?" আবার সঙ্গীগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করে রইলে, কথা কও না, কৃষ্ণকে যে নিয়া গেল দেখছ না ?" ইত্যাদি।

এইরূপ নৌকাখণ্ডের ও দানখণ্ডের পদ দ্বারা জানা যায়, প্রভু ঐ সমুদয় কিরূপে প্রকাশ করেন। রাখালরাজ মথুরার রাজা হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার নিকট ব্রজের গোপীগণ গিয়াছেন। দেখেন কৃষ্ণ রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। গোপীগণ বলিতেছেন, যথা গীত—

রাজসেবা বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না।
(আমরা) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন,
(শ্লোক শাস্ত্র) (তন্ত্র মন্ত্র) জানি না।

অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি কি রাজসেবা ভালবাস, তাহা যদি হয়, তবে আমাদের উপায় কি ? আমরা মূর্খ, কাঙ্গাল, আমরা রাজসেবা কোথা পাব ? আমরা বক্তৃতা দ্বারা, কি শ্লোক দ্বারা, কি রাজভোগ অর্থাৎ ভাল বসনভূষণ দ্বারা কিরূপে তোমার সেবা করিব ? পরে শুনুন—

রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা।
(আমরা) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না॥
আমাদের রাজপাট কদম্বতলা, সে বনের রাজা চিকণকালা,
রসসিংহাসনে রসের বালিস, শোয়াতাম তাকি জান না।
ব্রজে আমরা সবাই সরল, আমরা লৌকিকতা জানি না॥

এই গেল শ্রীভগবানকে রসের দ্বারা ভজন করা। গোপীরা বলিতেছেন, "ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমার খোসামোদ করে, তাই তুমি ভুলে যাও? তোমাকে হীরামুক্তা দেয়, আর তাই তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের যে সরল ভালবাসা, তাহা তোমার ভাল লাগে না? ছি।

ইহা শুনিয়া সভাসদগণ হাসিলেন, কৃষ্ণও সুখে মধুর হাসিলেন, কারণ তিনি সভাসদগণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর অসরল সভাসদগণ স্তুতিবাক্যে বড় মজবুত। স্বার্থসাধন নিমিত্ত মুখে কেবল 'দয়াময় দয়াময়' বলিতেছেন। মুখে 'পাপ পাপ' বলিয়া দৈন্য দেখাইতেছেন, কেন না রাজাকে তুষ্ট করিয়া কিছু স্বার্থসাধন করিবেন।* গোপীগণ ঠিক ইহার বিপরীত, তাঁহারা ইহার কিছুই করেন না। পরে তাঁহারা আবার বলিতেছেন, যথা পদ—

দে দে দে মোদের চূড়া দে।
(চূড়া ত মথুরার নয়) (চূড়া ত আমাদের দেওয়া)
(চূড়ায় মথুরা ভুলবে না।)
(চূড়া দে মুরলী দে) (শুন রাজেশ্বর হে)
আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দে।

জীব চিরদিন শ্রীভগবানকে রাজরাজেশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছে।

---

* আপনারা দেখিবেন জগতের ভগবান এইরূপ।

ব্রজগোপীগণ প্রথমে তাঁহার রাজমুকুট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া চূড়া দিলেন, হাতের দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মুরলী দিলেন। এখন মথুরায় তাঁহাকে রাজবেশে রাজ-পদে দেখিয়া গোপীগণ কাজেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন ; বলিতেছেন, "তুমি যদি রাজা হবে, তবে চূড়া, মুরলী আর আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও। কারণ উহাতে ত তোমার আর প্রয়োজন নাই। যেহেতু মথুরার লোক বাঁশীতে ভুলিবে না। তাহারা প্রেম চাহে না।" যাহাদের সর্ব্বদা ভয়, ভগবান তাহাদের উপর রাগ করিবেন। তাঁহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, করযোড় করিয়া কথা না বলিলে রাগ করিবেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানকে একটু প্রীতি করেন, তাঁহারা তাঁহার বদনে গাম্ভীর্য্য দেখিলে সেটা অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় ক্লেশ পান। কারণ তাঁহাদের ভগবান হাস্যময়, রসিক, করুণাময়, স্নেহশীল, প্রেমের কাঙ্গাল।

এখন শ্রবণ করুন, গোপীগণ তাহার পরে শ্রীভগবানকে কেমন বিদূষক সাজাইলেন। ব্রজগোপীগণ আবার বলিতেছেন,—"হে রাজ-রাজেশ্বর! আমরা তোমাকে ব্রজে ধরিয়া লইয়া যাইব। কারণ আমরা বুঝিতেছি যে, এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই।

সভাসদগণ। তোমরা পল্লীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমরা মূর্খ। তোমরা বলিতে পার যে ত্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের প্রাণে কি ভয় নাই? যাঁহার ইচ্ছায় এই ত্রিলোক নষ্ট হয়, তাঁহাকে এরূপ অপমান বাক্য বলিতেছ?

গোপী। আপনারা রাজাকে ভয় করেন, আমরা ভয় করি না, কারণ আমাদের কোন প্রার্থনা নাই। আমরা জানি উহার যে ক্রোধ সে হাস্যময়, তাহাতে ধার নাই। বিশেষতঃ উনি নিজ হাতে

এক দাসখত লিখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমাদের যে প্রধানা শ্রীমতী, তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য উনি তাঁহার দাস হইলেন। সেই খতের বলে, আমরা শ্রীমতীর দাসকে ধরিয়া লইয়া যাইব।

কৃষ্ণ। বোধহয় এ তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমি দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না।

গোপী। এই দেখ তোমার দাসখত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে।

কৃষ্ণ। তোমরা যে মিথ্যাবাদী তাহা এই এক কথায় ধরা পড়িয়াছ। কারণ আমি আদৌ দস্তখত করিতে জানি না। সে অতি লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে আমার সুবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে গরু রাখিতাম, পাঠশালায় যাইবার সময় কোথা? তবু একবার গিয়াছিলাম, বেশী দূর শিখিতে পারি নাই। প্রথম আখর 'ক' হইতে বেশ লিখিলাম। তাহার পর যখন 'ধ'-এ আসিলাম, তখন গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। একটার আঁকড় ডাহিনে, অপরটার বাঁয়ে,—এই আমার গোল বাধিয়া গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পারি না, কোনটা "ক" আর কোনটা "ধ"। তাহার পরে এখন রাজা হইয়াছি, লেখাপড়া শিখিবার আর এখন প্রয়োজন নাই।

উপরে কৃষ্ণ-যাত্রার যে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণ উপরের কথাগুলি অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেন। তিনি বলেন কিনা, "আমি শ্রীভগবান, ক আর ধ ঠিক করিতে না পারিয়া বর্ণমালা শিখিতে পারিলাম না। আর তখন দর্শক সভাসদগণ হাস্যরসে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েন, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় আকর্ষণ বাড়ে।

এই কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। গোপীগণের সহিত মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণের যখন এইরূপ বাকবিতণ্ডা হইতেছে, তখন তাঁহার রাণী কুব্জা তাঁহার বামে বসিয়া এ সমুদয় শুনিতেছেন। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন। কারণ তিনি রাজ-রাজেশ্বরের পত্নী, সুতরাং যখন মলিনবসনা গোপীগণ আসিয়া কৃষ্ণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন, মহারাজের এই সমুদয় নীচ লোকের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করা তাঁহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, মথুরাবাসিগণকে গোপীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্রকৃতই কুব্জা উহা দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কৃষ্ণের অগ্রে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, যথা পদ—

এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন।
যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ ॥
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র, জানি না হে রাধাকান্ত,
এ দাসীরে না হইও ভ্রান্ত।
কোরো না হে অন্য যুক্তি' চাই না কিছু মোক্ষ মুক্তি,
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন ॥
যেন, জন্ম হয় গোপকুলে বৃন্দাবনে বসতি।
রাধাকৃষ্ণ মনাভীষ্ট হই না যেন বিস্মৃতি ॥
কিঞ্চিৎ করি যাচিঞা তব নেত্র ভ্রূভঙ্গে।
চিরদিন থাকি যেন সঙ্গে ॥
শ্রীরাধারে লয়ে বামে, বসবে যখন নিধুবনে,
কৃপা করি এ অধনীর মাথায় দিও শ্রীচরণ ॥

মথুরার রাজা, কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন, দণ্ডধারী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু কুব্জা তাঁহাকে তখন নন্দের নন্দন বংশীবদন বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, অর্থাৎ কুব্জা সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ব্রজের গোপীভাব পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, তুমি বৃন্দাবনে থাকিতে চাও সেখানে ত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি দরিদ্র। বিশেষতঃ দেখিলে ত তাহারা পল্লী গ্রামের লোক, তাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই।

কুব্জা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি আমি হতভাগ্য, আর তাঁহারা ভাগ্যবতী। আমি যথেষ্ট ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা ধনীকে পাইয়াছে। আমি ধন পাইয়াছি, ধনীকে পাই নাই,—পাইবার চেষ্টাও করি নাই।

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। যথা—প্রথম তত্ত্ব এই যে, রসাশ্রমে কিরূপ শ্রীভগবানকে ভজনা করা যায়? দ্বিতীয়, ভজনা মানে কি? তৃতীয়, মথুরার ও ব্রজের ভজনের বিভিন্নতা কি? ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়

মান

এইরূপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁহার অনুগত নাগরী অগণন। আর তাঁহাদের সকলের সর্ব্বস্ব তিনি, কাজেই মান হইবার কথা। মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করায় গোপীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায় না। কারণ, মানের ভিত্তিভূমি প্রেম। যেখানে প্রেম, সেখানে মান। না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িকা কৃষ্ণের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাঁহাকে কটু বলেন, তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত, কি শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রাণ।

গম্ভীরায় প্রভু বসিয়া আছেন, বদন অতি প্রফুল্ল। স্বরূপ রামরায় মনে মনে ভাবিতেছেন যে, না জানি প্রভু কি ভাবে বিভাবিত। এমন সময় প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, "সখি! বড় শুভ সংবাদ, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, শীঘ্র তাহার আয়োজন কর।" এখন, 'প্রিয়তম', রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন কি? তাহার আয়োজন শয্যা প্রভৃতি। প্রভু বলিতেছেন, "শীঘ্র কুসুমচয়ন কর, চন্দন চুয়া সংগ্রহ কর, মালতীর মালা গাঁথ। দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণ বড় পাখীর গীত ভালবাসেন, বৃন্দাবনে শুকসারিকে সংবাদ দাও। তাহারা এই কুঞ্জ ঘিরিয়া বসুক। বন্ধু আইলে তাহারাই

অগ্রে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে। আর ময়ুরময়ুরীর নৃত্য নিতান্ত প্রয়োজন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "আমি আর তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরা ত জানো। কৃষ্ণ আসিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত বাসব-সজ্জা কর।" ইহাকে বলে 'বাসক-সজ্জা'। ইহার একটি গীত শ্রবণ করুন।

শ্রীমতী বলিতেছেন—

সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
"কুসুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া,
গাঁথহে মালতী মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
গাঁথহে কদম্ব মাল॥
যমুনার বারি, পুরি হেম ঝারি,
রাখহে শীতল করি।
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জে বসুক ঘেরি॥

হে কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীভাবে অভিভূত পাঠক! এইরূপ হৃদয় মাঝারে বাসক-সজ্জা করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত বসিয়া থাকিও। তিনি আইলেও পারেন, না আইলেও পারেন। কিন্তু আসুন আর না আসুন উভয়েতেই তুমি আনন্দ পাইবে, এবং কিছু প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

স্বরূপ, প্রভুর ভাবের সহানুভূতি করিয়া বলিতেছেন, "বেশ! আমরা

বীণার স্থর বান্ধি। কিন্তু শ্রীমতি! সর্ব্বাগ্রে তোমার বেশভূষা করা উচিত। তোমাকে এমন ভুবন মোহিনীরূপে সাজাইব যে বন্ধু একেবারে মোহিত হইবেন।" প্রভু (রাধাভাবে), "না না, আমাকে সাজাইতে হইবে না। আমার ত সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে, আর ভূষণের স্থান কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই।" যথা পদ—

শ্যাম পরশমণি সখি তা কি জান না।
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণা॥

প্রভু বলিতেছেন, "যাঁহার পরশমণির পরশ হয়েছে, তাহার আবার ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস আমি ছিলাম লোহা, আর তিনি পরশ করিয়া আমাকে সোণা করিয়াছেন।" স্বরূপ বলিলেন, "তবু নয়নে, হস্তে, কর্ণে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব।" প্রভু বলিতেছেন, "আমার গলার ভূষণ ত আছে, সে শ্যাম-নামের হার।" যথা পদ—

আমি পরেছি শ্যাম-নামের হার।
হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন।
বদনের ভূষণ আমার শ্যাম-গুন-গান॥
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন॥
যদি তোরা সাজাবি মোরে।
কৃষ্ণনাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে॥*

প্রভুর মুখে একটু দুঃখের ছায়া দেখিয়া স্বরূপ বুঝিলেন যে, কৃষ্ণের

*এই পদটী প্রভুর নিজের বলিয়া খ্যাত।

আসিবার বিলম্ব তাঁহার আর সহিতেছে না। তাই প্রভুর সে ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত স্বরূপ এই গীতটী গাহিলেন।—

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে রসিয়া।
পালটী চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥

স্বরূপ প্রভুকে বলিতেছেন, "কেমন সখি, তাহাই করিতে পারিবে তো?"

প্রভু প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন, বলিতেছেন "ভাই! ও সব তোমাদের কাজ, আমার চপলতা ভাল আইসে না। আমি—

গাঢ় আলিঙ্গনে, ঘন ঘন চুম্বনে,
ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ।

"কৃষ্ণ এখনি আসিবেন, ব্যস্ত হইও না"—এই যে সখীর আশ্বাসবাক্য, ইহাকে বলে 'বিপ্রলব্ধা'। কিন্তু প্রভুর মুখে আবার দুঃখের ছায়া দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না; প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন; শেষে, মৃদু স্বরে "উহু উহু" আরম্ভ করিলেন। এই "উহু উহু" ক্রমেই ফুটিতে লাগিল। শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্লেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্বরূপ ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "সখি! কই, কই তিনি?" স্বরূপ বলিতেছেন, "ধৈর্য্য ধর, এই এলেন বলে।"

প্রভু বলিলেন, "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই", ইহা বলিয়া স্বরূপের জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আবার তখনি উঠিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,—"সখি! কই? কই? তিনি কই? তিনি কি আসিবেন না? সখি! আমার সেই চন্দ্রবদন কোথা সখি! কোথা আমার চিত্তচোর, কোথা আমার রাসবিহারী, কোথা আমার নৃত্যকারী? ইহাই বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ নানা রূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রভু

একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, একবার উঁকি মারিতেছেন, একবার বাহিরে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভাবে অভিভূত পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হইলে ঐরূপ অধৈর্য্য হইও, তাহা হইলে তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ইহাকে বলে 'উৎকণ্ঠিতা'। প্রভুর তখন কি দশা হয়েছে; না—

পড়ে পাতের উপরে পাত,
ঐ এল প্রাণনাথ—

বলিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কোন একটি শব্দ হইলেই অমনি "ঐ বুঝি এলেন", বলিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ আসিবার আশা ভরসা গেল, তখন চণ্ডীদাসের পদ—

দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায় 'পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনি।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শব্দ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহিল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেষ বিছাইনু ফুলে।
সব হইল বাসি আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে ॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিয়া, পরে যখন তিনি আইলেন না দেখিয়া রাগ করিয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিবে, তখন রসিকশেখর শ্রীমতিকে যাহা কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে স্তুতি-বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদূর না করুন সেইরূপ কিছু করিবেন।

হে পাঠক! রসের ভজন শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানকে "রক্ষমাং পাহিমাং" বলিয়া ভজন করিয়া থাকে। এখন দেখুন, সেই জীব আপন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন! প্রভু তখন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন—"ঐ দেখ আসিতেছেন" অমনি বদন প্রফুল্ল হইল; মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহা ভাসিয়া গেল। তখন প্রভু চুপে চুপে স্বরূপকে বলিতেছেন, "ঐ দেখ বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন; আসিতে সাহস হইতেছে না।" তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"এসো বন্ধু, তুমি সচ্ছন্দে এসো, আমি রাগ করিব না। যে দুঃখে রজনী কাটাইয়াছি তাহা আমার প্রাণ জানে। বল দেখি রজনী কোথা বঞ্চিলে?" আবার বলিতেছেন, "একি! তোমার বদনে তাম্বুলের দাগ কেন? ওমা এ আবার কি "ভয়ানক! তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি. তুমি আমাকে বঞ্চিয়া আর কোথায় ছিলে। আর সেই পাপীয়সী আপনার সুখের নিমিত্ত তোমার বদনে দন্তাঘাত করিয়াছে। ছি! ইহা বলিয়া প্রভু মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, অর্থাৎ রাধা 'মান' করিলেন।

এখানে চণ্ডীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে সখিগণ শ্রীভগবানকে কিরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন তাহা বর্ণিত আছে। এই রসকে 'খণ্ডিতা' বলে।

ছাড়হে চাতুরী ও নাগর রতিচোর।
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর ॥
কোন ধনি উঠাইল নব অনুরাগ।
চুম্বন দেওল (চাঁদ বদনে) তাম্বুল দাগ ॥

তাহার পরে বিদ্রূপের ছটা দেখুন। তাই চণ্ডীদাস প্রভুর এত প্রিয়, তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্ডীদাসের ন্যায় কবি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

শুন শুন বঁধু তোমায় বলিহারী যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজলের শোভা।
ভালে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনলোভা ॥
হাদে হে নিলাজ বঁধু, লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী, কোন লাজে এস ॥
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে, এ হেন পীরিতি ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

দেখুন, পরাৎপর-পরমেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয়-অধীশ্বরের লাঞ্ছনা দেখুন। ভাল, তিনি কি এইরূপ বিদ্রূপে রাগ করেন? আপনি

বলেন কি? চণ্ডীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্তি করিয়াছেন যথা—

বড় দুঃখ পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাসের হিয়ায় শোও হে আসিয়া॥

চণ্ডীদাস চড় চতুর, এই উদ্‌যোগে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে পুরিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "সখি, উহাকে যেতে বল, আমি উহাকে চাহি না।" প্রভু রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের কথা বন্ধ করিয়া সখীকে বলেতেছেন, "আমি উহাকে চাহি না। আমি তাহা হইলে মরিব, বলিতেছ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল, এরূপ নাগর আমি চাই না।" প্রভু তখন দেখিতেছেন, যেন কৃষ্ণ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ মুঞ্চময়ীমানমনিদানং, পড়িয়া তাঁহাকে তুষিতেছেন। তখন কৃষ্ণকে বলিতেছেন "তুমি এই জয়দেবের শ্লোক যেখানে রজনী বঞ্চিয়াছ সেখানে যাইয়া পড়, এখানে কেন?

পরে কৃষ্ণ কোনক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তখন "কালহান্তরিতা" রসের সৃষ্টি হইল। কৃষ্ণ গেলে তখন শ্রীমতী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, যথা—

"সখি, যাবার বেলা কেন্দে গেল।
আর ত ফিরে নাহি এলো॥"

পূর্ব্বে মাথুর-লীলার কথা বলিয়াছি। এখন মান-লীলার কথা বলিলাম। ইহা ব্যতীত অন্যান্য লীলার আভাস দিতেছি, যথা—আপনি কাণ্ডারী হইয়া ব্রজগোপীকে পার করিতেছেন। গোপীগণ কূলে দাঁড়াইয়া কাণ্ডারীকে বলিতেছেন—

আমাদিগে পার করে দে।
ও সুন্দর নেয়ে হে। ধ্রু।
আমাদের বেলা গেল সন্ধ্যা হলো,
আমাদের বিকি কিনি সারা হলো,
মোদের পারের কড়ি দিবার নাই।
পার কর বাড়ী যাই॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে প্রচার করেন, তখন বলিয়া বেড়াইতেন, "আমাদের গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।"

অর্থাৎ হে জীব! আমাদের প্রভুর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি লাগে না।

আর একটি লীলা—'দানখণ্ড'। গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন, "তোমরা বৃন্দাবনে যাইবে, তোমাদের দান কই? দান না দিলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না।"

গোপীগণ। আমাদের দান দিবার মত কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া, ভক্তগণ নানা রসে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। কখন কাণ্ডারী ভাবে, কখন মহাদানী ভাবে, কখন নানাবিধ নাগরভাবে তাঁহাকে ভজন করেন। ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ কবিগণ এই সমুদয় চিত্তহরণ-কীর্ত্তন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম দাস শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন—

সাধন-কণ্টকী পথে ফুল ছড়াইলে।

অর্থাৎ মহাপ্রভু ভজন সাধন অতি সুখকর করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এসব কি সত্য হইয়াছিল, না কল্পনার সৃষ্টি? যে ভাগ্যবানেরা শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা বলেন,—সব সত্য হইয়াছিল। যাঁহারা না মানেন, তাঁহারা বলেন,—এ সমুদয় কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণ করুন। এই সমুদয় লীলা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত। অতএব ইহা সত্য কি কল্পিত তাহাতে আসে যায় না। বিবেচনা কর মান-লীলা। ইহা আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নানা ভাবে সাজাইয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায়। আর ওরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করার ফল—কৃষ্ণপ্রেম, যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলারই উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, আর ভগবান লীলাময় না হইলে তাঁহার সহিত এরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায় না।

কিন্তু যদি প্রকৃতই এই সমুদয় লীলা ভক্তগণের সৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভু সমুদয় কৃষ্ণলীলার সাক্ষী দিয়া উহা সত্য করিয়াছেন।

দশম অধ্যায়

প্রভুর অবস্থা

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়, জাগিয়া রজনী পোহায়।
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে কই নহি রহু পহু পাশে।
খেনে কান্দে তুলি দুই হাত, কোথায় আমার প্রাণনাথ।
নরহরি কহে মোর গোরা, রাইপ্রেমে হলো মাতোয়ারা॥

শ্রীভগবানের প্রেম জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য ধন। শাস্ত্রে দেখি যে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া জীবকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সার্ব্বভৌম প্রথমে যখন প্রেমে অচেতন অবস্থায় প্রভুকে দেখিলেন, তখন মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—"শাস্ত্রে যে ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিয়াছি তাহা তবে সত্য।" প্রভু এ পর্য্যন্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর তাহা রহিল না। যখন প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে আইলেন, তখনও তাঁহার পদতল পদ্মফুলের মত, আর তাঁহার অঙ্গ দিয়া চিরদিন যেমন হইত, সেইরূপ পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্দ্রপুরী আসিয়া প্রভুর ভোজন কমাইয়া দিলেন। প্রভু অগ্রে একপ্রকার উপবাস করিতেছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া অর্দ্ধভোজন আরম্ভ করিলেন। প্রভু অর্দ্ধভোজন করিয়া প্রাণ রাখিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল হইলেন। বাসুদেবের এই সম্বন্ধে একটী পদ আছে, যথা—

সিংহদ্বার ছাড়ি গোরা সমুদ্র-পথে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে সুধায়॥
অতি দুরবল দেহ ধরা নাহি যায়।
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমি গড়ি যায়॥
দীঘল শরীর গোরা পড়ে মূরছায়।
উত্তান নয়ন মুখে ফেন বহি যায়॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

এই একটি পদ বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ভগবৎপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে। মন্দিরের সিংহদ্বার ছাড়িয়া

প্রভু সমুদ্র-পথে চলিলেন। যাইতে সম্মুখে একজনকে দেখিলেন। দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার?" সে প্রথমে অবাক, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভুর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটি অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই মাত্র মরিয়াছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার অমুক কোথা বলিতে পার?" তাহার মুখে যেরূপ অবর্ণনীয় দুঃখের চিহ্ন দেখা যায়, প্রভুর মুখও সেইরূপ দুঃখের ছায়াবৃত। সেই পুত্রশোকাকুলিত মাতার প্রশ্নে লোকে যেরূপ কান্দিবে, এ স্থলেও সেই লোকটি প্রভুর প্রশ্নে সেইরূপ কান্দিল। একটু পরে প্রভু সম্মুখে আর একজনকে দেখিয়া তাহাকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেও ঐরূপ কান্দিল। প্রভু এইরূপে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ও কান্দাইতে কান্দাইতে চলিয়াছেন। প্রভুর বদনে ঘোর বিয়োগের রেখা পড়িয়াছে, গলা শুষ্ক হইয়াছে, কথা বলিতে পারিতেছেন না।

এদিকে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, এমন দুর্ব্বল যে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়। অতি দীর্ঘকায়, তাহাতে অতি দুর্ব্বল, হাঁটিতে পা কাঁপিতেছে। হৃদয়ে বিষের ন্যায় জ্বালা, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার দিব্যচক্ষু হইয়াছে, নয়নতারা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখ দিয়া ফেনা বাহিয়া পড়িতেছে, আর কণ্ঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। বাসুদেব বলিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হইবার কথাই বটে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উপরে ঐ চিত্রটি দিলাম।

বিবেচনা করুন যাঁহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতান্ত নিষ্ঠুর না হয়েন, তবে তিনি এরূপ ভক্তের অনুগত হইবেন। এইরূপ আর একটি লীলার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি, এখানে উহা বিবরিয়া বলিতেছি। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার স্তবাবলীতে উক্ত লীলাটী এইরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন প্রভু মন্দির দর্শনে গিয়াছেন। দ্বারী আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রভু তাহাকে বলিতেছেন, "হে সখে! আমার প্রাণকান্ত কৃষ্ণ কোথা, তাঁহাকে আমায় শীঘ্র দেখাও।" প্রভু উন্মাদের ন্যায় এই কথা বলিলে, মূর্খ দ্বারীর হৃদয়ে সরস্বতী প্রবেশ করিয়া, তাহার দ্বারা এইরূপ বলাইলেন, যথা—"প্রভু আপনি আসুন, আপনার প্রিয়তমকে শীঘ্র দর্শন করাইতেছি।" দ্বারী ইহা বলিলে, প্রভু অমনি তাহার হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "তবে আমাকে লইয়া চল, তাঁহাকে দেখাও।" দ্বারী তাঁহাকে জগন্নাথের সম্মুখে লইয়া চলিল, যাইয়া বলিল, "ঐ দেখুন আপনার প্রাণকান্ত।"

পুত্র যাহার প্রাণ, এরূপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্মাদ হইতে পারেন, এমন কি তাঁহার এমন ভ্রমও হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "আমার পুত্র কোথা, তাহাকে কি দেখেছ?" এমন শোকাকুলা জননীও শোকের কিছুকাল পরে সান্ত্বনা লাভ করিবেন, করিয়া সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। প্রভুর এই যে "আমার কৃষ্ণ কোথা"—এই অন্বেষণে প্রভুর চীরজীবন গিয়াছে, আর যতই অন্বেষণ করিয়াছেন, ততই এই তল্লাসস্পৃহা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাকে বলে 'কৃষ্ণপ্রেম'। প্রভু যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম দেখাইয়াছেন এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। স্ত্রী স্বামীর নিমিত্ত নয়, জননী পুত্রের নিমিত্ত নয়, আর কোন কবিও এরূপ প্রেম কল্পনা করিতে সমর্থ হন নাই।

উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘষার কথা আছে। এই শির-ঘষা লীলা ভক্তগণ ভালবাসেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে প্রভু এ লীলা না করিলেই পারিতেন। যাহা হউক এ লীলার কিরূপে সৃষ্টি হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন যে, প্রভুর নাসিকা ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন ব্যথিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কি? ইহা কিরূপে হইল?" ইহাতে প্রভু একটু লজ্জিত হইলেন, আর স্বরূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন; শেষে বলিলেন, "উদ্বেগে গৃহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু যাইতে পারি না, দ্বার তল্লাস করিয়া বেড়াই, কিন্তু অন্ধকারে দ্বার পাই না, তাই নাসিকাতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।"

কথা এই—প্রভু কৃষ্ণবিরহে জরজর। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা যাইবেন, কি করিবেন, কোথা যাইয়া বিরহ যন্ত্রণা হইতে শান্তি পাইবেন, এই তখনকার চেষ্টা ও মনের ভাব। চরিতামৃত বলেন—

এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্য হা হা হুতাশ ॥
কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥

এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা। দিবানিশি হা হুতাশ, দিবানিশি অস্থির শান্তিহীন। রাত্রিতে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলে, হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবিরহানল জ্বলিয়া উঠিল,

অমনি প্রভু উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা হইতেছে বাহিরে গমন করেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দ্বার পাইতেছেন না। ইহার ফলে নাসিকায় আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর এই যে কৃষ্ণবিরহ ইহা সত্য না কাল্পনিক? যদি তাঁহার কৃষ্ণবিরহ প্রকৃত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরূপ কোন রঙ্গভূমিতে প্রভু-সাজিয়া কৃষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত না। কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ হয় তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই আশ্চর্য্য। কথা এই, প্রভুর নাসিকায় যে আঘাত লাগিয়াছিল ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত একটি পরিমাপক যন্ত্রেরও কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর কৃষ্ণবিরহ কতখানি, এই ক্ষত দ্বারা তাহার কতক পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যখন স্বরূপ নাসিকা ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তখন উপায় স্থির করিলেন। সেই অবধি প্রভুকে আর একাকী শয়ন করিতে দেওয়া হইত না। প্রভুর পদতলে শঙ্কর সেই গম্ভীরায় শয়ন করিতেন। প্রভু একখানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রভুর পদ দু'খানি আপনার হৃদয়ে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটী পদ শ্রবণ করুন।*

সে যে মোর গৌরকিশোর। মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর॥
সোনার বরণ তনু হইল মলিন। দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
বচন না নিকসয়ে সে চাঁদবদনে। অবিরল ধারা বহে অরুণ-নয়নে॥
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া। পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মরিয়া॥

---

* কৃষ্ণবিরহে প্রভুর কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা এই ভক্তগণ যাহারা দিবানিশি সঙ্গে থাকিতেন, তাহাদের দ্বারা জানা যায়।

একাদশ অধ্যায়

গম্ভীরা লীলার পূর্ব্বাভাস

রজনি জাগিয়া গোরা থাকে।
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়।
চঞ্চল লোচনে সদা চায় ॥
নমিত বদনে মহী লিখে।
আঁখি-জলে কিছুই না দেখে ॥
লোচন বলে এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক না বুঝয়ে মূঢ় ॥

রথ উপলক্ষে যখন নদীয়ার ভক্তগণ নীলাচলে আসেন তখন প্রভু সম্পূর্ণ চেতন থাকেন। কিন্তু তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিলে প্রভু আবার বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার এই অবস্থা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দিনের বেলা যে চেতনটুকু থাকে, সন্ধ্যা হইলে সে টুকু যায়। সন্ধ্যার বিহ্বলতা, রজনী বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাড়িতে থাকে। স্বরূপ ও রামরায় প্রত্যহ ভাবেন যে, অদ্য রাত্রি কি করিয়া কাটাইবেন। গম্ভীরায় প্রভু না জানি হৃদয়বিদারক লীলা করেন। উভয়ের, বিশেষতঃ স্বরূপের চেষ্টা এই যে, প্রভুকে সচেতন রাখিবেন, সেই জন্য নানা কথা বলিয়া প্রভুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু উপরোধে দুই এক কথার উত্তর দিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাণ মন শ্রীকৃষ্ণে। সন্ধ্যা যত ঘনাইয়া হঠাৎসিতেছে. প্রভুর বিহ্বলতা ততই বাড়িতেছে। আর স্বরূপ কি

রাম রায় নানা উপায়ে প্রভুকে অচেতন হইতে দিতেছেন না। যাহারা অহিফেন সেবনে প্রাণে মরে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে অচেতন হইতে না দেওয়া। তাই রোগীকে শুইতে কি বসিতে দেওয়া হয় না—হাঁটাইয়া লইয়া বেড়ান হয়। এইরূপ নানা উপায়ে তাহাকে চেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

স্বরূপ ও রামরায় প্রভু সম্বন্ধে তাহাই করিতেছেন। প্রভুর যে কথায় রুচি আছে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রভু যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর হৃদয়ে যতই প্রবেশ করিতেছেন, প্রভুর বাহ্য-জগতের সহিত সম্বন্ধ ততই লোপ পাইতেছে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারেন, স্বরূপ তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া স্বরূপ কিছুকাল প্রভুকে সচেতন রাখিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ পারিলেন না। পরিশেষে না পারিয়া ক্ষান্ত দিলেন আর প্রভু একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

আবার যখন প্রভু একান্তই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাদের চেষ্টা হইল প্রভুর হৃদয়ে দুঃখ-রস আসিতে না দিয়া, বরং যাহাতে আনন্দ-রস আইসে তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করা।

প্রভুর বিহ্বলতা কিরূপ, বলিতেছি। তিনি স্বরূপকে ভাবিতেছেন সখী ললিতা, আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই লীলা অতি গোপনে হয়। সুতরাং উহার বিবরণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। তবু ইহা বিবরিয়া লিখিতে আমার অসাধ্য বোধ হইতেছে না, কারণ প্রভুর অনেক সঙ্গী-মহাজনের পদের সাহায্য পাইতেছি, স্বরূপের কড়চার সাহায্য পাইতেছি, আর রঘুনাথ দাসের বর্ণনা হইতে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ যে অলঙ্কৃত

করিয়াছেন, তাহাও পাইতেছি। চরিতামৃত এই কড়চার কথা এইরূপ বলিতেছেন—

"স্বরূপ গোসাঞির মত রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।"

আমারও সেই কথা। আমি এই ভুবনপাবন ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে দিয়া লিখিতেছি, আমারও কোন দোষ নাই। আর এক কথা জানিবেন, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে প্রভুর কৃপায় তাহার হৃদয়ে নানা গূঢ় কথা স্ফূর্ত্তি হয়।

যখন প্রভু একবার অচেতন হইলেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া গম্ভারার ভিতরে অর্থাৎ কুটিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। অতি মলিন আসনে প্রভুকে বসাইলেন, আর সম্মুখে স্বরূপ ও রামরায় বসিলেন। প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রভু এই প্রদীপের সাহায্যে স্বরূপের ও রামরায়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। যেন চেন চেন করিতেছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা প্রভুব মুখ দেখিয়া বুঝিতেছেন যে, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রভুর হৃদয়ে বিরহ-বেদনা সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে, আর তিনি সর্ব্বদা তাহাই আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু প্রভু সেই ভাবের কথা বলিতে গেলেই, স্বরূপ ও রামরায় সে ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিরূপে বলিতেছি। প্রভু ধীরে ধীরে আপন মনে কথা বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে যে দুইজন বসিয়া আছেন, তখন তিনি আর তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছেন না, যেন আপন মনে বলিতেছেন, "ছি! ছি! এমন পিরীত কি কেহ কখন করে? আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। হায়! হায়! আমি অবলা এত কি জানি!" এই "প্রলাপ" বাক্য শুনিবামাত্র স্বরূপ বুঝিলেন যে, প্রভুব বিরহ-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।

তাই প্রভুর হৃদয়ে সেই রস না আসিতে পারে ও প্রভুর মন হইতে দুঃখ-রস বিতাড়িত হয়, এই নিমিত্ত স্বরূপ পূর্ব্বরাগের একটি গীত ধরিলেন। স্বরূপেব ন্যায় গায়ক জগতে কাহারও হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কাবণ, প্রভু গোলক হইতে যে "অনর্পিত ভাব" আনিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। আর সেই হইতেই আমাদের দেশে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরূপ পূর্ব্বরাগের গীত ধরিলেন, তাহাতে শ্রীমতী রাধা কিরূপে প্রথমে প্রেমডোরে আবদ্ধ হয়েন তাহা বর্ণিত আছে। মনে থাকে যেন,—বিরহে দুঃখ, মিলনে সুখ; কিন্তু পূর্ব্বরাগে মিলন-সুখ হইতেও অধিক আনন্দ। স্বরূপ পূর্ব্বরাগের গীত আরম্ভ করিলেন। যথা পদ—

"আমি কি হেরিলাম নীপমূলে।
আমার মন প্রাণ কাড়ি নিলে গো॥
হিয়ায় আমার রূপ জাগে।
সংসারে না মন লাগে গো॥"

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভু অমনি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বারাগে বিভাবিত হইয়া তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। তখন স্বরূপ গান রাখিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার যে প্রীতি ইহা কিরূপে হইল বল দেখি?" তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রভুকে উত্তপ্ত বিরহ-বালুকা হইতে শীতল পূর্ব্বরাগ-রূপ সরোবরে লইয়া যাইবেন।

অমনি প্রভু বলিতেছেন, "আহা, কি সুখের দিন! আর কি সে দিন আসিবে! আমি জল আনিতে যমুনায় যাইতেছি, তা কি জানি যে আমার সম্মুখে এই ঘোর বিপদ? দেখি কি যে, একজন পরম সুন্দর পুরুষ কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া!" বলিতে বলিতে প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণের রূপ

স্ফূর্ত্তি হইল, তাঁহার বদন আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া স্বরূপ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তাঁহার কি প্রকার রূপ ভাল করিয়া বল।" তখন প্রভুর সহস্র জিহ্বা হইল। কৃষ্ণের আপাদমস্তক বর্ণন করিতে লাগিলেন। আর ঝলকে ঝলকে আনন্দ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন, আর সেই আনন্দে তাঁহারা তিন জন ভাসিয়া চলিলেন। স্বরূপ ও রামরায় তখন ভাবিলেন যে, প্রভুকে এ রজনীর বিরহ-যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইয়াছেন। প্রভু রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাঁহার নয়নে আনন্দধারা পড়িতেছে, আর মুখে এরূপ কমনীয় ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, উহা দেখিলে ভুবন মোহিত হয়। এইরূপে নিশি যখন দ্বিপ্রহর হইল, তখন নানা উপায়ে প্রভুকে শয়ন করাইয়া রামরায় বাড়ী গমন করিলেন, আর স্বরূপ প্রভুর নিকটে তাঁহার আপন ঘরে শয়ন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

নায়ক বর্ণনা

পূর্ব্বরাগ-রসাস্বাদন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এমন কি জীবনে কোন না কোন এক সময়ে জীবমাত্রই এই রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন। মিলন-সুখ-রসাস্বাদন করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহ-রসাস্বাদন করা (যাহা জীবের সর্ব্বপ্রধান ভজন) মানুষের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। অন্ততঃ একমাত্র প্রভুই এই

রসাস্বাদান করিয়াছেন দেখা যায়, আর কেহ যে ইহা করিতে পারিয়াছেন তাহা জানা যায় না। এই কৃষ্ণ-বিরহ সর্ব্বাপেক্ষা দুরারাধ্য ও কুটিল গতি বলিয়া প্রভু প্রায় দ্বাদশ বৎসর ইহাতে নিমগ্ন ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার গম্ভীরা-লীলা বলিতে, কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা নানাপ্রকারে প্রকাশ করা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নায়ক বহু প্রকার আছে, কিন্তু সে সমুদায়ের সহিত আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। আমাদের কার্য্য ব্রজের নায়ক লইয়া, অর্থাৎ যিনি প্রেম বিকিকিনি করেন; আবার ইহাও বলিয়াছি যে, এই ব্রজের নায়ক একপ্রকার নহেন। এই ব্রজের নায়ককে নানা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার একরূপ নায়কের ভজন অন্য নায়কের ভজন হইতে পৃথক। সুতরাং এক ব্রজের নায়কেরই ভজন বহু প্রকারের আছে। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রজের নায়কের ভিন্ন ভিন্ন ভজন-প্রণালী প্রভুর আস্বাদ করিতে, কি স্বরূপ ও রামরায়কে দেখাইতে, যে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, সে জন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

এই ব্রজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নায়কগণের প্রত্যেকের কিরূপ ভজন তাহা আমাদের বর্ণনা করিবার স্থান নাই, শক্তি নাই, এক প্রকার প্রয়োজনও নাই। আমরা এইরূপ দুই চারিটি নায়কের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বর্ণনা করিব, যাঁহাদের প্রকৃতি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব। যাঁহারা আরো বেশী জানিতে চাহেন, তাঁহারা 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থ পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটী নায়কের কথা বলিতেছি, যথা—অনুকূল, দক্ষিণ, ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত, শঠ, ধৃষ্ট ইত্যাদি।

অনুকূল নায়ক।

ইনি প্রেয়সীর নিতান্ত বাধ্য। ইহার মন অন্য কোন রূপবতী কি গুণবতী বিচলিত করিতে পারে না।

দক্ষিণ নায়ক।

সকল নায়িকার প্রতি ইহার সমান ভাব। মনে ভাবুন রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিত সমানভাবে বিহার করিতেছেন। তখন তিনি 'দক্ষিণ শ্রেণীর নায়ক'। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীর মান হইল। পরে সকল গোপী ত্যাগ করিয়া যখন শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন, তখন তিনি অনুকূল নায়কের কার্য্য করিলেন।

শঠ নায়ক।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী রাধা। কারণ রাধার প্রেমে মলিনতা নাই, আর তাঁহার প্রেমে শ্রীভগবান্ স্বয়ং পাগল। মনে ভাবুন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রাবলী ধরিলেন; ধরিয়া "কোথায় যাও, আমার কুঞ্জে এস" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ কত প্রকার চাতুরী করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—চন্দ্রাবলী তাঁহাকে ধরিয়া নিজ কুঞ্জে লইয়া চলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ করেন কি, বলিতেছেন, "তুমি আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? তোমার ন্যায় প্রেয়সী আমার কে আছে বল? আর যত দেখ তাহাদের সকলের সহিত যে প্রণয় সে বাহ্য। তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তাহার তুলনা নাই।" শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত এই সমুদায় কথা বলিতেছেন, আর অনেক চেষ্টা করিয়া মুখে আনন্দ দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, নাগর একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমতীর বিশুদ্ধ প্রেম-সুধা ভোগ করিবেন, আর সেই আনন্দে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল। তবু চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে পাছে ব্যথা লাগে বলিয়া চাটুবাক্যে তাহার মনস্তুষ্টি করিতেছেন। এইরূপ যিনি নাগর তিনি "শঠ"। তাহার পরে—

ধৃষ্ট নাগর।

ইনি অন্য কোন রমণীর কুঞ্জে নিশি যাপন করিয়া, পরে প্রেয়সীর নিকট গমন করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া, তিনি যে অন্য রমণীর সহিত নিশি যাপন করিয়াছেন এ কথা একেবারে গোপন করিতেছেন। কিন্তু গণ্ডদেশে তাম্বুলের চিহ্ন রহিয়াছে, সুতরাং ধরা পড়িয়া গেলেন। যদিও হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছেন, তবু ছল করিতে ছাড়িতেছেন না। এই নাগর আপনার দোষ কোনক্রমে স্বীকার করিবেন না,—ইনি "ধৃষ্ট"।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নায়কের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বর্ণনা না করিয়া, তাঁহাদের ভজন কিরূপ তাহা বলিলে একরূপ আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। যাহাদের নিকট এ সমুদায় কথা একেবারে নূতন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিই যে, এক শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, আর জীব মাত্রেই প্রকৃতি। কাজেই কৃষ্ণ বহুবল্লভ অর্থাৎ বহু নায়িকার বল্লভ। গোপী-অনুগা ভজনে আমরা কেহ প্রধান নহি, আমরা কেবল যোজকতা করি। যদি কৃষ্ণ শঠ বলিয়া বিদ্রূপিত হয়েন সে আমাদের দ্বারা নয়, সে গোপীগণ দ্বারা। আর কৃষ্ণের প্রেয়সী যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে শঠ বলা অস্বাভাবিক নয়। সম্রাটের যিনি প্রেয়সী, তিনি তাঁহার কান্তকে অবশ্য তিরস্কার করিবার অধিকার রাখেন।

আর এক কথা স্মরণ করাইয়া দিই। শ্রীভগবানের দুই ভাব আছে; —ভগবত্ত্ব আর মনুষ্যত্ব। মনুষ্যের সহিত তাঁহার সঙ্গ করিতে হইলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ মনুষ্য হইতে হইবে। তাঁহার যে পরিমাণে ভগবত্ত্ব থাকিবে, সেই পরিমাণে তিনি মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত হইবেন। যে পরিমাণে তিনি মনুষ্যভাব গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি মাধুর্য্যময় হইবেন।

মায়াতীত জ্ঞানাতীত হয়ে বসে রবে।
কেমনেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে॥

শ্রীভগবান জ্ঞানময় ভ্রমপ্রমাদশূন্য, কিন্তু এরূপ ভগবানের সহিত মনুষ্য ইষ্টগোষ্ঠী করিতে পারে না। এরূপ ভগবানের এক বিন্দু রস থাকিবে না, তিনি এক প্রকার শুষ্ক কাষ্ঠ। যিনি জ্ঞানাতীত মায়াতীত ভগবান্, তাঁহার হাসি অস্বাভাবিক, ক্রন্দন অস্বাভাবিক, রসিকতা অস্বাভাবিক,—তাঁহাকে আদৌ ভজনা করা চলে না। তাঁহাকে নাগররূপে ভজনা করিতে হইলে, তাঁহার ঠিক মনুষ্যের ন্যায় নাগর হইতে হইবে। অতএব যেমন মনুষ্য মধ্যে নাগরভেদ, তেমনি কৃষ্ণের মধ্যে নাগরভেদ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শেষ দ্বাদশ বৎসর

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাত॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

চরিতামৃত।

গম্ভীরায় আজ প্রভুর এইরূপ অবস্থা যে তিনি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি যে কে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

তবে দাস্যভাবে অভিভূত হইয়াছেন। দৈন্যতার খনি। মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া একটি শ্লোক পড়িলেন, সেটি তাঁহার নিজের। যথা—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥"

প্রভু বলিতেছেন,—"আহা! আমি ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য অনুভব করিতে পারি না, সে ভাগ্য কিনা, "আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলার সমান হইয়া তাঁহার পদসেবা করিব।" তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বরূপ ও রামরায়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "রামরায়! স্বরূপ! জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে, কেহ ধন চায়, কেহ কবিত্ব চায়, কেহ সুন্দরী-ভার্য্যা চায়। আমি সরল মনে বলিতেছি, আমার এ সমুদায় বিষয়ে কিছু মাত্র লোভ নাই। তবে আমি চাই কি শুনিবে?" ইহা বলিয়া নিজকৃত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

অর্থাৎ—"হে জগদীশ্বর! আমাকে তোমার অহেতুকী ভক্তি দাও। কিন্তু রামরায়! ভক্তি তত দুর্লভ নয়, কিন্তু অহেতুকী ভক্তি অতি দুর্লভ। জগতে কি উহা আছে? হে নাথ! সে ভাগ্য আমার কবে হবে? কবে তোমাতে আমার স্বার্থশূন্য ভক্তি হবে? কবে (এটিও তাঁহার নিজকৃত শ্লোক)—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥"

"হে নাথ! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আমি বিগলিত হইব।"—ইহা বলিতে বলিতে প্রভু কান্দিয়া আকুল হইলেন; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন,—"কি আশ্চর্য্য! নাথ, তোমাকে

বঞ্চনা করিবার চেষ্টা বিফল, কারণ তুমি অন্তর্যামী। এই আমি ক্রন্দন করিতেছি সত্য, কিন্তু কেন? রামরায়! আমি যে ক্রন্দন করিতেছি, ইহা কি কৃষ্ণের নিমিত্ত, না আমার কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত? কৃষ্ণের নিমিত্ত একটুকুও নয়, শুধু আমার নিজের নিমিত্ত। আমি ক্রন্দন করিতেছি, কেন না, আমি ভক্তি হইতে বঞ্চিত। অতএব আমি আমার দুঃখের নিমিত্ত কান্দিতেছি, ইহাতে কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই, সবই আমি, এই আমি আমি করিয়া আমার জীবন বিফলে গেল।"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম স্ফূর্ত্তি হইল। তখন পূর্ব্বে যে সমুদায় কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারে ভুলিয়া এই নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিলেন, যথা—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

তখন অতি কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট "আমাকে দর্শন দাও দর্শন দাও," বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে বিচার করিয়াছিলেন যে—তিনি যে রোদন করিয়াছিলেন, সে কৃষ্ণের নিমিত্ত নহে আপনার নিমিত্ত। এখন সেই ভাব আবার মনে উদয় হইল। তখন আর একটি অপরূপ শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি যে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী বিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

প্রভুর এ পর্য্যন্ত বরাবর অর্দ্ধ বাহ্যদশা রহিয়াছে, ঠিক সহজ জ্ঞান হইতেছে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তবে সম্পূর্ণ বিহ্বল ভাবও নয়। শ্লোক পড়িয়া বলিতেছেন—

"স্বরূপ! রামরায়! তোমরা মনে করিতে পারো যে, আমার কৃষ্ণপ্রেম আছে, কারণ তোমরা দেখিতেছ, আমি "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাতে কৃষ্ণপ্রেম আদপে নাই! কৃষ্ণপ্রেম যদি থাকিত তবে আমি পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিয়া যাই না কেন? যেহেতু আমি কৃষ্ণের বংশীবদন দেখিতেছি না, কৃষ্ণকে দেখিতেছি না, অথচ আমি মরিতেছি না,—ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আমার কৃষ্ণপ্রেমের গন্ধমাত্র নাই। শ্রীভাগবত ইহার সাক্ষী দিতেছেন। যথা—

"কৈ অবরহিঅং পেম্মংণহি হোই মানুযে লোএ।
জোই হোই কসস বিবহো ন বিবহে হোন্তম্মি নকো জিঅই॥"

"মনুষ্যের এরূপ প্রেম হয় না, যাহাতে প্রতিদানের ইচ্ছা না থাকে। একবারে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম, যাহা একেবারে কিছুমাত্র প্রার্থনা করে না, তাহা হইতেই পারে না। আর যদি বড় ভাগ্য বলে কখন এরূপ হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর কৃষ্ণবিরহ হইতে পারে না। কৃষ্ণ এমন অনুগত জনকে কখন ত্যাগ করেন না, আর যদিও কোন কারণে ত্যাগ করেন তবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে মরিয়া যায়। অতএব স্বরূপ! রামরায়! আমাতে কৃষ্ণপ্রেম নাই। যদি আমার প্রেম থাকিত, তবে কৃষ্ণ আমার নিকটেই থাকিতেন। আর যদি কোন কারণে আমার প্রেম সত্ত্বেও কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিতেন, তবে আমি তদ্দণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতাম। কিন্তু কই আমি ত মরিতেছি না?

"তবে আমার চক্ষে জল দেখিতেছ বটে, উহা দেখিয়া তোমরা ভুলিও না। এ চক্ষের জল কৃষ্ণবিরহের নিমিত্ত নয়, কারণ তাহা হইলে মরিয়া যাইতাম। এ চক্ষের জল লোককে কেবল আপনার সৌভাগ্য দেখাইবার জন্য, যে আমি খুব ভাগ্যবান, আমাতে কৃষ্ণপ্রেম আছে।

ইহা বলিয়া অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে প্রভু বলিলেন—"এই আমি কৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা কপটতা করিতেছি। অথচ কৃষ্ণ যদি আমাকে কৃপা না করেন, তবে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি।"

প্রভুর কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের প্রীতি কি এবং তাঁহার ভজন জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার। অনেক কষ্টে চক্ষে দু' ফোটা জল আহরণ করিল; আর অমনি মনে দম্ভের সৃষ্টি হইল যে আমি বড় ভক্ত হইয়াছি। তাহার ফল এই হইল যে, পূর্ব্বের যে ভক্তিটুকু ছিল, তাহাও হারাইতে হইল। এ দিনকার লীলায় প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের যেরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিলেন, তাহাতে মনে নির্ভরসার উদয় হয়।

জীবের উপায় কি? তুমি মনে বুঝিতেছ যে, তোমার শ্রীভগবানে একটু প্রেম হইয়াছে, কারণ তাঁহার কথা তোমার নিকট মিষ্টি লাগে। আর হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার অদর্শনে তুমি ব্যথিত হইতেছ। 'তুমি ব্যথিত হইতেছ' বলিলাম, কিন্তু ব্যথিত হইতেছ তাহার প্রমাণ নাই, বরং তোমার ব্যথা যে সামান্য তাহার প্রমাণ আছে। তুমি কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছ সত্য, এ তোমার প্রেমের ক্রন্দন নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন কৃষ্ণবিরহ হইলে জীব মরিয়া যায়। কিন্তু তুমি বেশ আছ, মরিতেছ না ত? তবে কান্দিতেছ বটে। কিন্তু সে কি জন্য? কৃষ্ণ-প্রেমে—না প্রতিষ্ঠার লোভে? অর্থাৎ লোকে তোমাকে বড় ভক্ত বলিবে সেই নিমিত্ত? কৃষ্ণপ্রেমের নিমিত্ত তুমি কান্দিতেছ না, কারণ তাহা হইলে তুমি বাঁচিতে না। কৃষ্ণপ্রেম-মুগ্ধ জীব তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ—বিশুদ্ধ কৃষ্ণবিরহ হইলে, তিনি তদ্দণ্ডে উপস্থিত হয়েন। যখন কৃষ্ণ আইসেন না, তখন জানিও তোমার যে মনের দুঃখ উহা ঠিক কৃষ্ণপ্রেম হইতে নহে।

প্রভু যখন গম্ভীরা-লীলায় একেবারে দিব্যোন্মাদভাবে আক্রান্ত হইতেন, তাঁহার তখনকার ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রভু তখন নানা ভাবে বিভাবিত হইতেন। মনে ভাবুন, একখানি নৌকা স্রোতের বেগে চলিয়াছে, বায়ু তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর নাবিক তাহাকে এপারে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নৌকার যেরূপ অবস্থা, প্রভুব মনের ভাব সেইরূপ।

কৃষ্ণকে আদর করিয়া "আমার চাঁদ," "আমাব নয়নানন্দ," "আমার হৃদয়ের রাজা," বলিতে বলিতে কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া প্রভুর একটু ক্রোধ হইয়াছে, তখন বলিতেছেন,--"তুমি নিষ্ঠুর, তুমি না পুরুষ? পুরুষ না চিরদিন কঠিন জাতি? তুমি প্রেমেব কি জানো? কিছুই জান না, কারণ প্রেমের ব্যথা কখন ভোগ কর নাই। যে বহু নায়িকার বল্লভ তাহার আবার প্রেম কিরূপে সম্ভবে? এরূপ নাগরের সহিত কি প্রেম করিতে আছে?"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর মনে উদয় হইল যে, তিনি কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন। তখন ভাবিতেছেন,-"কি করিলাম, এমন মধু হইতে মধু যে কৃষ্ণ তাঁহার নিন্দা করিলাম? তখন কাতরভাবে বলিতেছেন,—"বন্ধু! তোমার নিন্দা করি নাই, তোমার মহিমাই বর্ণনা করিয়াছি। তোমা ব্যতীত ত্রিজগতে এরূপ আর কে আছেন, যিনি এত নায়িকার প্রেমপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমি তাই বলিতেছিলাম, তোমার নিন্দা করি নাই।"

প্রভু পরে স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন—"সখি! কৃষ্ণপ্রেমের সীমা নাই, ঠাঁই নাই—উহা অতলস্পর্শ। আমরা একজনের সহিত প্রেম করিয়া অস্থির হই, কিন্তু ইঁহার প্রেমের বস্তু অসংখ্য, সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রেমভাব, সকলেই তাঁহার প্রাণ, সকলেরই সহিত তাঁহার মধুর

ব্যবহার, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে কৃতার্থ। এমন নাগরকে যে ভজনা না করে তাহাকে ধিক্! শত ধিক্!!

পরে আপনা আপনি বলিতেছেন, "প্রেম যেরূপ সুধাস্বরূপ, বিরহ সেইরূপ সতেজ কালকূট॥ কৃষ্ণের বিরহে আমার দিবানিশি যন্ত্রণা। সখি, তোমরা স্বপ্নেও ভাবিও না যে, কৃষ্ণের নিমিত্ত আমি যে এত দুঃখ পাই ইহাতে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে।" ইহা বলিয়া একটী নিজকৃত শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাগরঃ॥

ইহার অর্থ এই—"শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করুন, কিংবা সেই আলিঙ্গনের পেষণে আমাকে প্রাণে বধ করুন, ইহা উভয়ই আমার পক্ষে সমান। যেহেতু তিনি আমার পর নহেন, তিনি আমার প্রাণনাথ।" প্রভু বলিতেছেন,—"তিনি আমাকে মারুন কি আশীর্ব্বাদ করুন, উভয়ই আমার নিকট অমৃত। তিনি যে আমাকে তাঁহার বিরহ-জনিত ক্লেশ দিয়া থাকেন, তাহাও আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি।"

আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, সরল ভাবে এরূপ কথা শ্রীভগবানকে কেহ বলিতে পারে না, যে;—"হে বিভু! তোমার আশীর্ব্বাদ ও দণ্ড আমার নিকট সমান।" তবে তিনিই পারেন যাঁহার শ্রীভগবানে নিঃস্বার্থ প্রীতি হইয়াছে। অর্থাৎ এরূপ কথা শ্রীমতী রাধা বলিতে পারেন বা শ্রীপ্রভু রাধাভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তানসেনের গীতের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, "হে কৃষ্ণ, আমি নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল, কেমন, না জলে, নিমিত্ত যেমন

চাতক।” আমরা যখন বলিয়াছি যে তানসেনের এ সরল প্রার্থনা নয়, কেবল কবিতা। এই ক্ষুদ্র লীলা-লেখকও একদিন এরূপ ভণ্ডামি করিয়াছিল। আমার একটি গীতে আছে। যথা—

“ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহারও মিঠে লাগে।”

গীতে আমি ইহা বলিলাম, কিন্তু ইহা কি সত্য? ইহা সত্য নয়, —কবিতামাত্র। কারণ প্রহার তাঁহারি হউক বা আর কাহারও হউক আমার কাছে মিঠা লাগে না।

আমার আর একটি গীতে আছে—

“যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ।
প্রেমাঙ্কুরে শিশির সিঞ্চন॥

অর্থাৎ “হে ভগবান! তুমি যে আমার প্রতি অত্যাচার কর, ইহা আমার অঙ্গের ভূষণস্বরূপ। ইহা আমার অতি মিষ্ট লাগে, আর ইহাতে তোমার প্রতি আমার প্রেম অঙ্কুরিত হয়। এ নিবেদন কে করিতেছে? যদি আমি করিতাম তবে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি হইত। কিন্তু এ নিবেদন যিনি করিতেছেন তিনি একজন গোপী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ নিবেদন আর ভণ্ডামি হইল না।

গম্ভীরায় প্রভু দুই প্রকারে উপদেশ দিতেন—এক কথা দ্বারা, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, কি অন্যান্য বহুবিধ উপায় দ্বারা। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভাবদ্বারা কিরূপে উপদেশ দিতেন তাহার উদাহরণ দিতেছি। তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিব। মানের মধ্যে উৎকণ্ঠা-রস একবারে পরিষ্কাররূপে টলটল করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, একথা ঠিক আছে। আর তাঁহার নিমিত্ত বাসকসজ্জা করিয়া শ্রীমতী (অর্থাৎ গম্ভীরায় প্রভু) বসিয়া আছেন।

প্রভু তাঁহার উৎকণ্ঠা কত প্রকারে দেখাইতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সে এত প্রকারে যে, আমরা তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না, তবু কিছু বলিতেছি। প্রভুর মুখ একটু মলিন হইয়াছে, ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি অল্প অল্প দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। পরে মৃদুস্বরে "উহু উহু" করিতেছেন, আবার এদিকে ওদিকে উঁকি মারিতেছেন।

আমার একটি আত্মীয় একটু অধিক পরিমাণে স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন। তিনি আমাকে উৎকণ্ঠা-লীলা দেখাইয়াছেন, আর তাহা এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী সংসারের গৃহিণী; রজনীতে সকলের আহারাদির পরে তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতে আইসেন। স্বামী অগ্রে আহার করিয়াছেন, করিয়া শয্যায় শয়ন করিতে গিয়াছেন; কিন্তু শয়ন করিতে পারিলেন না, উঠিলেন; উঠিয়া স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার রন্ধন-ঘরের দ্বারে যাইতেছেন, যাইয়া সেখানে বসিতেছেন; আবার উঠিয়া শয়নগৃহে আসিতেছেন;—এইরূপে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি আমাকে বলিতেছেন (আমি তখন অতি বালক) "যাও তাঁকে ডাকিয়া আন গিয়া।" আমি সেই গরবিনী স্ত্রীর কাছে যাইয়া তাঁহার স্বামীর সন্দেশ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার কাজ সমাধা হয় নাই, আমি যাই কিরূপে? তাঁহার ত লজ্জা ভয় কি কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি বধূ, আমি কিরূপে নিলর্জ্জের ন্যায় ব্যবহার করি?" "ভাল, কার্য্য সমাধা হইলে আসও"—ইহা বলিয়া আমি তাঁহার স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে বসিলাম। পরে সেই গরবিনীর কার্য্য সমাধা হইল, সকলে শয়ন করিতে গেলেন, তখন তিনি স্বামীর নিকট আসিলেই পারেন; কিন্তু তাহা না আসিয়া রন্ধন-ঘরের দাওয়ায় চুল কুলাইতে বসিলেন।

তখন আমি বুঝিলাম, তিনি যে হঠাৎ আসিবেন এ ইচ্ছা তাঁহার

নয়। তাঁহার স্বামী যে তাঁহার নিমিত্ত "উৎকণ্ঠা রস" ভোগ করিতেছেন, ইহাতে তিনি বড় সুখী আছেন। সুতরাং স্বামীকে শান্তিদান করায় তাঁহার স্বার্থ নাই।

সেই উৎকণ্ঠা রসের খেলা দেখিয়াছিলাম। আর অকটু বড় হইলে যখন প্রভুর গম্ভীরা-লীলা পাঠ করিলাম, তখন আবার দেখিলাম। দেখিলাম, প্রভুর যে উৎকণ্ঠা তাহা উপরে বর্ণিত স্বামীর উৎকণ্ঠা হইতে অনেক বিভিন্ন ও অনেক প্রবল।

কোন একজন আসিতেছেন না, তাহাতে তোমার মনে উৎকণ্ঠার ভাব উদয় হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, তাহাতে এমন কিছু আছে যে জন্য তোমার লোভ হইয়াছে ও তখনি তাহা তোমার প্রয়োজন হইয়াছে, আর সেই নিমিত্ত তুমি তাহাকে চাহিতেছ। কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? তিনি তখনি আসিতেন, না হয় কিছু পরে আসিবেন। তখনি তাঁহার না আসাতে এরূপ অধৈর্য্য কেন? এ অধৈর্য্যের কারণ দেখাইতেছি। তোমার পিপাসা কি ক্ষুধা হয়েছে, তুমি জল কি আহারীয় দ্রব্য চাও, কাজেই তোমার বিলম্ব সহিতেছে না,—তোমার জলের কি আহারীয় বস্তুর তখনি প্রয়োজন। আবার দেখ, তোমার প্রিয়জনকে সর্পে দংশন করিয়াছে, রোজা আনিতে লোক গিয়াছে, কাজেই তুমি উৎকণ্ঠায় প্রপীড়িত হইয়াছ। তুমি দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে রোজাকে প্রতীক্ষা করিতেছ, সে কতদূর আসিয়াছে তাহা উকি মারিয়া দেখিতেছ। আমার সম্পর্কীয় যাঁহার কথা উপরে বলিলাম তিনি কেন উৎকণ্ঠায় অভিভূত? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে,—কেবল একটু দূরে। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহার কথা শুনিতেছেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারেন, তবে তাঁহার উৎকণ্ঠা কেন? অবশ্য কোন ক্ষুদ্র কারণ ছিল, আর সেই নিমিত্ত তাঁহার শরীরে উৎকণ্ঠার

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—তবে, সেও সামান্য। তিনি একবার শয়ন করিতেছেন, কি একবার এখানে ওখানে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভু কি করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু উহু উহু করিতেছেন, প্রথমে মৃদুস্বরে, পরে অতি স্পষ্ট করিয়া "গেলাম মলাম" বলিতেছেন। আবার কখন "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিতেছেন। একবার বলিতেছেন, "আচ্ছা আমি একটু শয়ন করি," কিন্তু মূহূর্ত্ত মধ্যে আবার উঠিয়া বসিতেছেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেন? না, বন্ধুর তল্লাসে যাইবেন এই নিমিত্ত। কিন্তু স্বরূপ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন, কাজেই তিনি আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন,—"যাও না একটু এগুইয়া দেখ।" তার পরেই বলিলেন,—"কি শব্দ শুনিলাম যে? বোধ হয় তিনি আসিয়াছেন!' কখন বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর পরিশেষে সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

এই গেল প্রভুর উৎকণ্ঠা, আর স্বরূপ রামরায় উহা দেখিতেছেন কৃষ্ণের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে তাহাতে প্রভু কিরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, স্বরূপ ইহা দেখিলেন। আর তাই এখন শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা বলিয়া কৃষ্ণলীলায় অভিনীত হইয়া থাকে। যথা পদ—

"ও ললিতে, সে কই গো?
বুঝি এলোনা, এলোনা, এলোনা, নিশি পোহাইল!"

রাধা একবার উঠে, একবার বসে, কেন্দে বলে—

"উদয় দিননাথ অনুদয় দীননাথ।"

কি সনাতন গীতায়—

"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।"

কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রকৃত যে উৎকণ্ঠা, সে আমার আত্মীয়ের যেরূপ

হয়েছিল ঠিক সেরূপ নহে,—সে অন্য জাতীয় রস। শ্রীমতী বলিতেছেন,— "বন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ লাগি কান্দে সর্ব্ব অঙ্গ মোর।" শ্রীমতী পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে আস্বাদন করেন। কথা কি, জীবে ও শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ জীবে জীবে সম্ভবে না,—এ সম্বন্ধ পুত্রবৎসলা জননী ও মতৃভক্ত পুত্রে নাই, এবং পতিব্রতা স্ত্রী ও স্ত্রী-প্রাণ স্বামীতেও নাই। প্রভু গম্ভীরা-লীলা দ্বারা তাই জীবকে দেখাইতেছেন।

হে জীব! এই তত্ত্বটি বিচার ও ধ্যান কর। কথা এই যে, তোমাতে আর শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় ঘনিষ্ঠতা, এরূপ আর কাহারও সঙ্গে তোমার নাই। এ কথা হঠাৎ শুনিলে কবিতার বাণী বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে প্রভুর গম্ভীরা-লীলা বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে প্রধানতঃ এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্তই প্রভু এই লীলা করেন।

স্বরূপ প্রভুর সম্বন্ধে একটি স্তুতি-শ্লোক বলেন, সেটি এই—

"হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া॥
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

"হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, তোমার যে দয়ায় অনায়াসে সকলের দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং প্রেমানন্দের বিকাশ হয়, তোমার যে দয়ার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশম প্রাপ্ত হয়, যে দয়া চিত্তে রসসঞ্চার করিয়া দিয়া প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তি সুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন সংঘটিত হয়, এবং যে দয়া সকল মাধুর্য্যের সার, তুমি করুণা করিয়া সেই দয়া আমাতে প্রকাশিত কর!"

শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রে বিবাদ মীমাংসা করিয়াছেন। ইহা স্তুতিবাক্য নয়,—প্রকৃত কথা।

জগতে বিবাদ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী লইয়া, বিবাদ নাস্তিক ও আস্তিক লইয়া। কেহ বলেন ভগবান আছেন, কেহ বলেন নাই। তিনি যে আছেন তাহার কি প্রমাণ? তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মনে কেবল আশা মাত্র যে তিনি আছেন। আবার তিনি যে নাই তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মনুষ্যের মধ্যে এই এক ঘোর বিবাদ চিরদিন চলিতেছিল। আর এক বিবাদের কারণ ভগবানের প্রকৃতি লইয়া। কেহ তাঁহার হাতে বংশী দেন, কেহ দেন অসি। আরও এক বিবাদ শ্রীভগবানে ও জীবে সম্বন্ধ লইয়া। কেহ বলেন শ্রীভগবান জীব হইতে পৃথক, আবার কেহ বলেন সোঽহং— আমিই সেই। এই সকল তত্ত্ব লইয়া চিরদিন এই ভারতবর্ষে বিবাদ চলিতেছে। ভারতবর্ষ কোথা, না পৃথিবীর সেই স্থানে, যেখানে কেবল আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়া থাকে।

কেহ বলেন ভগবান নাই, কেহ বলেন তিনি আছেন। কেহ বলেন তিনি খড়্গধারী, কেহ বলেন তিনি বংশীধারী। কেহ বলেন তিনি নির্গুণ, তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা আমাদের কর্ম্মের দাস। কেহ বলেন ভগবান কর্ত্তা, আমরা তাঁহার দাস। আবার কেহ বলেন ভগবানও যে আমিও সে।

প্রভু অবতীর্ণ হইয়া চিরদিনের এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন;— কিরূপে? না, আপনি আসিয়া দেখাইলেন—আমি ভগবান, আমি আছি। আর আপনি আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিয়া দেখাইলেন,—তাঁহার প্রকৃতি ও তাঁহার ভজন কি? শ্রীভগবানের অস্তিত্বের ও প্রকৃতির এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্ব্বে ছিল না। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৌর-অবতারে জীব প্রথমে পাইল।

শঙ্করের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদাসদিগের এই বিবাদ। প্রবোধানন্দের

সঙ্গেও প্রভুর এই বিবাদ। প্রভু এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন। দুঃখের বিষয়, এত বড একটি ব্যাপার তাঁহার ভক্ত কি অপর কেহ উল্লেখ মাত্র করেন নাই, এমন কি তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করেন নাই।

গম্ভীরা-লীলার উদ্দেশ্য কি? গম্ভীরা-লীলার উদ্দেশ্য জীবের নিকট শ্রীভগবানের পরিচয় করিয়া দেওয়া। কিন্তু এ কথা এ পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করেন নাই, আর যদি কেহ মনে মনে করিয়া থাকেন ত প্রকাশ করেন নাই।

প্রভু অদ্বৈতবাদীতে ও দ্বৈতবাদীতে কিরূপে বিবাদ মীমাংসা করিলেন তাহা বলিতেছি। তিনি বলিলেন,—জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথা ঠিক, আর সোঽহং এ কথাও ঠিক। অদ্বৈতবাদীতে ও দ্বৈতবাদীতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ নাই,—কেন তাহা বলিতেছি।

আমরা বার বার বলিয়াছি যে, প্রভু যেরূপ কৃষ্ণবিরহ দেখাইয়াছেন, এরূপ বিরহ কোন জননী তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত কি কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীর নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। প্রভু চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বিরহে অন্ততঃ প্রত্যহ একবার মূর্চ্ছা যাইতেন, এবং গম্ভীরায় একাদিক্রমে বার বৎসর জাগিয়া রজনী পোহাইয়াছেন। কোথায় কোন্ বিরহিণী নারী তাঁহার প্রিয়তমের নিমিত্ত এরূপ কঠোর কার্য্য করিয়াছেন, না করিতে পারেন? কোথা কোন রমণী তাঁহার প্রিয়তমের নিমিত্ত দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা গিয়াছেন? প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম কি বাৎসল্য-প্রেম হইতে অনন্ত গুণে গাঢ়।

এখন বিবেচনা করুন লোকে স্ত্রীকে বলে অর্দ্ধাঙ্গী। প্রকৃতপক্ষে, যেখানে দাম্পত্য-প্রেম বিশুদ্ধ, সেখানে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী ও স্বামী স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম হইতে কত গাঢ় তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ দেখিলে কতক বুঝা যায়।

তাহা যদি হইল, তবে জীব ভগবানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অতএব 'সোঽহং' তত্ত্ব ঠিক। অথচ জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথাও ঠিক। এই তত্ত্ব শিখাইবার নিমিত্ত, এই বিবাদ মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, প্রভুর অবতার ; আব এই তত্ত্ব প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর গম্ভীরা-লীলা। গম্ভীরা-লীলা সম্বন্ধে আর অধিক না বলিয়া ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভগবান তোমার যত ঘনিষ্ঠ এত আর কেহই নয় ; তিনি তোমাকে লইয়া আর তুমি তাঁহাকে লইয়া, তাঁহার জগৎ তুমি ও তোমার জগৎ তিনি,—ইহাই প্রকাশ করা এ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা যদি তুমি ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি শ্রীভগবানের সম্পত্তি লাভ করিলে, তোমার আর কোন অভাব থাকিল না। তোমার স্ত্রী তোমার অর্দ্ধাঙ্গ, কিন্তু ভগবান তোমার পূর্ণাঙ্গ। তুমি যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কি গৌর গৌর বলিয়া নাম জপ কর, তখন মনে ভাবিতে পার যে, তুমি "আমি আমি" অর্থাৎ নিজের নাম জপিতেছি।

তবে তুমি আর ভগবান এক, অথচ তিনি সম্পূর্ণ পৃথক,—ইহা কিরূপে হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি তাহার উত্তর দিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী ও স্বামীতে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে গাঢ় ঘনিষ্ঠতা জীবে ও ভগবানে। তাহার অর্থ এই যে,—তিনি আর তুমি এক। তিনি ও আমি পৃথক অথচ এক,—ইহা কিরূপে হয় ? তুমি আর তোমার স্ত্রী পৃথক, অথচ তোমরা পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ,—ইহা কিরূপে হয় ? যদি স্ত্রী পৃথক হইয়াও অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারেন, তবে স্ত্রী হইতে কোন ঘনিষ্ঠতর বস্তু প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইবে বিচিত্র কি ? কিরূপে কি হয় জানি না, তবে প্রভু যে ২৪ বৎসর প্রত্যহ কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেন ইহা জানি।

যাঁহারা জোর করিয়া মুখে বলেন সোঽহং, অর্থাৎ যাহাদের ভগবত-

প্রেমের লেশ মাত্র নাই, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ভগবান জ্ঞানময় ও আনন্দময়, কিন্তু তুমি ভ্রমময় ও দুঃখময়। তবে তুমি যে সোঽহং বল, তোমার লজ্জা করে না? তুমি এইমাত্র জানিলে যে ভক্তগণ যে বলিয়া থাকেন—"তিনি আমার, আমি তাঁহার" তাহাও ঠিক নয়, ঠিক হইতেছে "আমি তিনি, তিনি আমি।" এই আমার অধিকার, এই আমার জীবনের শেষ সীমা; তাঁহার অনন্ত জীবন, আমারও অনন্ত জীবন; তিনি আর আমি চিরদিন ঘনিষ্ঠতা করিব, ক্রমে এ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যাইবে। এমন কি, শেষে প্রায় এক হইয়া যাইব, তবুও পৃথক থাকিব, আর ইহাকে বলে 'অবিরূঢ় ভাব'।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গম্ভীরা লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ

যিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহের আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। এইজন্য প্রভু গম্ভীরায় দ্বাদশ বৎসর প্রধানতঃ এই বিরহরস প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় অতি সূক্ষ্ম রস, ইহা কেবল ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রভু স্বয়ং নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, এই রস সমুদয় বুঝাইতে ও প্রস্ফুটিত করিতে স্বয়ং শ্রীমতীর আসিতে হইয়াছিল। তিনি প্রভুকে আশ্রয় করিয়া স্বরূপ রামরায়কে এই নিগূঢ় অনর্পিত রস সমুদয় বুঝাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী স্বয়ং না আসিলে কাহার সাধ্য এ রস প্রস্ফুটিত করে। তিনি

তাঁহার কৃষ্ণের সহিত যে খেলা খেলিয়াছেন, কি খেলিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যখন শ্রীরাধা প্রভুতে প্রকাশ পাইলেন, তখন প্রভুর স্বাভাবিক কমনীয় দেহ লক্ষ গুণ কমনীয় হইল,—মনে হইল যেন তিনি একটি ভুবনমোহিনী স্ত্রীলোক। যখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার স্বর হইল স্ত্রীলোকের ন্যায়! তিনি বলিতেছেন, "সখি! আমার ভাগ্যের কি সীমা আছে? দেখ, কৃষ্ণকে ভাল না বাসে জগতে এমন কেহ নাই। আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসি, এই ব্রজে কে না তাঁহাকে সেইরূপ ভালবাসে? আবার ইহাও কে না জানে যে, এই ব্রজে আমার ন্যায় রূপসী রমণী কত শত আছে? কিন্তু তিনি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না! তাঁহার ভালবাসার হৃদয়, তিনি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং ব্রজগোপীরা সকলে তাঁহাকে যেমন ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে সেইরূপ ভালবাসেন। কিন্তু তবু আমার প্রতি তাঁহার যে টান দেখা যায়, এ প্রকার টান আর কাহাতেও নাই!" এখানে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল-নাগরের পদ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"আমার এ ভাগ্য কেন? আমি কি ব্রত করিয়াছিলাম?" তখন তিনি দুই হাত জুড়িয়া ঊর্দ্ধে চাহিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"নাথ! তুমি বড় করুণ, তোমার গুণ আমি কিরূপে শোধিব? আমি শ্রীমতী দুর্গার নিকট কামনা করি যে, তুমি চিরদিন সুখে থাক, আর আমার যত মঙ্গল সব তুমি লও।" প্রভু রাধাভাবে এইরূপ বলিতেছেন। এতদূর কষ্টে শ্রষ্টে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আঁখি দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে, কথা ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে। তখন স্বরূপের গলা ধরিলেন, ধরিয়া অঝোরে ঝুরিতে লাগিলেন,—কণ্ঠরোধ হওয়ায় মুখে আর কথা সরিতেছে না!

এইরূপ কিছুকাল থাকিয়া হঠাৎ প্রভু চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল,

বিহ্বল ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন। তাই বলিতেছেন, "সখি! ঐ কৃষ্ণ আসিতেছেন, শুনিতেছ না? আমি যেন নপুরের রুনুঝুনু শব্দ শুনিতেছি। দেখছ না সমস্ত আকাশ পদ্মগন্ধে ভরে গিয়াছে!" ইহা বলিয়া তিনি উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ কতদূর আসিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন। বদন চিন্তাকুল ছিল, তদ্দণ্ডে প্রফুল্ল হইল, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া সম্মুখে নিমিষহারা নয়নে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"এসেছো বন্ধু এসো, আমি তোমারই কথা বলিতেছিলাম। আর কাহার কথাই বা বলিব? আর কি কথাই বা আমি জানি?" ইহাই বলিতে বলিতে প্রভু উঠিতে গেলেন। মনোগত ভাব, অগ্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন বা আহ্বান করিবেন। কিন্তু উহা বুঝিতে পারিয়া প্রভুকে উঠিতে দিলেন না; বলিতেছেন, "তুমি উঠিতেছ কেন? তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আসিতে বল।" প্রভু উঠিতে না পারিয়া তাই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—

"এসো বন্ধু এসো, আমি আঁচল পাতিয়া দিতেছি।
তুমি বসো, আমার আধ অঞ্চলে বসো।"

ইহা বলিতে বলিতে আঁচল পাতিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিতেছেন, "তুমি আমার আঁচলে বসো, আমি নয়নভরে তোমায় দেখি। তোমার মুখখানি দেখিতে আমার কি সুখ হয় তাহা আর কি বলিব, আমার প্রাণ তার সাক্ষী।" সেই প্রলাপ হইতে এই বিখ্যাত পদ সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা বৈষ্ণব মাত্রেই কীর্ত্তনে অপরূপ সুরে গাহিয়া থাকেন—

"এসো বন্ধু এসো এসো আধ অঞ্চলে,
(আমি) দুটি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত সুখ,
সেইতো পরাণ আমার সাক্ষী॥"

এই যে কীর্ত্তন, এই যে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল, ইহার প্রায় সকলেরই ভাব প্রভু আপনি রাধা হইয়া প্রকাশ করেন। প্রভুর ভাব মহাজনগণ কবিতার স্বর তালের সাহায্যে প্রকাশ করিলেন। প্রথম দেখুন, এই উপরের লীলায় কৃষ্ণ হইতেছেন অনুকূল-নাগর। শ্রীমতী রাধা স্বয়ং আসিয়াছেন, তিনি অনুকূল নায়ককে কিরূপ ভজনা করিলেন, তাহা স্বরূপ প্রভৃতি দেখিলেন। আবার গোপী-অনুগা ভজন কি তাহাও ভক্তগণ এই লীলা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণে খেলা হইতেছে, স্বরূপ ও রামরায় কি করিতেছেন না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই দেখার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভজন হইতেছে। শ্রীমতী স্বয়ং যতখানি রস আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ততখানি না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও সেই রসই আস্বাদন করিতেছেন।

স্বরূপ ও রামরায় এই লীলা চক্ষে দেখিলেন। হে ভক্ত! তুমি ইহা চক্ষে দেখিলে না সত্য, কিন্তু তুমি এখন ধ্যান-চক্ষে এই লীলা অনায়াসে দেখিতে পার। উপরে যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ইহা সমুদয় হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা কর, তুমিও দেখিতে পাইবে।

দ্বাদশ বৎসর, প্রধানতঃ কৃষ্ণ-বিরহ লইয়া, প্রভু গম্ভীরা-লীলা করেন। এ কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ? অতি প্রিয়জন দেহত্যাগ করিলে যে দুঃখ হয় তাহাকে শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন কিছুদিনের জন্য যে দুঃখ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন, পতি দূরে আছেন, তাহার প্রেমে অভিভূতা পত্নী, গৃহে তাহার নিমিত্ত যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন,—এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ, এইরূপ রমণীর পতি-বিরহের ন্যায় নহে। পতি দূরে থাকায়, তাহার অদর্শন জনিত দুঃখ ছাড়া রমণীর আরো কিছু আছে। মনে ভাবুন, পতি কাছে

না থাকায় পত্নী সাংসারিক অনেক দুঃখ (যেমন শাশুড়ির যন্ত্রণা জনিত বা অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত দুঃখ) ভোগ করিতে পারেন। সুতরাং পতিবিরহে রমণীর দুঃখ, আর কৃষ্ণবিরহে প্রভুর দুঃখ অনেক বিভিন্ন। প্রভু যে কৃষ্ণকে না দেখিয়া প্রাণে মরিতেছেন, সে কেবল কৃষ্ণ-প্রেমের নিমিত্ত ; কিন্তু পত্নী পতিবিরহে যে দুঃখ পান, সে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। কাজেই পতিবিরহে পত্নার যে দুঃখ, তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের সহিত তুলনাই হয় না।

প্রভু কৃষ্ণের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেন, ইহা জগতে কেহ কাহারও নিমিত্ত কখন দেখাইতে পারেন নাই। এই পদটি দেখুন—

বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গসুন্দর ভূমে পড়ি মুরছয়।
পুন পুন মুরছি অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস॥
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল।
শুনিয়া চেতনা পাই আঁখি ঝরু লোর॥

আপনারা বিরহে এরূপ কাতর হইতে কাহাকেও কি দেখিয়াছেন? কাহারও কথা কি শুনিয়াছেন? কোন কবিতায় বা নাটকে কি পড়িয়াছেন? বিরহে মূর্চ্ছা যায় এরূপ কখন কি শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন? শোকে মূর্চ্ছা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, পরে উহা সারিয়া যায়। আর শোকে মূর্চ্ছা যাওয়ার অনেক কারণ থাকিতে পারে, যাহা বিরহে নাই। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রভু প্রত্যহ এইরূপ মূর্চ্ছা যাইতেন।

প্রভু গম্ভীরায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে রামরায় ও স্বরূপ। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী, তিনি ক্রমে শ্রীমতী রাধা হইলেন,—কিরূপে তাহা পরিশিষ্টে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। অর্থাৎ গৌরাঙ্গের দেহে শ্রীমতী

প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল, না—স্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে শ্রীমতী রাধা বসিলেন। সে কেমন, না—একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে ঐ গৌরাঙ্গ-দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও স্বরূপ ও রামরায় সেইরূপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন, না—তিনি কিরূপ বস্তু, তিনি চান কি, ও তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়,— তাহাই জীবকে জানাইতে।

তুমিও স্বরূপ ও রামরায়ের ন্যায় এই রস—ততখানি না হউক— কতক আস্বাদন করিতে পারিবে। তবে অবশ্য ধ্যানে ইহা দর্শন করিতে অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে ক্রমে ধ্যান স্ফূর্ত্তি হইবে। তখন, স্বরূপ ও রামরায় যতখানি আস্বাদ করিলেন,—তুমিও প্রায় ততখানি আস্বাদ করিতে পারিবে। ইহাকে বলে—গোপী-অনুগা ভজন।

এখন গম্ভীরা-লীলার "প্রতিকূল" নায়ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রভু, শ্রীমতী রাধা হইয়া গম্ভীরায় বসিয়াছেন; আর ভাবিতেছেন যে, তিনি চঞ্চল ও নিঠুর কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিয়া বড়ই অকাজ করিয়াছেন। মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত জগন্নাথবল্লভ নাটকের এই শ্লোকটি বলিলেন—

"প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।"

ইহার অর্থ এই—রাধিকা সখীকে বলিতেছেন,—"সখি! এই হরি, প্রেমভঙ্গজনিত পীড়া যে কত গুরুতর তাহা জানেন না। প্রেমও স্থানাস্থান জানে না, মদনও জানে যে আমরা দুর্ব্বল ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই,—শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রেমের ক্লেশ বলিতেছেন, তাই কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন। বলিতেছেন, "হে নাথ! প্রেম-ভঙ্গ যে কি হৃদয়বিদারক

দুঃখ তাহা তুমি জান না। আমরা তোমাকে ভালবাসিয়া মরি, তুমি ফিরেও চাও না।" এই গেল প্রতিকূল নাগরের মধুর ভজন।*

স্বরূপ ও রামরায়কে সখী ভাবিয়া প্রভু বলিতেছেন,—"সখি! কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিয়া কি অকাজ করিয়াছি। তিনি ত প্রেম-ভঙ্গের যে বেদনা তাহা জানেন না, তাঁহার কি? সখি! আমাকে দূষিতে পার যে, এমন প্রেম তুমি কর কেন? ভাই, প্রেম কি কথা শুনে? স্থানাস্থান মানে? প্রেম যদি সে বিচার করিত তবে কৃষ্ণতে ধাবিত কেন হইবে? আমি যে এই দিবানিশি পুড়িতেছি তাহা কি তিনি জানেন? আমি পুড়িতেছি তাহাতে তাঁহার কি? সখি, তুমি আমাকে বারবার বল যে ধৈর্য্য ধর, কিন্তু জাতিতে অবলা, স্বভাবে অখলা, হায় বিধি! এমন জীবকে কি প্রেম দিয়া দগ্ধ করিতে হয়?"

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, প্রভু যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা নয়। প্রভু ঠিক রাধা হইয়াছিলেন, আর তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিয়াছিলেন। এই পদটি কীর্ত্তনীয়া মাত্রেই গাইয়া থাকেন, যথা—

আধল প্রেম পহিলা না জানি হাম। ইত্যাদি।

* এক গোস্বামীর এক ঠাকুর ছিলেন, তাঁহাকে তিনি যত্নপূর্ব্বক সেবা করিতেন। তাঁহার শিশুপুত্র মরিতেছে দেখিয়া তাঁহার সেই ঠাকুরকে আঙ্গিনায় ফেলিয়া হস্তে দা লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তোমার কৃতজ্ঞতা? আমি তোমার ভজন করি, আর তুমি আমার পুত্র নিতেছ? এই দা দিয়া তোমায় খণ্ড খণ্ড করিব।" এখানেও প্রতিকুল নায়ক লইয়া কাণ্ড। কিন্তু গোস্বামী ঠাকুর তাহার কার্য্যে দেখাইতেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে ভজনা করিতেন না, ভজন করিতেন আপনাকে, অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণ-ভজন মানে আপনি সুখে থাকিবেন। কিন্তু প্রভুর প্রতিকুল নাগর-ভজন অতি মধুর—উচ্চ হইতে উচ্চতম। ইহা আর এক প্রকার—ইহার ভিত্তি শুদ্ধ প্রেম।

প্রভু বলিতেছেন,—"সখি, প্রেম যে অন্ধ তাকি আগে আমি জানি? আমি দারুণ প্রেম করিয়াছি, ইহার আর ঔষধ নাই। সখি! যৌবন দুই দিনের নিমিত্ত। আমার যৌবন আমি যাচিয়া কৃষ্ণের কাছে ভিখারি হইলাম। কিন্তু তাহার যে নাগরালি তাহা বাহিরের, অন্তরের নয়। সখি! কি করি, কি করি, হায়! এরূপে দিবা নিশি কত সহিব?

প্রভু একটু চুপ করিয়া কর্ণামৃতের এই শ্লোকটি পড়িলেন—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥

বলিতেছেন,—"সখি! আমার অন্যায়, আমি তোমাদের কাছে প্রবোধ ভিক্ষা করিতেছি। যেহেতু তোমরাও ত আমার মত ব্যথিত? তোমাদের কাছে এসব কথা বলিয়া তোমাদের হৃদয়ের ব্যথা আরো বাড়াইলা দিতেছি। তোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু তোমাদের প্রবোধ কে দিবে? আবার সখি! না বলিয়াই বা কি করি? তোমরা ছাড়া আর কাহাকে বলি, আমার আর কে আছে?"

প্রভু আবার একটু চুপ করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,—"সখি, এক কাজ কর। আমরা কৃষ্ণের জন্যে যতদূর করিতে হয় করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। এসো আমরা এখন কৃষ্ণ-কথা ছাড়িয়া অন্য কথা বলি। এসো আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই।" ইহা বলিয়া নয়ন মুদিলেন, উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে তাড়াইয়া হৃদয়ে অন্য কথা, ভাব ও ছবি আনিবেন। একটু নয়ন মুদিয়া থাকিয়া বলিতেছেন,—"সখি! এ কি হইল? হইল না! হইল না! আমি কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিলাম না! শুন, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি কৃষ্ণকে ছাড়িব বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প

করিলাম, প্রাণপণ করিয়া নয়ন মুদিয়া বসিলাম,—সঙ্কল্প এই যে, কৃষ্ণকে আর হৃদয়ে আসিতে দিব না। ওমা! দেখি কি, যাহাকে ছাড়িব বলিতেছি, তিনি আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন! শুধু তাহাও নয়, সেই ভুবন-মোহনিয়া আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিনয় করিতেছেন, ইঙ্গিতে অনুনয় করিতেছেন,—যেন আমি তাহাকে না ছাড়ি!"

আমরা প্রাণপণ করিয়াও এই অবাধ্য চিত্ত একবারও কৃষ্ণের দিকে লইতে পারি না। কিন্তু প্রভুর মহা বিপদ এই যে, তিনি কৃষ্ণকে ছাড়িতে ভারী উদ্যোগী, কিন্তু কৃষ্ণ কোন ক্রমে যাইতে চাহেন না!

প্রভুর ভাব এখন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি সখীদের ছাড়িলেন, আর একেবারে অধীর হইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—"বন্ধু! তুমি আমার দিকে অমন করে কাতরভাবে চাহিও না, আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িব? তোমাকে আমি ছাড়িব? তোমাকে আমি, —যাহার জগতে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, সেই হতভাগিনী রাধা ছাড়িবে? আমি তোমাকে ছাড়িব, তবে আমার কি থাকিবে? আমি তোমাকে ছাড়িব এ কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু তুমি কি তাই বিশ্বাস কর? এ সব মিথ্যা কথা, এসব আমার চাতুরী, তাও নয়, আমার প্রলাপ। তোমাকে না দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম, তাহাই প্রলাপ বকিতেছিলাম।"

প্রভু পূর্ব্বে কৃষ্ণকে মন্দ বলিয়াছিলেন, তাই এখন কৃষ্ণের নিকট করুণ-স্বরে ক্ষমা চাহিতেছেন। সে এরূপ করুণ-স্বর যে, শুনিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলিতেছেন,—"আমি কি তোমার নিন্দা করিতে পারি? তাকি কখন হয়? তবে অবলা বলিয়া, কি উন্মাদ হইয়া, যদি কিছু বলি, তবে আমি তোমাকে স্বরূপ বলিতেছি, সে মনে নয়, মুখে।" এখানে প্রতিকুল-নাগরের ভজন অনুকুলে পরিণত হইল।

কখন বা বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উপর

ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণকে ভজিয়া কি কুকাজই করিয়াছি। হায়! হায়! আর না, অমি আর কৃষ্ণকে ভজিব না।" যেন প্রভু ইহা রহস্য ভাবে বলিতেছেন, সেই ভান করিয়া স্বরূপ বলিলেন,—"কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তবে কাহাকে ভজিবে?" প্রভু বলিলেন, "কেন গণেশকে ভজিব! তিনি সিদ্ধিদাতা, যাহা চাহিব তাহা পাইব। না হয় সদাশয় সরল মহাদেবকে ভজিব, তিনি শত্রু কর্ত্তৃক বিল্বডালে প্রহৃত হইয়াও তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। তাও না হয়,—মা দুর্গা আছেন, কালী আছেন, তাঁহাদের পূজা করিব। যাহাই হউক, স্বরূপ! তাঁহাদের ভজনে প্রেম-বেদনা নাই। জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না,—আমি যে দিবানিশি পুড়িতেছি।"

ইহা বলিতে বলিতে হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল, আর কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হইলেন। তখন অতি কাতরস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে কাতরোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।

কৃষ্ণ তাঁহার কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, প্রভু গম্ভীরায় হৃদয় উঘাড়িয়া তাহা বলিতেছেন,—"সখি! কৃষ্ণকে ভজিয়া আমার একি হইল? কৃষ্ণকে ভজিয়া দেখিতেছি আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। সে কিরূপ শুনিবে? মেঘ দেখিলে আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তোমরা ময়ুরকে নয়ন-সুখকর ভাব, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহার কৃষ্ণকণ্ঠ যেন কালফণীর ন্যায় বোধ হয়। সখি! বলিব কি, কৃষ্ণবর্ণ কোন মনুষ্য দেখিলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকেনা। এ সমুদয় ত উন্মাদের অবস্থা। আমি কাল দেখিলে বিচলিত হই কেন? যাহা হউক আমি কাল আর দেখিব না। সখি! দেখিও যেন আমার কুঞ্জে কৃষ্ণবর্ণ কিছু না থাকে। দেখিলেই কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে, আর বিরহে পুড়িয়া মরিব। তার কি করিব?

স্বরূপ—তোমার কেশ?

প্রভু—মস্তক মুণ্ডন করিব।

স্বরূপ—তোমার শ্যামা সখি ?

প্রভু—তাহাকে তাড়াইয়া দাও।

প্রকৃতই প্রভুর অকথ্য প্রেমের আর কি বর্ণনা করিব, মেঘ কি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে তাঁহার কৃষ্ণ-স্ফূর্তি হইত, আর তিনি অচেতন হইতেন। অন্যের মনের ভাব দুইরূপে জানা যায়,—ভাষা দ্বারা আর নানা উপায় দ্বারা। এইরূপে মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কেহ স্বর বিকৃতি করেন, অঙ্গভঙ্গি করেন, কবিতার সাহায্য লয়েন ইত্যাদি। একজন মুখে একটি ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি সেই ভাবটি তাঁহার শ্রোতার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত হাত কি মাথা চালাইতে লাগিলেন, কি চক্ষের ভঙ্গি করিলেন, কি নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, কি ওষ্ঠ দুটি দৃঢ় করিয়া সংলগ্ন করিলেন।

আর এক উপায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করা। যেমন একজন সহজ স্বরে বলিলেন, "তুমি যাও", সে একরূপ। কিন্তু "তুমি যাও" এই কথাটি এরূপ কঠিন ভাবে জোরের সহিত বলা যায়, যাহা শুনিলে শ্রোতা ভাবিবে বক্তার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সে ঐ স্থান হইতে চলিয়া যায়।

আর একটি উপায় কবিতা দ্বারা! প্রকৃত কবিত্বের সাহায্যে কোন ভাব বর্ণনা করিলে তাহা যেরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করে, সামান্য ভাষায় তাহা হয় না।

অপর উপায় সঙ্গীত দ্বারা। টড্ সাহেব বলিতেছেন,—ভারতবর্ষীয় যে সঙ্গীত, তাহা দ্বারা মনুষ্যকে নানা ভাবে বিভাবিত করা যায়, অর্থাৎ হৃদয়ে দুঃখ কি আনন্দ উত্থিত করা যায়।

আর এক উপায় আছে, যাহাকে শাস্ত্রে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বলে। কিন্তু

প্রভু দেখাইলেন যে তাঁহার শরীরে অষ্ট কেন বহু-অষ্ট-সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পাইত। যথা হাস্য, রোদন, কম্প, স্বেদ, পরে মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

প্রভুর যে মনের ভাব তাহা, উপরে যতগুলি উপায় বলিলাম ইহার সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু আমার, ভাষা কি বর্ণনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সুতরাং প্রভুর যে মনের ভাব, ইহা আমি কিরূপে অবিকল ব্যক্ত করিব? তবে স্বরূপের কৃপায় জগৎ এই ভাবের আভাস কিছু পাইয়াছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রস দ্বারা জগৎ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আপনারা ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবেন, সে একরকম, তাহার তুলনা নাই। আমি দেখিয়াছি, একটি ভক্ত হাতে তালি দিয়া শুধু হরেকৃষ্ণ বলিয়া পদ গাইতেছেন, আর শ্রোতাগণ—কি ভক্ত কি অভক্ত—সকলেই বিগলিত হইতেছেন। কেন না, তাঁহার স্বরেতে তখন কি এক শক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

প্রভু স্বরূপের পানে চাহিয়া, আপনার বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ আর নাই। কথা এই, প্রভু স্বরূপকে বলিলেন যে, "কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে নাই, তিনি গিয়াছেন।" কিন্তু ইহা মুখে আইল না, কণ্ঠ রোধ হইয়াছে, কি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুত্র মরিয়াছে, এ কথা জননী মুখে আনিতে পারেন না, তাই যদি তাঁহার পুত্র মরিয়াছে এ কথা বলিতে হয়, তবে হাত নাড়িয়া দেখান যে, সে চলিয়া গিয়াছে। জননীর নিকট পুত্র মরা সংবাদ যেরূপ হৃদয়বিদারক, শ্রীপ্রভুর নিকট "শ্রীকৃষ্ণ নাই" এই কথা বলা তদপেক্ষা অনন্ত গুণে ক্লেশকর। তাই কৃষ্ণ আমার নাই, ইহা তাঁর মুখে আসিতেছে না, তাই আপনার হৃদয়ে হাত দিয়া সঙ্কেত দ্বারা জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করিলে, মহান্তগণ সকাল বেলা

গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, প্রভু কোথা চলিয়া গিয়াছেন। আর দেখেন যে, বাহির দুয়ারে মা শচী ঈশানের গাত্রে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার পরে বাসু ঘোষের পদ শ্রবণ করুন—

বাসুদেব ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারি;
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥

অর্থাৎ শচী মুখে বলিতে পারিতেছেন না যে, নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই ঈশানকে সঙ্কেত দ্বারা শুধু হাত নাড়িয়া আর মুখে বিষাদ মাখা লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সেইরূপ প্রভু কৃষ্ণ নাই, দেখাইলেন। স্বরূপ তাহাতে যেরূপ প্রভুর মনের হা-হুতাশ ভাব বুঝিলেন, পাঠক আমি তাহা কথায় কিরূপে তোমাকে বুঝাইব? কৃষ্ণ সম্মুখে আর তিনি রাগ করিয়াছেন, ইহাই ভাবিয়া প্রভু যখন বলিতেছেন, —বন্ধু, আমি তোমাকে দুটা মন্দ বলিয়াছি,—সে মনে, মুখে নয়, তাহাতে রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে রূঢ় কথা বলিতে পারি? প্রভু ইহা যেরূপ স্বরে ও মুখের ভঙ্গিতে বলিলেন, আমি তাহা কেবল 'ক' 'খ'য়ের সাহায্যে কিরূপে প্রকাশ করিব? তবে পাঠক! আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, অর্থাৎ সাধন ভজন করুন, তাহা হইলে আপনাদের আস্বাদ-শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন ক্রমে বুঝিবেন যে প্রভুর গম্ভীরা-লীলায় যে সুধা আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই। মহাপ্রভু শুধু কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই, করিতেও পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ, যাহাতে তিনি নিজে এবং যাঁহারা নিকটে আছেন তাঁহারা ভাসিয়া গিয়াছেন, আর অদ্যাবধি

ভাগ্যবান্ ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন,—তাহাতে ক খ গয়ের সমষ্টি ঠাঁই পাইবে কেন? তিনি সেই তরঙ্গ বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ হৃদ্‌বিদারক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন, যে সমুদায় ভাব ব্যক্ত করিতে প্রভু সহস্র কলসী আনন্দ-জল ফেলিয়াছেন, সমস্ত নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন, কি ক্লেশে, সহস্র বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা গিয়াছেন, আর প্রত্যেক মূর্চ্ছায় তাঁহার জীবনসংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়াছেন,—আমি তাহা শুধু কথা দ্বারা কিরূপে সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিব।

পাঠক মহাশয়! উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া, আমার এখন বাক্য দ্বারা যে গম্ভীরা বর্ণনা তাহা বিচার করুন। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ আমরা এক নিশির গম্ভীরা-লীলার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। ইহাতে পাঠক এই কয়েকটী বিষয় জানিতে পারিবেন। (১) সাধন ভজনের আরম্ভই বা কি, আর শেষই বা কি? (২) প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি? (৩) প্রভু গম্ভীরায় যেরূপ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা কি উপায়ে স্বরূপ ও রামরায়ের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু বক্তৃতা কি কথা দ্বারা মনের ভাব বড় ব্যক্ত করিতেন না,—অতি গূঢ় যে রস তাহা ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। যেমন নয়নজল ফেলিয়া সহজে কোন কথা বলিলে এক ফল হয়, আর কান্দিয়া বলিলে আর এক ফল হয়। এখন প্রভুর এ ক্রন্দন কেমন?

প্রভুর জীবনে যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা সৃষ্টিছাড়া। তোমার আমার কোন কারণে নয়নে জল উদয় হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর যে নয়নজল সে আর এক কাণ্ড। ভক্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রভু এক একবার শত কলসী নয়নজল ফেলিতেন।

অবশ্য একথা শুনিলে সকলেরই মনে হইবে যে ইহা অত্যুক্তি, কিন্তু তাহা বড় একটা নয়। প্রভুর নয়ন দিয়া যে জল পড়িত সে পিচকারীর ন্যায়। প্রভু যেখানে থাকিয়া রোদন করিতেন উহা কর্দ্দমময় হইত। একটি চিহ্ন দ্বারা প্রভুর নয়নে কত জল পড়িত তাহা পরিষ্কার জানা যায়। সমুদ্রতীরে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন ও হস্তে তালি দিতেছেন। সে বালুকাময় ভূমি, কিন্তু সেখানেও কর্দ্দমের সৃষ্টি হইয়াছে,—এমন কি চিত্রের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রভুর শ্রীপদ নৃত্য করিতে করিতে কর্দ্দমে ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই নিমিত্ত সেখানে পায়ের দাগ পড়িয়া যাইতেছে।

হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আনন্দ কি ভক্তির উদয় হইলে, নয়নজলের সহিত সর্ব্বাঙ্গে পুলকের সৃষ্টি হয়। সচরাচর সে পুলক যেন ঘামাচির মত। কিন্তু প্রভুর যে পুলক তাহার এক একটি বদরী ফলের ন্যায়। অধিকন্তু প্রত্যেক পুলকের উৎপত্তি স্থান হইতে রক্তোদ্গম হইত।

প্রভু যখন মূর্চ্ছা যাইতেন, তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতেন। কারণ কাহারও জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি তখন দেহে আছেন কি ছাড়িয়া গিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কিনা, উহা জানিবার এক উপায় নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখা, উহা চলে কি না। কিন্তু ঘোর মূর্চ্ছার সময় নাসিকায় তুলা ধরিলে উহা চলিত না। প্রভু এইরূপে কখন তিন প্রহর পর্য্যন্ত মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন।

প্রভুর আনন্দে যে নৃত্য তাহা অবর্ণনীয়; সে নৃত্য দেখিলে ভক্তির উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, ও আনন্দে সর্ব্বশরীর তরঙ্গায়িত হয়। প্রভু যখন হাস্য করিতেন, তখন কখন কখন এক প্রহরেও তাহা থামিত না। প্রভুর হাস্য চন্দ্র-কিরণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অতএব প্রভু

আপনার মনের ভাব শুধু কথার দ্বারা ব্যক্ত করিতে যাইতেন না। করিতে গেলে ফল তেমন হইত না। প্রভু আপনার মনের ভাব হাসিয়া, কান্দিয়া, নাচিয়া, মরিয়া প্রকাশ করিতেন।

কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার যে কি ক্লেশ হইত, তাহা তাঁহার মূর্চ্ছায় জানা যাইত। সেইরূপ কৃষ্ণ-মিলনের দ্বারা তাঁহার যে কি সুখ, তাহা তাঁহার নৃত্যে, প্রফুল্ল বদনে, চক্ষের ভঙ্গিতে ও হাস্যে প্রকাশ পাইত।

প্রভুর শিক্ষায় আর এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রভু যাহা শিক্ষা দিবেন সেই রসে যে রসিক তাহাকে আনিতেন; আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যদি প্রভুর ইচ্ছা হইত সে সখ্যরস সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, তবে তাহা আপনি না দিয়া ঐ রসের রসিক যে শ্রীদাম তাহাকে আপনার দেহে আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ তখন তিনি শ্রীদাম হইতেন, মহাপ্রভু থাকিতেন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই রূপে গম্ভীরায় ভজন-সাধন প্রণালী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনি আচরিয়া জীবগণকে দেখাতেন। প্রভু যেন একজন অতিশয় অনুতপ্ত বিষয়-মুগ্ধ জীব হইয়া স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট এই নিজকৃত শ্লোকটি পড়িলেন, যথা—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ইহার ভাবার্থ এই—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিত্যদাস, ভবার্ণবে হাবুডুবু খাইতেছি, কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলি সদৃশ মনে কর।"

জীবের এইরূপ ভজন-পথ প্রথম পথ অবলম্বন করিতে হয়। প্রভু ইহা কেন করিলেন? তিনি ত বিষয়ে মগ্ন নন, কৃষ্ণকেও ভুলেন নাই? তবে, করিলেন কেন? না, আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত।

আর একটি শ্লোকে প্রভু এই ভাবটি ও ঐ প্রার্থনাটী প্রস্ফুটিত করিলেন, যথা—

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

ইহার ভাবার্থ এই—একজন বিষয়মুগ্ধ জীবভাবে প্রভু বলিতেছেন, "আমি ধন জন ইত্যাদি চাই না, তবে এই চাই যে আমার জন্মে জন্মে তোমাতে অহেতুকী ভক্তি হউক।"

প্রভু দেখাইলেন যে সাধক এইরূপে আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার পরে আর এক শ্লোকে প্রভু বলিতেছেন, যথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। ইত্যাদি।

প্রভুর প্রার্থনা এই যে,—"হে ভগবান, তোমার বহু নাম আছে, আর সকল নামে তোমার শক্তি; এ নাম লইতে কোন নিয়ম কি বাধা নাই, অথচ আমার ইহাতে রুচি হইল না!"

এখানে সহজ ভজন কি তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইয়াছেন,—অর্থাৎ সহজ ভজন হইতেছে—শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্র; তাহা করিলে ক্রমে কৃষ্ণপ্রেম হইবে। অবশ্য যখন কৃষ্ণপ্রেম হইবে তখন সে ভজন আর এক প্রকার, সে ভজনে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইবে। নামের যে কি শক্তি তাহা প্রভু এই শ্লোকে বিবরিয়া বলিতেছেন—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।

অর্থাৎ "হে ভগবান! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিতে করিতে আমার নয়নে জল, অঙ্গে পুলক, কণ্ঠরোধ প্রভৃতি হইবে।"

এই সমস্ত কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। প্রভু দেখাইতেছেন, নাম গ্রহণ

করিলে এই সমুদায় ভাব হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হয়। তাহার পরে, যিনি কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাধন লাভ করিয়াছেন, তাহার কি কথা, তাহা প্রভু এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূণ্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

এই অদ্ভুত শ্লোকের যে ভাব তাহা প্রকাশ করিতে গম্ভীরায় প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় যাইত। এই বিরহ-বেদনা উঘাড়িয়া বলিতে যাইয়া প্রভু প্রত্যেক নিশিতে শত বার প্রাণে মরিতেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রভুর অপ্রকট

এই মতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥
চৈতন্যমঙ্গল।

ইহার বহুদিন পূর্ব্বে শচীদেবী অদর্শন হইয়াছেন। প্রভুর তখন বয়ঃক্রম আট চল্লিশ বৎসর, শক ১৪৫৫। তাহার পরে শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কয় ব্যথিত অন্তরে॥

সে আষাঢ় মাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়া থাকেন, সেইরূপ গিয়াছেন। প্রভু নিজ ভবনে বসিয়া, ও তাঁহাকে বেড়িয়া সকল

ভক্তগণ বসিয়াছেন। দুঃখের সহিত বৃন্দাবনের কথা বলিতে বলিতে প্রভু নীরব হইলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভু যদি উঠিলেন, সেই সঙ্গে ভক্তগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে প্রভু চলিলেন, কোন্ দিকে না মন্দিরের দিকে। কাজেই ভক্তগণ তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন।

নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিল মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কভু।
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত যেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল॥

এইরূপে প্রভু যখন মন্দিরে চলিলেন, ভক্তগণও তখন নীরবে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কারণ প্রভু এরূপ ভাবে ভক্তগণ ছাড়িয়া মন্দিরে কখন যাইতেন না, স্থতরাং ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পর (চৈতন্যমঙ্গলে)—

নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিল প্রভু অন্তরে উচাট॥

প্রভু দ্বারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন যেন জগন্নাথের বদন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, আর যেন এই নিমিত্ত জগন্নাথের সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রভু অভ্যন্তরে কখনও যাইতেন না, গড়ুর-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন। সে দিবস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া উঁকি মারিতে

লাগিলেন, যেন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, পরে একেবারে অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন।

এরূপ প্রভু কখন করেন নাই, সুতরাং ভক্তগণ প্রভুর কাণ্ড একটু বিস্ময় ও চিন্তার সহিত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিস্ময় একটি কারণে অনন্ত গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ প্রভু যেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি দ্বার আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আষাঢ় মাস, সপ্তমী তিথি, রবিবার, বেলা তৃতীয় প্রহর। প্রভু অভ্যন্তরে জগন্নাথ সম্মুখে, আর ভক্তগণ বাহিরে। প্রভু যে কি করিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ কপাট বন্ধ রহিয়াছে। ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অভ্যন্তরে হঠাৎ গোলমাল শুনিতে পাইলেন। সে শব্দ শুনিয়া সকলে বুঝিলেন, কি একটা মহাসর্ব্বনাশ হইয়াছে।

গুঞ্জাবাড়ীতে তখন একজন পাণ্ডা ছিলেন। যদিও ভক্তগণ বাহির হইতে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু সেই পাণ্ডাঠাকুর গুঞ্জাবাড়ী হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রভু একটি কাণ্ড করিলেন, কি কাণ্ড তাহা পরে বলিতেছি। সেই কাণ্ড দেখিয়া পাণ্ডাঠাকুরটী দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকার শুনিয়া বাহিরের ভক্তগণ তাঁহাকে দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন। দ্বার খোলা হইলে সেই পাণ্ডাঠাকুর নিম্নোক্ত কাহিনী বলিলেন।

তিনি বলিলেন,—প্রভু ভিতরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥

অর্থাৎ প্রভু মন্দির অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, কাতর স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। প্রভু কি বলিলেন শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ আর।
বিশেষতঃ কলি যুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥

প্রভু বলিতেছেন,—"সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি,—এই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন। হে জগন্নাথ! তুমি পতিতপাবন। এই কলিযুগ আসিয়াছে। এখন তুমি কৃপা করিয়া জীবকে আশ্রয় দাও!" প্রভু তখনও জীবের কথা ভুলেন নাই। এই কথা বলিয়া প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত-রায়!
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায়!!

অর্থাৎ পাণ্ডাঠাকুর দেখিতেছেন যে, প্রভু জগন্নাথকে এই নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পরে শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

পাণ্ডাঠাকুর সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলে বলিতেছেন, যথা—

গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি, সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুন হে পড়িছা।
ঘুচাও কপাট, প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥

উপরে যে "বিপ্রে দেখি" কথা আছে উহার অর্থ যে বিপ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার অর্থ এই যে, বিপ্রের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন,—"পরিছা-ঠাকুর শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভুকে দেখিব।"

তখন পড়িছা দ্বার খুলিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

ভক্ত আর্ত্তি দেখি কহে পড়িছা তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

অর্থাৎ গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আমি সমুদায় দেখিলাম, প্রভুকে দেখিলাম ও স্বচক্ষে তাঁহাকে জগন্নাথের সহিত মিলিত হইতে দেখিলাম।

এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।

এ কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ মরিলেন, কেহ কেহ বা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। যাঁহারা বাঁচিয়া উঠিলেন, তাঁহারা আর সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভুর সঙ্গোপন জানিয়া ভক্তগণের কি দশা হইল তাহা বিস্তার করিয়া আর বলিব না, বলিবার সাধ্যও নাই। আমাদের প্রভু যাইবার বেলা আমাদিগকে জগন্নাথ দেবের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। সঁপিয়া দিয়া আবার নিজে সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। আমাদের প্রভু কি সত্যই চলিয়া গিয়াছেন? তিনি যাবেন কোথায়? গেলে আমাদের উপায়? আমরা যে বড় বড় পরমেশ্বর, বড় বড় দেবদেবী ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মাথা বেচিয়াছি। তিনি যদি

চলিয়া যান তবে আমরা কোথায় যাইব! জীবনে অনেক সুখভোগ করিয়াছি, দুঃখও পাইয়াছি অনেক, দুঃখও মনে নাই, সুখও মনে নাই। মরণ সময় নিকটবর্ত্তী, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তুমি যদি যাবে তবে আমাদের কি থাকিবে?*

ষোড়শ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব

ভারতবর্ষে যেরূপ অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। ইহা কেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট ভারতবর্ষীয়গণের ও জগতের যে ঋণ তাহা অশোধনীয়। তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল—"তাঁহারা সকলের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবেন, অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগকে পালন করিবেন।" ইহাতে এই হইল যে, ব্রাহ্মণগণ উন্নতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য জাতীয়গণ উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিলেন, বরং ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। তখন বৈষ্ণবগণ শাক্তদের অপেক্ষা প্রবল হইয়াছেন,

* কোন স্থানে দেখিতে পাই যে, ভক্তগণ সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতন পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। দেখা গেল তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাদের হৃদয় ফাটিবার নয়।

কারণ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ভাল, ও নূতন জীবন। কিন্তু আবার বৈদিক ধর্ম্মের আধিপত্য বৃদ্ধি ও বৈষ্ণবধর্ম্মের পতন হইয়াছে। যখন গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল হইল, তখন অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বড় ভয় পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন সমাজে তাঁহাদের যে পদ ছিল, তাহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিলেন, বাক্যজালে যিনি তাহার যতরূপ আবরণের সৃষ্টি করিতে পারেন করুন, কিন্তু তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান জীবের একমাত্র উপাস্য, অন্যান্য দেবদেবী ভজনে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না, বরং এই শ্রীভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়—প্রেম ও ভক্তি; মন্ত্র তন্ত্র, যাগ ও যজ্ঞে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জীবকে যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাহা অন্য রকম। তাঁহারা বলিলেন—যাগ যজ্ঞ কর, শীতলা মনসা প্রভৃতির পূজা কর। আর সমুদয় কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইও, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ ইহাতে অধিকারী নয়। এইরূপে ব্রাহ্মণকে কর দেওয়াই হইল অপর সকলের ধর্ম্ম-চর্চ্চার প্রধান অঙ্গ। আর এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির নিকট তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই কর আদায় করিতে লাগিলেন। সন্তান গর্ভে প্রবেশ করিলে পঞ্চামৃত, তার পরে জন্ম হয়। জন্ম হইলে ষষ্ঠিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে কর দিতে হয়। মরিয়া গেলেও কর দেওয়া স্থগিত হইল না। তারপর বার্ষিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ ইত্যাদি আছে। এইরূপে অন্যান্য জাতি জন্মের পূর্ব্ব হইতে মরণের পর বহুদিন পর্য্যন্ত কর দিতে লাগিলেন। এইরূপ অদ্ভুত কর স্থাপন জগতে আর কোথায়ও দেখা যায় না।

অতএব জীবের ধর্ম্ম কি রহিল, না—ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া। দোল দুর্গোৎসব ত আছেই, ইহা ছাড়া তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা—

পূজা কিনা ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া; উত্তম আহার, দক্ষিণা, কাপড়, ইত্যাদি।

আবার গুরুরূপে ব্রাহ্মণগণ কর্ণে মন্ত্র দিলেন এবং সেই হইতে শিষ্য তাঁহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। তখন হইতে গুরুর আর কিছু করিতে হয় না। শিষ্যবাড়ী গমন করিলে শিষ্যের গোষ্ঠীবর্গ তাঁহার চরণে মস্তক কুটিবে, তাহার অর্থ থাকুক বা না থাকুক, গুরুকে দিতেই হইবে। এই যে নানাবিধ উৎসব ও দেবদেবীর পূজা, ইহা সমুদায় ব্রাহ্মণগণের হস্তে, অন্যান্য জাতি কেবল তাহার ব্যয় বহন করিবে মাত্র।

যখন হিন্দুগণের এইরূপ অবস্থা,—যখন আচার্য্যগণ এইরূপ বিষয়-লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া শিষ্যগণের বিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন—যখন গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই স্তোক-বাক্য বলিয়া নানাবিধ উৎসব সৃষ্টি করিয়া, শিষ্যের নিকট অর্থ লইতে লাগিলেন,—যখন এইরূপে ভগবানের নাম লইয়া, "আমি পতিতপাবন" এইরূপ ভান করিয়া আচার্য্যগণ স্বচ্ছন্দে বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন,—যখন ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পাদোদক পানে পাপের শান্তি হয়,—তখনই শ্রীভগবান নবদ্বীপে উদয় হইলেন।

যদি আচার্য্য ভাল হন, তবে শিষ্য মন্দ হইলেও তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখন বিষয়-লোভে আচার্য্যগণ, শিষ্যকে গলায় বান্ধিয়া, আপনারা নরককুণ্ডে ঝম্প দিতে লাগিলেন, তখন শ্রীভগবান আর থাকিতে না পারিয়া, কৃপার্ত্ত হইয়া, আচার্য্য ও সাধারণ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের ভাল লাগিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সারমর্ম্ম পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি।

শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাকে কেবল প্রেমভক্তিতে পাওয়া যায়। অতএব শ্রীভগদ্ভক্তি ও প্রেমই পরমপুরুষার্থ, আর শ্রীভগবদ্ভক্তই মুক্ত জীব।

এখন প্রেমভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় হইল, তবে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব-পার্ব্বণ সমুদয় গেল। কারণ সে সমুদয়ে প্রেমভক্তি নাই। আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ যে অনায়াসে অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা সমুদয় গেল।

কাজেই ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ যে, এইরূপে আপনাদের ও তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এরূপ নয়, সমাজে অপরিসীম সম্মানও লাভ করিতেন। তাঁহারা অন্যান্য বর্ণের নিকট কিরূপ সম্মান দাবী করিতেন, তাহা সকলেই জানেন। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই গুরু, বিপ্রপাদোদক পান করিলে সমস্ত আপদ নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণকে মারিতে নাই, ব্রাহ্মণ অবধ্য। ব্রাহ্মণকে উপবাসী রাখিয়া আপনারা ভোজন করিতে নাই।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণের শুধু উপার্জ্জনের পথ গেল তাহা নহে, সমাজে সম্মান যাইবার যো হইল,—যেহেতু ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই গুরু। আবার গৌরাঙ্গের উপদেশ হইল —যে ভক্ত সেই কেবল পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবু সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—এই আমাদের প্রভুর শিক্ষা। কাজেই ব্রাহ্মণগণ একেবারে মারমার কাটকাট করিয়া উঠিলেন।

স্বার্থ লইয়া যেখানে এইরূপ টানাটানি, সেখানে একটী ব্রাহ্মণেরও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ না করিবার কথা। কিন্তু তবু অনেকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মনে ভাবুন, ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে, বলরাম মিশ্র তাঁহার নিকট

মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। এরূপ সমাজবিরোধী কার্য্য তিনি কেন করিলেন? ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, তাঁহার নিকট বলরাম মিশ্র মন্ত্র লইলে সমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এইরূপ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সমাজে তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা কন্যা বহুতর উৎপীড়িত হইলেন। সমাজ-সম্মত পথসকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ঐরূপ ঘোর বিপরীত পথে কেন চলিলেন?

কেন চলিলেন তাহার কারণ বলিতেছি। শেষ ভালই ভাল,—পরকালের ভালই প্রকৃত ভাল, ইহকালের সম্পত্তি কিছুই নহে। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তবুও তাঁহারা পতিত। অন্যকে পথ দেখান অনেক দূরের কথা, আপনারাই পথ না পাইয়া গর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। আপনারা গর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অন্যকে উদ্ধার করিতে যাওয়া যেরূপ হাস্যকর, তাঁহাদের পক্ষে আপনারা অসিদ্ধ সত্ত্বেও, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া শিষ্যের উদ্ধারের ভার ঘাড়ে লওয়া, সেইরূপ হাস্যকর। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপে অন্য জীবকে ষষ্ঠী-মাকাল পূজা করাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা ঘোর বঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নহে। এই সমস্ত ভাবিয়া, অন্যকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়া আপনারা যাহাতে উদ্ধার হয়েন তাহাই তাঁহারা করিলেন। এইরূপ সমাজবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করায়, তাঁহাদের প্রতি সমাজে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? অন্তিমে নিত্যধামে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে চিরদিনের জন্য পাইবেন, এই আশায় তাঁহারা সমুদয় সহিয়া থাকিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ হইলে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহারা জয় জয় করিয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক

পদতলে দলিত হইতেছিলেন। আবার ব্রাহ্মণেরাও মার মার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম ভীরু, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের মত অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ধর্ম্মভীরু লোকের সংখ্যা অতি অল্প।

যত দিন বৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল ছিলেন, ততদিন শাক্তগণ ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ক্রমে যখন প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার যতরূপ পথ আছে ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদয় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। আর কায়স্থ ও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত রহিয়া গেলেন। এইরূপে দুইটি দল হইল। বৈষ্ণবগণের দলে রহিলেন, অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এবং সমুদয় নবশাখগণ। আর, শাক্তগণের দলে রহিলেন প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ, প্রায় সমুদয় কায়স্থ, আর প্রায় সমুদয়-বৈদ্য।

নবশাখগণ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায় এবং তাঁহারা নিরীহ ভালমানুষ ও ব্যবসা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। যে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য তাঁহাদের নেতা, তাঁহারা সাধু ভক্ত। "তৃণাদপি" শ্লোকের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি গঠিত। তাঁহারা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও সমাজের অসীম পদস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পারিবেন কেন? সুতরাং রাজদ্বারে বৈষ্ণবগণ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন; এবং ব্রাহ্মণগণ জমিদারগণ দ্বারা এমন কি কাজীকে হাত করিয়া "বৈরাগী বেটাদের" টিকি কাটিতে লাগিলেন।

এইমাত্র বলিলাম, বৈষ্ণবগণের অস্ত্রশস্ত্র ভাল ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের দল ক্রমে বাড়িয়া চলিল। ইহার ফলে ক্রমে দেশে দুইটি পৃথক দল হইল। তখন বৈষ্ণবগণ এরূপ প্রবল হইয়াছেন যে, "বৈরাগী বেটারা" বলিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিবার পথ রহিল না। কারণ

বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগকে শাক্তগণ পূর্ব্বে সম্মান করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "বৈরাগী বেটারা" বলিতে পারিলেন না। ক্রমে কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল শ্রবণ করুন। বৈষ্ণবগণ ক্রমে ব্রাহ্মণের "ঠাকুর" উপাধি কাড়িয়া লইলেন, আর আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব ঠাকুর' বলিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণগণ যে পতিতপাবন ছিলেন, তাহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে চাহিলেন না,—তাঁহারা আপন উদ্ধারের নিমিত্ত 'বৈষ্ণব-গোসাঞির' নিকটই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যথা পদ—

আজ মোরে কৃপা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
তোমা বিনা গতি নাই---ইত্যাদি।

ঝড়ু ঠাকুর ভূঁয়েমালি, অস্পৃশ্য জাতি, ভক্তির বলে তিনি হইলেন 'ঝড়ু ঠাকুর', আর বড় বড় ভক্তগণ তাঁহার প্রসাদ পাইতেন।

যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন শাক্তগণ বড় ক্লেশ পাইলেন। কারণ রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, অতি অল্প বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় সমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন। সেখানে শাক্ত পণ্ডিতগণও গিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—"কবিরাজ! শিবকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু জান না কি যে, তোমার কৃষ্ণ শিবকে পূজা করেন? তাহাতে রামচন্দ্র দুটি শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নীরব করিলেন, যথা।—

শৈবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিনোঽপি শৈব স্বয়ং।
তথা সমতয়াথবা বিধিহরাদিমূর্ত্তি ত্রয়ং॥

বিলোক্য ভব বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গ ক্রমং।
প্রণম্য শিরসাহিতৌ বয়মুপেন্দ্র দাস্যং শ্রিতাঃ ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই—শিব বিষ্ণুর উপাসক বিধায় বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিম্বা বিষ্ণু শিবের উপাসক বিধায় শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তবৃন্দের শাস্ত্র অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবানের দাসত্ব আশ্রয় করিয়াছি।

প্রহ্লাদ ধ্রুব রাবণানুজ বলি ব্যাসাম্বরি যাদয়োঃ
স্তে বিষ্ণুপরায়ণা বিধিভব শ্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ
যে হন্যে রাবণ বাণ পৌণ্ড্রবৃক ক্রোঞ্চ * * অহো
যদ্ভক্তা নচ তৎপ্রিয়াং নচ হরে স্তস্মার্জ্জগদ্বৈরিণঃ।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষ্ণু-পরায়ণ, এ কারণ তাঁহারা মহাদেব ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও জগন্মঙ্গলকারক।

রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রবৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হয় নাই ও হরিরও প্রিয় হয় নাই, সুতরাং জগদ্বৈরী হইয়াছিল। ইত্যাদি।

রামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব্ব উত্তর বিচার করুন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, "আমরা দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণকে প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রভৃতি ভজন করিয়া জগতে ও দেবগণের মান্য হইয়াছেন। কিন্তু শিব ও ব্রহ্মার ভক্তগণ—যথা রাবণ বাণ প্রভৃতি—জগতের বৈরী ও দেবগণের অপ্রিয় হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, মহাদেবকে নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের এই স্বাভাবিক চরম। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের বীজ একটি। সেটি এই যে,—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন, জীবের প্রতি কৃপার্থ

হইয়া নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবকে উপদেশ দিয়া জীবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া শেষে জীবের মুখচুম্বন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ। ইহাতেই চৌষট্টি রস আছে। যাঁহার হৃদয়ে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাঁহার আর কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মধু হইতেও মধু, সরল হইতেও সরল, এই অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। ইহাতে যাগ, যজ্ঞ, দেবদেবী পূজা, কিম্বা কৌলিন্যের, জাতীয় ও বংশের গৌরব কিছুই থাকিল না।

এইরূপে পরিশেষে শাক্তগণ আলোচাল ও কলা লইয়া, আর বৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তি লইয়া থাকিলেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ জয় হইল।

কিন্তু এখন আবার বৈদিক-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। এখন আর সেই নয়নধারা নাই, বাহু তুলে নৃত্য নাই, ধূলায় গড়াগড়ি নাই। প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল আবার তাহাই হইয়াছে। এখন আর শাক্ত-বৈষ্ণবে বড় প্রভেদ নাই। শাক্তধর্ম্মের সার আলোচাল কলা, বৈষ্ণবধর্ম্মের সারও প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইতেছে, বৈষ্ণবগণও ক্রমে কর্ত্তব্যে শাক্ত হইতেছেন।

বৈষ্ণবগণ প্রবল হইলে শাক্তগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া সমুদয় সহিয়া থাকিতেন। শেষে বলবান হইলে, ক্রমে তাঁহারা দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে এই বিবাদ হাস্যরসের প্রস্রবণ হইল। হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদের কথা সকলে জানেন। হিন্দুরা কলা-পাতার যে পৃষ্ঠে ভোজন করেন, মুসলমানেরা তাহা উল্টাইয়া লইলেন। হিন্দুর গাড়ু, মুসলমানের বদনা। হিন্দুরা গোঁফ রাখেন দাড়ি ফেলেন, মুসলমানেরা গোঁফ ফেলেন

দাড়ি রাখেন। এইরূপে বৈষ্ণব বলেন তরকারী বানান, শাক্ত বলেন তরকারী কুটা। দাশরথী রায় আমোদ করিয়া এই কোন্দল বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, বৈষ্ণব কালীতলার হাটে যান না, শাক্ত কৃষ্ণনগরের বাজারে যান না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময়কার একটী ঐতিহাসিক কাহিনীর দ্বারা প্রকাশ পাইবে যে, প্রভুর ধর্ম্ম তখন ভারতবাসীর চিত্ত কিরূপ অধিকার করিয়াছিল। জয়পুরের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পরকীয়া রসতত্ত্ব আক্রমণ করিলেন; করিয়া স্বকীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। বিচারে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু জয়পুরের রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বঙ্গে পাঠাইলেন। আসিবার সময় তিনি পথে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণকে পরাস্ত করিয়া পরে শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদেব নবদ্বীপে জয়পত্র চাহিলেন, কিন্তু বিনাবিচারে নদীয়াবাসীরা উহা দিতে সম্মত হইলেন না। পরে তখনকার নবাব জাফর খাঁর আনুকূল্যে এক প্রকাণ্ড সভা হইল; সেই সভায় কৃষ্ণদেব রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাস্ত হইলেন, ইনি আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র,—বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও পদসংগ্রাহক।

এ সম্বন্ধে যে দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের গোস্বামীদিগের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলিলেন—"আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থায়ী হয়, তাহাই লইব,—এইমত প্রতিজ্ঞা করিলাম।" এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল।

তিঁহো কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজে হয় না। অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেই মত সভাসদ হইল। শ্রীপাট নবদ্বীপের কৃষ্ণরাম

ভট্টাচার্য্য, তৈলঙ্গদেশের রামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনগর গ্রামের রামরাম বিদ্যাভূষণ ও লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, গয়রহ, কাশীর হরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মইনা।*

তখনকার বিবাদের অবস্থা আর একটা কাহিনী দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে। পুঁটিয়া রাজধানীতে রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে দুইজন বৈষ্ণব অতিথি হইলেন। রাজা ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের শিষ্য, ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবগণ অতিথি হইলে পূজারী ব্রাহ্মণ দুই থালা ভরিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। বৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার প্রসাদ? পূজারি বলিলেন, "কালীর প্রসাদ।"

অমনি বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

এই কথা রাজার কর্ণে গেল। বৈষ্ণবগণের আর রাত্রে আহার হইল না। প্রাতে যখন তাঁহারা চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন প্রহরীরা তাঁহাদিগকে আটক করিল। তারপর রাজা আসিলেন, "বৈরাগী বেটাদের" ডাকাইলেন, তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। শেষে কয়েক দিবস অবধি পুঁটীয়ার ঘর পরম বৈষ্ণব হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণের অস্ত্র শস্ত্র ভাল ছিল। কাজেই শাক্তগণ যুদ্ধে হারিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, উহা মাধুর্য্যময়। বৈষ্ণবগণের অপূর্ব্ব ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা ব্রজরস আস্বাদন করিয়া মোহিত হইলেন। শাক্তগণের উহা কিছু ছিল না।

---

* শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ফাল্গুন ১৩০৬।

তাঁহাদের সাধন-ভজন কেবল যাগ যোগ প্রক্রিয়া লইয়া। তাহাতে প্রেম, কি ভক্তি, কি কোন রসের সংস্রব ছিল না। দশ ঘড়া ঘৃত পোড়াও, কি দশ শত পশু বধ কর, তাহাতে হৃদয় দ্রব কি উন্নত হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণবের দাস্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমে মধুর-রসের আশ্রয় লইয়া অনায়াসে রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। শাক্তগণ প্রথমে এই রসাস্বাদন প্রথাকে ঠাট্টা করিতেন। তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে "ভাবুক বেটারা" বলিয়া গালি দিতেন। রসকে "ভাবকালি" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু মুখে ঠাট্টা করিলে কি হয়, প্রেম ও ভক্তি সহজেই মিষ্টি জিনিষ। প্রায় জীবমাত্রেই উহা আস্বাদ করিয়া পুলকিত হয়েন। শাক্তগণ দেখিলেন যে, বৈষ্ণবগণের রসাস্বাদন স্বরূপ যে সুখের প্রস্রবণ আছে, তাহা তাঁহাদের নাই। আর সেই রসে আকৃষ্ট হইয়া অনেক শাক্ত বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও আপনাদের মধ্যে রসের সৃষ্টি করা প্রয়োজন বোধ করিলেন।

রসের সৃষ্টি করিতে গেলে, নায়ক-নায়িকার প্রয়োজন। কাজেই তাঁহাদের নায়ক হইলেন মহাদেব। কিন্তু মহাদেবকে লইয়া মধুর-রস উঠাইতে পারিলেন না। যেহেতু মহাদেবের আকার সন্ন্যাসী ও সাধুর মত,—নাগরের মত নয়। মধুর-রসের নাগর যদি ভস্মাবৃত সন্ন্যাসী হয়েন, তবে রসভঙ্গ হয়। আর পার্ব্বতী সখী নহেন, তিনি জননী। বাবা-সন্ন্যাসী ও মা-জননীকে লইয়া মধুর রস হয় না। শাক্তগণ সখ্য-রসও সৃষ্টি করিতে পারিলেন না, কারণ মহাদেবের সখা কেহ নাই।

সুতরাং তাঁহাদের দাস্য ও এক প্রকার "কাল্পনিক" বাৎসল্য রস লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। এইরূপে আগমনী ও বিজয়ার সৃষ্টি হইল। গিরি হইলেন নন্দ, গিরিরাণী যশোদা, উমা হইলেন কৃষ্ণ। উমা শ্বশুর বাড়ী গিয়াছেন। গিরিরাণী কান্দিতে লাগিলেন,—যেমন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের

বিরহে কান্দিয়াছিলেন। যশোদা বলেন,—"নন্দ, আমার গোপালকে কোথা পাঠাইয়া দিলে ; তাহাকে আনিয়া দাও"। গিরিরাণী বলিলেন,—"গিরিরাজ, আমার উমাকে আনিয়া দাও।"

বৈষ্ণবেরা গান করেন "দেখে এলাম চিকন কালা" ইত্যাদি ইত্যাদি। শাক্তেরা গায়েন "গিরি যাও আন গিয়া আমার উমারে।" এইরূপে শাক্তগণ তাঁহাদের ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ রস প্রবেশ করাইলেন। আমরা শাক্তগণকে উমার কথা লইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণবগণের যে নন্দ-যশোদা লইয়া বাৎসল্য রস ইহা স্বতন্ত্র জিনিষ। এই বাৎসল্য রস গিরিরাজ ও উমার দ্বারা সৃষ্ট বাৎল্য রস হইতে আকাশ পাতাল পৃথক।

আবার বৈষ্ণবগণের যুগলমিলন আছে, যাহা জীবের পঞ্চমপুরুষার্থ। শ্রীভগবানের পার্শ্বে শ্রীমতী রাধাকে রাখিয়া তাঁহারা যে ভজনা করেন, সে মাধুর্য্যরস বর্ণনাতীত। কিন্তু শাক্তগণের সেরূপ কিছু ছিল না। সেই শাক্তগণের এইরূপ একটী দৃশ্যের দরকার হইল। কিন্তু হরপার্ব্বতীকে লইয়া যুগলমিলন করিতে পারিলেন না, যেহেতু পার্ব্বতী হইতেছে মা, আর হর পিতা এবং তাহার রূপ নাগরের মত নয়। তখন তাহারা বৈষ্ণবের মিলন-গীতের স্থানে, আর একরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করিলেন। বৈষ্ণবগণ গায়েন "কি শোভা শ্যামের বামে" ইত্যাদি ; শাক্তগণ তাহার পরিবর্ত্তে গাহিতে লাগিলেন, "কেগো কালাঙ্গি উলঙ্গি বামা নাচিছে।"

শাক্তগণের এই যে কালী উলঙ্গ হইয়া মনুষ্যবক্ষাবৃত স্থানে নৃত্য করিয়াছেন, এরূপ চরম দৃশ্য উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের 'সৌন্দর্য্য', ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের 'বিভীষিকা' পূজা করেন, তাঁহাদের দর্শনীয় বস্তু, সেই নিমিত্ত কি হইলেন, না—"বিকট-দশনা রুধির-মগনা, বামা-বিবসনা ইত্যাদি" কাজেই শাক্তের ভজনে আদৌ

প্রেমভক্তি ছিল না, থাকিতেও পারে না। সেই ভজনে ছিল কি, না—সাধনা দ্বারা সিদ্ধি বা শক্তি আহরণ করা। সুতরাং উহার সহিত রসের কোন সংস্রব ছিল না। তান্ত্রিক মতানুসারে একটি দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বাধ্য করিয়া সিদ্ধি আহরণ করাই এই শাক্তধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণবেরা কুঞ্জভঙ্গের সময় গাইয়া থাকেন, "এমনি ভাবে থাকুক মোদের যুগলকিশোর ইত্যাদি"। শাক্তেরা দেখাদেখি নবমী-নিশীতে গাইতে লাগিলেন, "নিশি তুমি প্রভাত হইও না, তুমি পোহাইলে উমা না রহিবে ঘরে" ইত্যাদি।

আগমনী ও বিজয়াতে কিছু রস আছে বলিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রামপ্রসাদের ভক্তি-অঙ্গের গীতগুলিও মধুর, কিন্তু এ সমুদয় বৈষ্ণবগণের সামগ্রী, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতেই এই সমুদয় গীতের বীজ লওয়া হইয়াছে—ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভক্তির তরঙ্গ জগতে আনেন, তাহারই ছায়া লইয়া শাক্তগণ নিজ নিজ দেবতাগণের উপাসনায় সন্নিবেশ করেন। রঙ্গ দেখুন, রামপ্রসাদ শক্তিকে বলিতেছেন,—"মা তোর মায়া নাই" ইত্যাদি। এখন শ্রীভগবানকে 'তুই মুই' করা, কি এরূপ নিজজন ভাবিয়া ভজন করা, শ্রীগৌরাঙ্গই জীব-সাধককে শিক্ষা দেন। কালী কি দুর্গাকে "তুই মুই" করার নিয়ম পূর্ব্বে ছিল না। কালী বা দুর্গার সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইয়া এরূপ তুই মুই করিতে পূর্ব্বে কাহারও ইচ্ছা বা সাহস হইত না, প্রয়োজনও হইত না। শাক্তগণ কালী কি দুর্গাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত করিয়া "আমাকে ইহা দাও, তাহা দাও" বলিতেন,—তাঁহাদের সহিত শাক্তগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না।

সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদ যখন বৈষ্ণবগণের ভাব হইয়া কালী ঠাকুরাণীকে বলেন,—"মা! আমায় কোলে নে" তখন রসভঙ্গ হয়, —ঠিক ভাবশুদ্ধ হয় না। যাঁহার হাতে খাঁড়া, গলায় নরমুণ্ড, লোল জিহ্বা দিয়া মনুষ্যের রক্ত পড়িতেছে, তাঁহাকে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ভয় ও পূজা করা যায়,—মা বলা যায় না। যেমন সরস্বতীকে গোঁফ দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্ডমালিনীকে 'মা' বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন, যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় মুণ্ডের মালা ঝুলিতেছে তাহার স্তন্যদুগ্ধ কি পান করা যায়?

তাই রামপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির ভাব লইয়া ভয়ঙ্করে যোগ দিতে গিয়াছেন, কাজেই রসভঙ্গ হইয়াছে। "তুই মা কোলে নে," শাক্তগণের ইহা নিজস্ব ভাব হইলে, তাঁহারা মাতার গলায় নরমুণ্ডমালা, হাতে খাঁড়া দিতেন না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবার মত আকার ও বেশভূষা দিতেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে শাক্তধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম, আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে, সম্পূর্ণ পৃথক আকার ধারণ করিল। ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন "নাহি মানি দেবী দেবা"। ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে যাগ যজ্ঞ, দেবী-দেবার পূজা, এমন কি জাতিবিচার পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

অবতার তত্ত্ব

আমরা চারিটি নূতন ধর্ম্ম-প্রচারের কথা শুনিয়া থাকি, যাহাদিগকে মোটামুটি লোকে অবতার বলে। প্রথম বুদ্ধ, দ্বিতীয় যীশু, তৃতীয় মহম্মদ ও চতুর্থ গৌরাঙ্গ। শেষোক্ত বস্তুটি যে অবতার রূপে পূজিত, তাহা বিদেশীগণ জানিতেন না। বিবি ব্লাভাট্স্কিই প্রথম তাঁহার গ্রন্থে গৌরাঙ্গকে শেষ অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলাম, কারণ তিনি লীলাময় ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েন,—ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন না।

প্রচারকার্য্যে বুদ্ধ ও তাঁহার গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু এই বৌদ্ধধর্ম্ম আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আমরা শুনিয়া থাকি কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহাতে বোধ হয় বৌদ্ধগণ তাহার পূর্ব্বে আমেরিকায় গমন করেন।

বৌদ্ধগণ শ্রীভগবানকে স্বীকার করেন না। অপর কয়েকটি অবতার ভগবানে ভক্তি-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টিয়ানগণ বলেন যে যীশু শ্রীভগবানের একমাত্র পুত্র। মহম্মদ বলেন যে যীশুও অবতার, তিনিও অবতার, তবে তিনি যীশু অপেক্ষা বড় আর তিনিই শেষ অবতার, ভগবান পৃথিবীতে আর অবতার পাঠাইবেন না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন (গীতায় "যদা যদাহি" শ্লোক দেখ) যে, যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয় সেখানে অবতার যাইয়া অধর্ম্মকে পদচ্যুত করিয়া ধর্ম্মকে স্থাপন করেন।

আমরা দেখিতেছি গীতার যে উক্তি ইহাই ঠিক। কারণ যদি খৃষ্ট অবতার হয়েন, তবে অবশ্য মহম্মদ অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার। ইহাতে খৃষ্টিয়ানদিগের মত—যীশুই কেবলমাত্র অবতার,—ইহা থাকে না। আর মহম্মদ বলেন যে, তিনিই শেষ অবতার,—ইহাও মনে ধরে না। কারণ ইহা অস্বাভাবিক,—ক্রমোন্নতিই স্বভাবের নিয়ম। অতএব মহম্মদ যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহার পরে মনুষ্য আর কিছু শিখিবে না—ইহা অস্বাভাবিক।

আমরা উপরে বলিলাম যে, শেষোক্ত তিনটি অবতারই ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তবে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির কথাই অধিক। ইহা করিও না দণ্ড পাইবে, ইহা করিও পুরস্কার পাইবে,—ইহাই খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। মহম্মদীয় ধর্ম্মে ভক্তির কথা বেশ আছে, কিন্তু মহম্মদ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-পূজা কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মেই আছে, আর কোন ধর্ম্মেই নাই।

কথা এই, আমরা শুনিয়া থাকি যে শ্রীভগবানকে জ্ঞানে পাওয়া যায়, আবার ইহাও শুনি যে তিনি জ্ঞানাতীত ও মায়াতীত। তাহা যদি হইল, তবে শ্রীভগবানকে আর পাওয়া গেল না। প্রকৃতই তিনি এত বড় যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না। তবে মানুষের উপায় কি? তাঁহাকে কি রূপে পাইবে? তাই বৈষ্ণবগণ বলেন যে, যদিও তিনি জ্ঞানময়, তবু তিনি প্রেমময় বটেন। প্রেমময় কেন?

আমরা দেখি তাঁহার সৃষ্টি যে মনুষ্য তাহাতে প্রেম আছে। যাহা তাঁহার সৃষ্টবস্তুতে আছে, তাহা তাঁহাতে নাই, ইহা হইতে পারে না। অতএব তাঁহার যদি প্রেম না থাকিবে, তবে তিনি মনুষ্যকে প্রেম কিরূপে দিলেন?

অতএব তাঁহার প্রেম আছে। তবে কতখানি? অবশ্য অপরিমেয়, অর্থাৎ তিনি প্রেমময়। তাহা যদি হইল, তবে তুমি যদি তাঁহাকে ভালবাস, তবে তিনি তোমাকে অবশ্য ভালবাসিবেন। এই কৃষ্ণপ্রেমের নাম মাত্র অন্য ধর্ম্মে শুনা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে এই প্রেম—প্রথমে, মধ্যে ও শেষে।

খৃষ্টিয়ান-ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি য়ীহুদীর ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের যিনি ঈশ্বর তিনি তাঁহার দলস্থ জীবের পক্ষপাতী, অন্যান্য জীবের ঘোর শত্রু। অথচ তাঁহারা ইহা বলেন যে, তিনি একা, তিনি সব মনুষ্য সৃষ্টি করেছেন ও সকলের পিতা। এই য়ীহুদীদিগের ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ বধ করিতে, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যাঁহারা মহম্মদীয়গণের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লয়েন, তাঁহারা সূর্য্য-পূজা করিয়া থাকেন। তবে ইহা ঠিক যে, মহম্মদের যিনি ঈশ্বর তিনি সেই দলস্থ লোকের পক্ষপাতী। তিনি নাকি, যে তাঁহাকে না মানে তাহাকে বধ করিতে বিধি দিয়াছেন। তাই লোকে বলে যে, মহম্মদ বাহুবল দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। যাহা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন।

যীশু দ্বাদশজন মূর্খ শিষ্য রাখিয়া যান। মহম্মদ অনেক শিষ্য করিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি এক নূতন প্রকারের। তিনি মক্কা অধিকার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে তাহাকে ঈশ্বরের দোস্ত না বলিবে তিনি তাহাকে বধ করিবেন। তাই একদিনে মক্কার অধিবাসীরা মুসলমান হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কোটী কোটী শিষ্য রাখিয়া যান। তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি

কি তাহা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। তিনি জীবকে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা সমস্ত দেশ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন!

গৌরলীলায় যে একটি ঘটনা আছে, তাহার ন্যায় ঘটনা জগতে আর কোথাও শুনা যায় না, তাহার মত ঘটনা অনুভব করাও যায় না, আর সে ঘটনা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণও রহিয়াছে। সেটি এই যে,—এই অবতারে শ্রীভগবান জীবের সহিত এক প্রকার প্রত্যক্ষরূপে ইষ্টগোষ্ঠি ও কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। অবএব গৌর-লীলা যিনি না পড়িয়াছেন তিনি হতভাগ্য!

এক্ষণে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কয়টি সার তত্ত্ব এই স্থানে বলিব।

প্রথম। গীতায় শ্রীভগবান বলেন যে—"যদা যদাহি ইত্যাদি"। অর্থাৎ যেখানে যেখানে অধর্ম্মের প্রাবল্য হয়, সেইখানেই ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত অবতার উদয় হয়েন। শ্রীকালাচাঁদ গীতা গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিচার আছে।

দ্বিতীয়। শ্রীভগবানের উক্তি, যথা—"যিনি আমাকে যেরূপ ভজনা করেন, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।"

তৃতীয়। তিনি বলিয়াছেন যে,—"যিনি আমাকে স্বার্থের নিমিত্ত ভজনা করেন, তিনি আমাকে ভজনা করেন না, তিনি আপনাকেই ভজনা করেন।"

চতুর্থ। সাধারণ জীবের প্রতি উপদেশ এই যে, "ভগবৎ-কীর্ত্তনের ন্যায় শ্রীভগবানের চরণ-প্রাপ্তির সহজ ও নিশ্চিত উপায় আর নাই।

অবশেষে শ্রীবৈষ্ণবগণ পাপ পুণ্য এক প্রকার মানেন না। তবে কি মনুষ্য বধ করিলে তাহার দণ্ড নাই? আছে। এক্ষণ বৈষ্ণবতত্ত্ব অর্থাৎ মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিচার করুন। তাঁহার এক আজ্ঞা—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম-প্রয়োজন।"

অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম আহরণ করাই জীবের প্রধান কার্য্য। যিনি ইহাতে সুসিদ্ধ হন, তাঁহার আর কিছু করিতে হইবে না—এমন কি, এরূপ লোকের পক্ষে সন্ন্যাসও নিষ্প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ব্যতীত অপর সকলে বলেন যে, কর্ম্মফল সকলকেই মানিতে হইবে, তাহা হইতে কাহারও বাঁচিবার যো নাই। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম্ম ও ভগবান ইহার বড় কে? কর্ম্ম না ভগবান? যদি বল কর্ম্মফল এড়াইবার কাহার যো নাই, তবে ভগবান কেহ নহেন, তিনি আমাদের ভাল মন্দ করিতে পারেন না, কর্ম্মই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাহা হইলে নাস্তিকতা আসিল।

বৈষ্ণব বলেন, ভগবান বড়, কর্ম্ম তিনি ইচ্ছা মাত্র ধ্বংস করিতে পারেন। যেমন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী জগাই মাধাই—বিস্তর স্ত্রীপুরুষ বধ করিয়াও—প্রভুর ইচ্ছা মাত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া মহান্তদলে স্থান পাইলেন।

ফল কথা, যাঁহার প্রেম কি ভক্তি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানাকৃত পাপ এক প্রকার অসম্ভব। মহাপ্রভু তাই বলিয়াছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর" ইত্যাদি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নদীয়া পথিকের রোদন

কোথা লুকাইল মোর গোষ্ঠীগণ ।
এ ভুবনেতে কি নাহি একজন ?
প্রান্তরে দাঁড়ায়ে চারিদিকে চাই ।
নিজ জন কেহ দেখিতে না পাই ।
পথে কত লোক করিছে গমন ।
গৌরনাম নাহি বলে একজন ।
হেন কেহ নাহি বলে ছুটা কথা ।
কেহ নাহি বুঝে মোর মনোব্যথা ॥
আমার গৌরাঙ্গ ভারত ভ্রমিল ।
গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠীতে ভুবন ভরিল ॥
দক্ষিণ প্রদেশ আপনি তারিল ।
কোন স্থান ভক্ত- দ্বারা উদ্ধারিল ॥
বামেশ্বর হতে ভোট দেশ করি ।
মুলতান গুজরাট কিবা কাশী পুরী ॥
সিন্ধুদেশে ভক্ত যত্নে পাঠাইল ।
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম তাহা প্রচারিল ॥
এত বড় গোষ্ঠী আছিল আমার ।
এখন হয়েছে সব ছারখার ॥

গৌরাঙ্গের গণ ভারতে কি আছে।
যদি কেহ থাকে কেবা কারে পুছে॥
যদি কেহ থাকে চেনা নাহি যায়।
সেও নাহি জানে নিজ পরিচয়॥
কেহ বা পশ্চিমে কেহ বা দক্ষিণে।
কে তাদের প্রভু কিছু নাহি জানে॥
পশ্চিমা জানে না গৌড়ীয় কি জানে ?
এই গৌড় মাঝে জানে কয়জনে ?
কেহ গোষ্ঠী থাকে দেহ পরিচয়।
মিলিয়া তা সনে জুড়াই হৃদয়॥
একা থাকিবারে নারি গৌরহরি।
সঙ্গী মিলাইয়া দেহ কৃপা করি॥

প্রেমানন্দে যেই নদে ভেসে যায়।
আজ সেই নদে মরুভূমি প্রায়॥
আমাদের নদে সুখের পাথার।
আজি পুণ্যভূমি হয়েছে আঁধার॥
নদিয়া আইনু সুখের লাগিয়া।
এবে ফিরি যাই কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোথায় নদীয়া কোথায় গৌরাঙ্গ।
কোথায় কীর্ত্তন প্রেমের তরঙ্গ॥
এই কি প্রভুর মনেতে আছিলা।
যাইবার কালে সব নিয়া গেলা॥

কি ভাণ্ডার পূরি প্রভু রাখি গেল।
ভাণ্ডারীর দোষে জীবে না পাইল॥
শুন হে ভাণ্ডারি কহি জোড় করে।
প্রভুকে নিকাষ দিতে হবে পরে॥
প্রভু-ধন নষ্ট করে থাক তুমি।
প্রভু বুঝে নিবে বলে খালাস আমি॥

যাহারা আচার্য্য ধন লোভী হলো।
শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্ঞা সব ভুলি গেল॥
মহা-বংশ বলি করে অভিমান।
কিন্তু ভক্তি বিনা কারু নাহি ত্রাণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে নাহিক কুলীন।
যেই ভক্তিমান সেই ত প্রবীণ॥
দীক্ষা দান করা হয়েছে ব্যবসা।
জীবে দয়া মিথ্যা শুধু ধন আশা॥
মহা-বংশ যেই তার বড় দায়।
সবা হতে ভালো তার হতে হয়॥
নিজ কর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে।
বংশ দায় দিয়া এড়াতে নারিবে॥
পরকীয়া রস আস্বাদিবার তরে।
কোন কোন জন পরনারী হরে॥
কেহ বা গৌরাঙ্গ বিগ্রহ করিয়া।
বাবুগিরি করে তাঁর দায় দিয়া॥

এরা সব দেয় গৌর-পরিচয়।
বলে তারা সব গৌরগোষ্ঠী হয় ॥
কুটুম্ব হইয়া মোর স্থানে আসে।
আমি তাদের দেখি পালাই তরাসে ॥

হাহা শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
জীব প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু তোমা বিনা সব অন্ধকার।
জীবে ভক্তি দিয়া করহ উদ্ধার ॥
কাঁহা গদাধর মুরারী মুকুন্দ।
কাঁহা নরহরি হে জগদানন্দ ॥
কোথায় শ্রীবাস কোথা বক্রেশ্বর।
কোথা রামানন্দ কোথা দামোদর ॥
এসো ভক্তগণ পুন ধরাধামে।
জীব দুঃখ হর গৌরহরি নামে ॥
তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজ।
মুইত কীটাণু বৈষ্ণব সমাজ।
তোমাদের নিজ কাজ কর এসে।
কেন কান্দি মরে বলরাম দাসে ;
তোমাদের প্রভু তোমাদের দায়।
কেন বলরাম কান্দিয়া বেড়ায় ॥

সমাপ্ত